পাদরী লঙ
বাঙলা সাহিত্য
ও
বাঙালী জীবন

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত

অধ্যাপক ডঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডিরেক্টর, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস
কলিকাতা—১৩৮৭/১৯৮০

James Long, Bangla Sahitya-O-Bangali Jiban
By Sankar Sengupta.

প্রথম প্রকাশ ঃ রাখী পূর্ণিমা, ২০শে আগষ্ট/১৯৬০
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস-এর পক্ষে, শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত কর্তৃক
৩নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৬৯
হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী সুষমা গায়েন
কর্তৃক সমাজ সেবক সংঘ প্রেস, বিদিশা,
মেদিনীপুর হইতে মুদ্রিত ।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ—প্রিন্টার্স কংগ্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৩, আবদুল হামিদ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯

মুখবন্ধ

বাঙালীর এক বড় লজ্জা এই যে সে ১৯১৪ সালে পাদরী লং-এর একখানি জীবনী রচনা করিয়া সেই মহামতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে নাই। সেই লজ্জা এতকাল পরে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত দূর করিলেন। ১৯১৪ সাল প্রথম যুদ্ধের প্রথম বছর হইলেও বাঙালীর তখন সুসময়। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে তখন বাঙালী সারা ভারতে বরেণ্য। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভে তখন বাঙালী সারা বিশ্বে পরিচিত। স্যার আশুতোষের পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বিদ্যাচর্চার এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। বাঙলা ভাষা তখন বাঙালীর গরব, বাঙালীর আশা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ১৯১৪ সালে এই শহরের কেহ লক্ষ্য করিলেন না যে একশত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮১৪ সনের ২৩ শে জুলাই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সেবক পাদরী লং-এর জন্ম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তখন এক বয়ঃপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেখানে এই স্মরণীয় দিবসটি পালিত হইয়াছিল বলিয়া জানি না। প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (১৮৯৬) লং সাহেব সংকলিত বাংলা বই-এর তালিকাটি (১৮৫৫) ছাপাইয়া বাঙালীদের মনে করাইয়া দিয়াছিলেন যে মুদ্রিত বাঙলা সাহিত্যের প্রথম হিসাব লইয়াছিলেন এই বিদেশী ধর্মযাজক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেদিন লং সাহেবের প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করেন নাই। তারপর এই ৬৬ বছরে কোন বাঙালী পাদরী লঙের একখানি প্রামাণ্য জীবনী লিখিলেন না। হেয়ার, পামার, কলভিন, কেরী, মার্শম্যান এই 'পঞ্চগোরা'র নাম বাঙালী কোনখানে নিত্য স্মরণ করিতেন কিনা জানি না, তবে ইঁহাদের মধ্যে হেয়ার ছাড়া আর কাহারও জীবনী কোন বাঙালী লেখেন নাই। ইহাকে আলস্য বলিব না অবহেলা বলিব বুঝিতেছি না, তবে ইহা যে বাঙালীর অগৌরব তাহাতে সন্দেহ নাই।

অথচ ইংরাজ কিন্তু বাঙালীর জীবনী লিখিতে দ্বিধা করেন নাই। স্ক্রীন সাহেব শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিলেন। মেরী কার্পেণ্টার তাঁহারও পূর্বে লিখিয়াছিলেন রাজা রামমোহনের শেষ জীবনের কাহিনী। বোধহয় লং সাহেব সম্বন্ধে আমাদের এই ঔদাসীন্যের এক প্রধান কারণ এই যে তিনি বিদেশী ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। ১৮৮৭র ২৩শে মার্চ যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তখন আমাদের জাতীয়তা ভাবের সঙ্গে আসিয়াছে জাতিবৈরের ভাব। ইংরাজের গুণগান তখন কে করিবে! বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা তখন গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা 'আমরি বাংলাভাষা' বলিয়া মাতৃভাষার জয়গান করিলেন তাঁহারা ঐ ভাষায় বিদেশী সাধকদের স্মরণ করিলেন না। কেরী আর লং সাহেবের জীবন

কথা কেহ লিখিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও যিনি প্রথম 'ইকনমিক' স্বদেশী করিয়া কারাবরণ করিলেন, নীল-আন্দোলনের সেই বিদেশী বীরের নাম উচ্চারিত হইল না। বঙ্গদেশের এই বিদেশী বন্ধু তখন বিদেশী দ্রব্যের সাথে মিলিয়া গেলেন।

এই আপনজনকে ভুলিয়া যাদের এই পাপ হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলাম শঙ্কর সেনগুপ্তের এই সুলিখিত গ্রন্থখানির মধ্য দিয়া চৌদ্দ বছর পূর্বে তিনি পাদরী লং-এর *500 Questions on the Subjects Requiring Investigation in the Social Condition of the People of India* (১৯৬৬) গ্রন্থখানির এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া এই মহাপ্রাণ মানুষটির মহৎ কর্মের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মূল্যবান গ্রন্থখানির এই সুসম্পাদিত সংস্করণের ভূমিকায় বলা হইলঃ "The credit of calling public attention to the investigation of social question in India is justly attributable to Rev. Long, 'the father of Indian sociology'." 'লং সাহেব ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানের জনক' এই উক্তিটি আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। আমাদের ভাষাবিজ্ঞানের জনকও ইংরাজ। আমাদের জাতিতত্ত্বের জনক ইংরাজ। আমাদের ইতিহাসও প্রথম লিখিলেন ইংরাজ। আমাদের ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখিলেন ইংরাজ। আমাদের ভাষার প্রথম অভিধান প্রকাশ করিলেন ইংরাজ। আমরা ইংরাজকে তাড়াইয়াছি সেই সঙ্গে যে সব ইংরাজ আমাদের হৃদয়ের সংবাদ লইতেন, আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগ লইতেন, গভীর দরদ লইয়া আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম দর্শনের চর্চা করিতেন, তাঁহাদেরও দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি। ছোট ইংরাজ আর বড় ইংরাজের তফাৎ বড় করি নাই।

তাই বলিতেছিলাম শঙ্কর সেনগুপ্ত পাদরী লং-এর এক প্রামাণিক জীবনী লিখিয়া বাঙালীর বিদ্যাচর্চার একটি বড় গলদ দূর করিলেন। *500 Questions* এর নতুন সংস্করণ হাতে পাইয়া বাঙালী এই বিস্মৃত মানুষটিকে আবার স্মরণ করিলেন। ইহার ছয় বৎসর পর শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রকাশ করিলেন ইংরাজী "নীল-দর্পনের" এক নতুন সংস্করণ। গ্রন্থখানি আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চর্চার এক মাইলষ্টোন। এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় শঙ্কর সেনগুপ্ত পাদরী লং সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন। লং সম্বন্ধে তাঁহার একটি মূল্যবান বক্তব্য এই যে 'তিনি ছিলেন জনগণের বন্ধু'। তিনি গ্রামদেশের বাঙালীদের সঙ্গে একাত্ম হইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের সুখদুঃখের সাথী হইয়াছিলেন। তাহাদের অন্তরের কথা বুঝিবার জন্য বাংলা ভাষার প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। শহর ও গ্রামের মানুষকে লইয়া একটি অখণ্ড সমাজের পরিকল্পনায় তিনি বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করিতে চাহিয়াছিলেন। নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী সংস্করণ প্রচার করিয়া তিনি বাঙালী কৃষকের কথা সকলকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। ইংরাজী নীলদর্পণের এই সংস্করণের ভূমিকায় শঙ্কর সেনগুপ্ত লং সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"He was a missionary with a great love for the masses" লঙ সম্বন্ধে এমন

একটি সার্থক উক্তি আর কেহই পূর্বে করিয়াছেন বলিয়া জানি না। আজকাল mass লইয়া কত কথা। কিন্তু এই mass কে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইতে হইলে কি নিষ্ঠা কি আগ্রহ আর কি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তাহা আমরা পাদরী লং-এর জীবন হইতে শিখিতে পারি। লং সাহেব ১৮৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তখন কলিকাতার একটি বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা", লিখিয়াছিলেন—"whenever we shall have occasion to see our ricefields overflowing with crops, our cultivators with their family enjoying hearty meals, happy and contended, we will, gratefully remember the Englishman Rev. James Long" শঙ্কর সেনগুপ্ত এই উক্তিটি উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে লং সাহেব তাঁহার জীবৎকালে বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৯৭৪ সালে শঙ্কর সেনগুপ্ত লং সাহেবের তিনটি প্রবন্ধ "The Banks of the Bhagirathi "(১৮৬০)" Calcutta in the olden times—its People" (১৮৬০) এবং "Calcutta in the olden times—its Localities (১৮৫২) একত্র করিয়া Calcutta and its Neighbourhood : History of Calcutta and its People from 1690 to 1857" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠার এক ভূমিকায় শঙ্কর সেনগুপ্ত লং-এর কর্ম, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা-চিন্তা, সমাজ-চিন্তা, তাঁহার মানবতা, বঙ্গবিদ্যা এবং ভারতবিদ্যায় তাঁহার কীর্তি সম্বন্ধে এমন গভীর আলোচনা এই প্রথম। এবং এই ভূমিকার শেষে শঙ্কর সেনগুপ্ত লং-এর যে রচনাপঞ্জী উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য।

পাদরী লঙ-এর চিন্তা, কর্ম ও রচনা সম্বন্ধে দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল তাঁহার এই পূর্ণাঙ্গ জীবনী। বিচিত্র তথ্য সন্নিবেশে এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই গ্রন্থখানি বাংলা জীবনী-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কীর্তি। শঙ্কর সেনগুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে জানেন, তথ্য সাজাইতে জানেন এবং সেই তথ্যের তাৎপর্য বুঝাইতে জানেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত বহু অল্প পরিচিত বা লুপ্ত এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, রিপোর্ট, প্রবন্ধাদি তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়াছেন। অনেক নূতন তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক তথ্যকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এক বিদেশীর জীবন কথা বলিতে যাইয়া দেশের অনেক কথা আমাদের নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি একাধারে জীবনী ও সমকালীন ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসে পাদরী লং কখনও হারাইয়া যান নাই। গ্রন্থখানির সকল কথাই লং সাহেবের কথা। সকল প্রসঙ্গই তাঁহার প্রসঙ্গ। সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ ও বিবরণের মধ্য দিয়া তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরিয়া শঙ্কর সেনগুপ্ত দেশের ইতিহাস ধর্ম দর্শন সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। Indian Folklore Society এবং Folklore পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে তিনি নৃতত্ত্বের

পরিবেশে বিস্তৃত করিয়া আমাদের দেশের মানুষের সকল কর্ম ও চিন্তার, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল দিকের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু তিনি কোন বিশেষ মতবাদের আশ্রয় লইয়া বিচারশীল অনুসন্ধানের স্বাধীনতাকে খর্ব করেন নাই। এক বিশিষ্ট ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক তথা লোকবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি এশিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের নানা কনফারেন্সে যোগ দিয়াছেন এবং আমাদের লোক-সংস্কৃতি (শঙ্কর সেনগুপ্তের ভাষায় লোকবৃত্ত) সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি দেশ-বিদেশে সমাদৃত। লোক-সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বকে তিনি মানুষের কথা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কথা যেমন গ্রামের কথা তেমন শহরের কথা। যেমন সেকালের কথা, তেমন একালের কথা। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া তিনি বাঙলার লোক-জীবন, পালপার্বণ, ব্রতকথা, খেলাধুলা, বিবাহ,আচার-আচরণাদির কথা আলোচনা করিয়াছেন সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়াই আবার তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। নৃতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে আমরা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অখণ্ডতা বুঝিতে পারিব না। শঙ্কর সেনগুপ্ত নৃতত্ত্ব এবং সমাজ বিজ্ঞানকে ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জেমস লং-এর এই জীবনীখানি শুধু এক জীবনীকারের রচনা নয়। ইহা এক সমাজ-বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকের সার্থক অনুসন্ধানের ফল। গ্রন্থখানির এক ইংরাজী সংস্করণ হইলে তাহা দেশ-বিদেশে আদৃত হইবে। গত শতাব্দীর বঙ্গদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতির আলোচনায় গ্রন্থখানি অপরিহার্য। জেমস লং-এর ছবি বহুলাংশে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের ছবি। পাদরী লং-এর এমন একখানি ছবি আর দেখিব ভাবি নাই। আজ তাহা দেখিয়া ধন্য হইলাম।

সূচীপত্র

১ | পূর্ব ইতিহাস : ভূমিকা

"বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন—"বাংলাদেশে ইংরেজ সমাগমের কাল হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্যব্যক্তি বাংলাভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ ও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় ইঁহারা নগণ্য নহেন। জোনাথান, ডানকান, টমাস কেরী এবং পরবর্তী মে, হার্লি...রবিনসন, লং, কীথ এবং আরও অনেকে বাংলা গদ্যভাষার জন্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন।"[১] ফলে বাংলা গদ্য পৌণে দুশো বছরের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ত্রুটী পূরণ করে ফেলেছে।

বাংলাগদ্য আজ যে মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কেরীসাহেব যখন বাংলাগদ্যের পথ খননে ব্রতী হয়েছিলেন তখন তা কল্পনারও অতীত ছিল। কাব্যের জন্য কিছু স্থান রেখে সাহিত্যের বাকী সমস্ত ক্ষেত্রে আজ বাংলা গদ্যের অখণ্ড প্রতাপ। কবিতার অন্তঃপুরেও এখন গদ্যের যাতায়াত চলছে। যদিও উন্মেষ পর্বের গদ্য আর আধুনিক গদ্য এক নয়, পৌণে দুশো বছর ধরে চলেছে তার বিবর্তন। সচেতন গদ্যলেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাগদ্যের দেহে শক্তি ও সৌন্দর্য এবং গতিতে সাবলীলতা এসেছে। তার জন্য যেসব পাশ্চাত্যব্যক্তির দান বাঙালী কোনদিন বিস্মৃত হতে পারবে না তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন পাদরী জেমস লঙ।

পাদরী লঙ ছিলেন আইরিশ। তিনি বাঙলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাঁর সমাজহিতৈষী চেতনা বয়স এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের রচনাসম্ভারকে প্রভাবিত করতে থাকে। সাহিত্য ব্যাপারে নীতিবাদী ও অনুবাদের ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর সংযমী; ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা, দেশীয় জনগণের সেবা, দেশীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার ব্যাপারে ছিলেন অক্লান্তকর্মা।

বাঙলার অন্তঃপুরে লোকাচারে, কুলাচারে, ধর্মীয় কুসংস্কারের সহস্র বিধিনিষেধের জালে বন্দিনী নিরক্ষরা বাঙালী রমণী তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল।

এদেশের দুঃস্থ, নিঃস্ব অত্যাচারিত সর্বহারার দল তাঁকে কাঁদিয়েছিল। এই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। সাধারণ বাঙালীর জীবনধারা নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে সমুন্নত করার চেষ্টায় তিনি ছিলেন সংগ্রামী। বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য তাঁর যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টার পথ পরিক্রমায় তিনি নিজেই বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বঙ্গলীন চেতনার প্রকাশ দেশীয় পাঠশালা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারাদির প্রতিষ্ঠায়, প্রবাদমালা, ধাতুমালা, সংবাদসার, ক্যাটালগ প্রভৃতির রচনায়, নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশে, সত্যার্ণব বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রভৃতির সম্পাদনায় সহযোগী হিসেবে। দেশীয় সাধারণের সমাজ ইতিহাস রচনার তথ্যাদি সংগ্রহে, বাঙলা সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টায়, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের জীবনের মান উন্নয়নের সংগ্রামে ও আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের চিন্তা আনয়নে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। বাঙলা ও বাঙালীর এমন এক যুগসন্ধিক্ষণের প্রাণপুরুষ তিনি যে, কোন মতেই তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আজও তিনি স্মরণীয় ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব।

ইউরোপের অন্তত নয়টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত যখন ভারতবর্ষে এসে নানা ধরণের অগ্রণীকাজ আরম্ভ করে দিলেন তখন বিশ্বে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের আবিস্কার ও প্রসার হয়ে চলেছে। গণতন্ত্রের চিন্তাধারা, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, শিল্প-বিপ্লবের উপার্জন, রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথা বিলোপ জনিত চিন্তা, আমেরিকার দাসপ্রথার অবসান জনিত ভাবনা ইত্যাদি এদেশেও এসে গেছে। তিনি এতদ্দেশীয়দের ওপর এসবের প্রত্যক্ষ ফল এবং ইংলণ্ড ও ইউরোপবাসীর লিবারেল চিন্তাচেতনার কথা নানা ঢঙে প্রকাশ করতে থাকেন। তার দ্বারা এদেশবাসী নতুন খোরাক পায়, নানাভাবে উপকৃত হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ আদি কবি ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কল্পভ্রষ্ট হলেও এই সময় থেকেই যে রাজতন্ত্রের বাঁধন আল্‌গা হতে থাকে তা তো সকলেরই জানা। তবু কলোনী দখলে রাখার অদম্য উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না। প্রথমদিকে মিশনারী পাদরীদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চললেও এ সময় থেকে কলোনী দখলে রাখার কাজে মিশনারীদেরও ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যায়। তার ফলে সরকার ও পাদরীদের সম্পর্ক নতুন চরিত্র পায়। পাদরীরা বিভিন্ন কলোনীতে গিয়ে সেই সেই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে থাকেন। শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার উন্নতি, কুসংস্কারাদি থেকে মুক্তি, সমাজের উন্নতি, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি কাজের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস সেবার কাজেও নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন। তাতে তাঁদের অনেকেই জনগণের আস্থা

অর্জন করতে পারেন। তারই রন্ধ্রপথ দিয়ে করতে থাকেন সুসমাচারের বাণী প্রচার, দিতে থাকেন খৃষ্টধর্মে দীক্ষা, ও দেশীয়দের প্রভুভক্ত থাকার শিক্ষা। আর তার ফলে আধুনিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বহু কাজে অগ্রণী হিসাবে তাঁদের অনেকেই স্বীকৃতি পেতে থাকেন বিভিন্ন দেশে।

আমাদের দেশের সাহিত্য, পুরাতত্ব, ইতিহাস ও সামাজিক জীবন অধ্যয়নের ব্যাপারেও অগ্রণী বহু মিশনারী পাদরী। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস স্বীকার করেছেন,—"১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে "ক্যালকাটা রিভিয়ু" ত্রৈমাসিকেও রেভারেণ্ড লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধ এবং পত্রিকাশেষে সন্নিবিষ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে[১]।" তাছাড়া, রেভারেণ্ড লং, জে. ওয়েঙ্গার, জে. মার্ডক প্রভৃতিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় এবং বাংলা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিয়া ইতিহাস রচনা করিবার বহু উপকরণ যোগাইয়া দিয়াছেন[২]।" সাহিত্য ইতিহাস রচনার উপাদান ধরে রেখে, সাহিত্যে অশ্লীলতা নিবারণের ব্যবস্থা করে, প্রবন্ধাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ও তার দ্বারা জনসাধারণকে সাহিত্যমুখী করতে, কলকাতার গৃহসমস্যা[৩] সম্পর্কে বিতর্কাদির ব্যবস্থা করে জেমস লঙ বাঙালীকে বঙ্গলীন তথা স্ব-সচেতন হতে সাহায্য করেছেন।

ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ব্যাপারে ঠিক হয়—পাণ্ডুলিপির আদর্শ "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবিনসন সাহেব দেখিবেন, তাঁহারা মনোনীত করিলে সেই আদর্শ পাদরী লং সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে। পাদরী লং তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য কিনা"! বোধগম্য হলে ছাপা হত, না হলে পাণ্ডুলিপি সংস্কার করার জন্য নির্দেশ দিতে হত লঙকে। শুধু অনুবাদ পরীক্ষাই নয়, নতুন নতুন অনুবাদককেও তিনি উৎসাহিত করতেন বাংলা রচনায়। 'বৃহৎকথা'র বিজ্ঞাপনে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ লিখেছেন—"কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের

অধ্যক্ষমহোদয়দিগের অনুমত্যানুসারে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড জে. লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম"। অর্থাৎ শুধু নিজের কাজেই আত্মমগ্ন নন, অন্যকেও উৎসাহিত করতেন লঙ বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করতে।

১৮৪৯ সনে সচিত্র বাঙলা মাসিক "সত্যার্ণব" প্রকাশ করেন[১]। সত্যার্ণবের আমলে বাঙলা গদ্য সাহিত্যক গুণ সমৃদ্ধ। লঙের গদ্য অক্ষয়কুমারাদির ন্যায় উৎকৃষ্ট না হলেও তা ছিল বিশুদ্ধ, তিনি সাবলীল বাংলায় লিখতেন।

বাঙলা গদ্যের উন্মেষপর্বের বহু আগেই ঘটে বাঙালীর মানসমুক্তি। পিছনের দিকে তাকালেই দেখব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় থেকেই বাঙালীর মানসমুক্তি আসে। এইসময় থেকেই বাঙালী সংকীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপের সীমানা ছাড়িয়ে চতুর্দিকে বিস্তারিত হতে থাকে, তার মন ও মননের সংকীর্ণতা প্রেম ও ভক্তির বন্যায় ডুবে যায়[২]। কিন্তু তখনও সাহিত্য কাব্যধর্মী, গদ্যের আবির্ভাব হয় পরবর্তী বা জাগরণের যুগে। এই সময় ইউরোপীয় মনীষা ও ইউরোপীয় ভাষা বাংলা সাহিত্যকে গদ্যময় করতে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে বাংলা গদ্য তার নিজের পথ করে নেয়। নবজীবনের উল্লাস উপলব্ধি ও মননের আত্মবীক্ষার মধ্যে বাঙালী অন্যদের সাহায্য নিয়ে গদ্যসাহিত্যকে চূড়ান্ত রূপ দিতে থাকে। তার ফলে গ্রামীণ-সাহিত্যে এসে যায় নাগরিক পোষাক। গ্রামজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক ও কলাকুশলীর দল বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সাহিত্যে এমন এক বৈচিত্র্যমণ্ডিত গতিশীল প্রাণচেতনা আমদানী করেন যা নতুনত্বে ভরা। এভাবেই আধুনিক জীবন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত।

আধুনিক নাগরিক সাহিত্যের বাহুল্যে বেশ কিছু চিন্তাশীল অনুভব করতে

আরম্ভ করেন গ্রামকে বাদ দিয়ে শুধু শহর আর শহরের মানুষদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে থাকলে সাহিত্য তার জাতীয় চরিত্র হারাবে। তখন থেকে শহরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম এবং গ্রামের মানুষদের কথাও নতুন করে সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। বাঙালী সাহিত্যিকদের এই চিন্তা ও চেতনায় গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে যে সব বিদেশী বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন তাঁদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় নাম রেভারেণ্ড জেমস লঙ।

ইংরেজ শাসক হয়ে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে যে বাঙালীর চিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করা না গেলে শাসনকে পাকাপোক্ত করা যাবে না। বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে চিনতে ও বুঝতে হলে তার ভাষা, জীবনধারা, ধর্ম ও সাহিত্যকে জানতে ও বুঝতে হবে। ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের দেশীয়, সমাজ, সাহিত্য, জীবন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ইত্যাদি বোঝাবার জন্য প্রথম উদ্যোগ নেন মিশনারী পাদরীর দল। সুসমাচারের বাণী প্রচার এবং দেশীয় সমাজ ও জীবনাদি জানার জন্য তাঁরা ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যাদি অনুশীলন আরম্ভ করলেন। এবং এতদ্দেশীয়দের হাবভাব বোঝার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের হাতে বাঙলা গদ্যের কাঠামো তৈরী হতে আরম্ভ করে বাইবেল অনুবাদের মারফৎ।

তবু পাদরী সাহেবেরা তাঁদের কাজের দ্বারা একদিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করছিলেন, অন্যদিকে একশ্রেণীর হিন্দুকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি শিথিল এবং অন্য একশ্রেণীকে প্রাচীন ঐতিহ্যাদি ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল করে তুলছিলেন। পত্র-পত্রিকা-প্রবন্ধ-গ্রন্থ-পুস্তিকাদির প্রকাশ ও প্রচার ছাড়া দেশীয় শিক্ষার, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করতে গিয়েও তাঁরা বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক রচনা করছিলেন। পাদরী-পণ্ডিত-মুন্সী রচিত বাংলা গ্রন্থাদি বাঙালীর মনোলোক, সমাজসচেতনা ও বাংলা সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, স্কুলবুক সোসাইটি, ট্রাস্ট সোসাইটি, ক্রীশ্চান নলেজ সোসাইটি প্রভৃতি এদেশীয় ভাষা, শিক্ষা, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি জানার ব্যাপারে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েই এগিয়ে চলে। দেশে তখন একদিকে টোল-চতুষ্পাঠী-মাদ্রাসা-মক্তবাদি, অন্যদিকে আত্মীয়সভা' অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, জ্ঞানসন্দীপন সভা, বঙ্গীয় হিতসাধিনী সভা, সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা, সোসাইটি ফর একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, মেকানিকস ইনষ্টিটিউট, টিচার্স সোসাইটি, অনুবাদক সভা, ফ্যামিলি লিটারারি

ক্লাব, বেথুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা, হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ কৃষি সমাজ, মাধ্যমিক পাঠশালা, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, হেয়ার স্কুল, ডাফ স্কুল, চার্চ মিশন, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি সংগঠনের ছড়াছড়ি।

সিভিলিয়ান সাহেবেরা প্রথমে এদেশের জীবন, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না, অথচ এসব না জেনে এদেশের মানুষদের শাসন অথবা শোষণ প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই এদেশের সমাজ, জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক জানার ব্যাপারে, তাঁদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে, একদিকে পাদরী সাহেবদের নানাধরনের কাজ, অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতির চেষ্টা চলতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ ইত্যাদির দ্বারা দেশীয় সমাজ খুব কিছু উপকৃত না হলেও প্রাচীন এবং দেশীয় জীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি জানার ব্যাপারে ইউরোপীয়দের কৌতূহল বাড়ে। কৌতূহলী ইউরোপীয়েরা নানা ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নানাধরনের কাজ এগিয়ে চলে। কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লোক মনে করতে থাকে কলকাতা মানেই বাঙলা।

কলকাতার সংস্কৃতির কোন বিশেষত্ব নেই। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক উপকরণ এবং জীবনের মূল্যবোধের মধ্যে এসে যায় নানাধরনের কণ্ট্রাডিকশন। গ্রাম শহরে পর্যবেশিত হওয়ায় নানাধরনের পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে যেমন জীবনে, তেমন সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। সমস্ত ব্যাপারটাই বাণিজ্য উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। কলকাতা মানে হচ্ছে কতগুলো গ্রামের সমন্বয়। এখানে যখন পশ্চিমা বাতাস বইতে শুরু করে তখন এগুলি নাগরিক গ্রামে পরিণত হয়। বিলাতের শিল্প বিপ্লবের পরে এই নাগরিক গ্রামসমূহ শহরে রূপান্তরিত হয়। তখন জীবনধারণের প্রাচীন গ্রাম্যপদ্ধতি এদেশীয় শহরবাসী আর আঁকড়ে থাকে না। অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ফ্যাক্টরী প্রবর্তনাদির কারণে হঠাৎ সাধারণমানুষ অনা এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। অনেকেই আবার নাগরিক জীবনযাপনেরও জ্ঞান লাভ করে। এর ফলে সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দেয়। কারিগরী বিজ্ঞানের প্রসারের তুলনায় নাগরিক মূল্যবোধ মন্থর থাকায় সাংস্কৃতিক দৈন্য বেড়ে চলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের পরিবর্তন সূচিত হলে মানুষকে টাকা দিয়ে পরিমাপ করা হতে থাকে, প্রাচীন মূল্যবোধের কোন ভূমিকা থাকে না। কৃষিকাজও চাকরিতে পর্যবেশিত হয়। প্রাচীন জাতিপ্রথা ভুয়া শ্রেণীপ্রথায় রূপ নিতে থাকে। আগেকার সমাজ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি নতুন চরিত্র পায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে যায়। একদিকে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী এবং অন্যদিকে নব্যপন্থীদের

মধ্যে নানা ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিতে থাকে। এ অবস্থার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। শিক্ষিত এবং স্বচ্ছলশ্রেণীর মানুষেরা 'বাবু' আখ্যায় ভূষিত হতে থাকেন। ১৮৩০ সনে আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখলেন—"When the metropoles of British India, we fairly came in contact with a rising body of natives, who, had learnt to think and to discuss all subjects with unshakled freedom...we hailed it heralding the dawn of an auspicious era.. "[১] এই সময় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি নতুন এবং প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু প্রভু শাসকেরা ঘোষণা করলেন,—"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste in opinion ; in morals and in intellect."[২] সমাজ-হিতৈষীরা নানাধরণের সভা প্রতিষ্ঠা করে স্ব-স্ব চেতনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন। সর্বপ্রথম যে বিদ্বৎ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তা এশিয়াটিক সোসাইটি। ইতিহাস পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি অনুশীলনের জন্য এই সোসাইটি গঠিত হয় ১৭৮৪ সনে, কিন্তু এখানে সুদীর্ঘকাল এতদ্দেশীয়দের ঢুকতে দেয়া হয় না। প্রতিষ্ঠিত হয় টাউন হল, ১৮৩৩ সনের সনদ বিরোধী সম্মেলন এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ সনে এখানেই লর্ড মেটকাফ সংবাদপত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রাধীনে না রাখার কথা ঘোষণা করেন, এবং এখানে অনুষ্ঠিত সভা থেকেই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। কালা-আইন বিরোধী সভাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া, হেয়ার স্ট্রীট ও স্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে স্থাপিত হয় মেটকাফ হল। এই হলের নীচে এগ্রিকালচারল অ্যাণ্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি স্থাপিত হয়, দোতালায় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী। এখানেই ১৮৬৬-৬৭ সনে বেঙ্গল সোসাল সাইন্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় জেমস লঙ, এইচ বেভারলী, প্যারীচাঁদ মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতির প্রচেষ্টায়। ভারতীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ সনে। ১৮৭২ সনে জেমস লঙ যখন চিরদিনের তরে এদেশ ছেড়ে চলে যান

তখন প্রতিষ্ঠিত হয় সিনেট হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আঠার বছর বাদে সিনেট হল স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ওয়াসি, আলেকজান্ডার ডাফ, উইলিয়াম গর্ডন ইয়ং, হেনরী গুডউইন, উড্র প্রভৃতির নাম দেখি। মোট একচল্লিশ জন দেশীয় ও বিদেশী সদস্য নিয়ে প্রথম কমিটি গঠিত হয়েছিল। এইসব কাজ যখন অনুষ্ঠিত হয়ে চলছিল তখন যৌবনের অদম্য উৎসাহ নিয়ে জেমস লঙ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জনজীবনের নানাদিকে নিজেকে প্রসারিত করে চলছিলেন, দেশীয় সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়ঃ "A view of culture as a code of communication is tied to the emergence and development of the concept of culture from the late nineteenth century to the present. Modern awareness of the phenomenon we now call culture grew from circumstances of contact between the expanding Europeans and the various peoples whom they labeled "natives", "primitives", or more perjoratively, "savages"...

Ironically, culture was regarded by Tylor, the first to use the term, as a universal quality, present in the highest degree in European civilization and to a lesser extent in "less advanced" to traditions." কিন্তু ১৮৮৮ সনে বোয়াস বললেন, "The universalist veiw of culture held by Tylor was unscientific because it was ethnocentric...As applied eventually to culture by others, this realization yielded the geueral proposition that culture constitute a code for interpreting the meaning of *stimuli* of all kinds."[১] বঙ্গ-সংস্কৃতির অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং বাংলা সাহিত্যের পুনর্গঠনে জেমস লঙের দান অনস্বীকার্য। তাই তাঁর কাজকর্মের ধারা অনুধাবন করতে হলে এসব মনে রাখতে হবে।

তিনি এদেশে আসেন ১৮৪০ সনে, যখন কলকাতা ও বাঙালী জীবনে নানা পটপরিবর্তনের খেলা চলছে। এক দশকের মধ্যেই তিনি লঙ-হাওয়া বওয়াতে পারেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি মহাত্মা; ষাটের দশকে ভারতবন্ধু। ১৮৫১ সনের জানুয়ারী মাসে সংবাদ প্রভাকর লিখলেন—"মিং লাং সাহেব অতি উদার চিত্ত

সর্ব্বোতোভাবে গুণজ্ঞ এই মহাশয় প্রায় মধ্যে ২ সামান্য গুরুমহাশয়দিগের ক্ষুদ্র ২ পাঠশালায় গমনান্তর তাহার তত্ত্বাবধান করেন এবং ছাত্রগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। আর তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সাধ্যানুসারে সাহায্যকরণে ত্রুটি করেন না। অতএব পাঠকমহাশয়েরা বিবেচনা করুন ইহার অপেক্ষা উত্তম মহাত্মা সাহেবের মহদ্‌গুণের আর কি অধিক নিদর্শন হইতে পারে! জগদীশ্বর তাঁহাকে সাধ্যমত বিভব দেন নাই ইহাই বড় দুঃখের বিষয়, তাহা থাকিলে তিনি আপনার মনোগত বিষয় সকল অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন।"[১] অর্থাৎ নানা ধরণের কাজ করে তিনি যখন মহাত্মার পর্যায়ে চলে গেছেন তখন অবধি আর্থিককারণে বহু পরিকল্পনাকে কার্যে রূপ দিতে পারেন নি। তার জন্য তিনি সরকার, রাজা-জমিদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছেন, এবং তাঁদের বদান্যতায় বহু কাজও করতে পেরেছেন। যেমন, দেশীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, প্রবন্ধাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

জেমস লঙকে পাদরী লঙ বলতে আমার ভাল লাগে। এর দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের যথাযথ সুবিচার করা সম্ভব। তাঁর সমগ্র কর্মের মধ্য দিয়ে যে মনের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে একদিকে যেমন মানব সংস্কৃতির সৌগন্ধ অন্যদিকে খৃস্টধর্ম প্রসারের, খৃস্টধর্মে দীক্ষাদানের ও দেশীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্যম। দেশীয়ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য তিমি আমাদের একজন। তাঁর কাজকর্ম, রচনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে যে মনের প্রতিফলন ঘটেছে তা বাঙালীয়ানায় ওতপ্রোত। এজন্যই বিধর্মী পাদরী জেনেও বাঙালী তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। তাঁর ধর্মীয় প্রচার ও খৃীষ্টিয় কাজকর্মকে আমল না দিয়ে বাঙালী তাঁর মানবিক দিকের জয়গান গাইতে পেরেছিল। ধর্মীয় বা পাদরীর কাজ তাঁর গুণগ্রাহীতার বাধা সৃষ্টি করে নি। এই বৈশিষ্ট্য এই উদারতা আছে বলেই নতুন করে পাদরী লঙের বিচার করতে শুরু করেছে এ যুগের বাঙালী।

একটি কথা। বাঙালীকে ইমোশনাল জাতি হিসাবে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন। লঙের মধ্যে এই ইমোশন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। ইমোশন নিয়ে সমকালের সমাজ বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকাব গবেষণায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ইমোশন নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা নানা ধরণের কজ করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। দার্শনিকদের কাছেও ইমোশনের মূল্য অপরিসীম। এই ইমোশন হচ্ছে একটি কনসেপ্ট

যা পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের বেশী করে ভাবায়। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা এই ইমোশনকে 'রস' বলে গ্রহণ করেছেন। শ্রীলঙ্কার দার্শনিক ডিসিলভা বৌদ্ধ ইমোশনের ওপর চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমোশনের ওপর যে সব অধ্যয়ন ও অনুশীলন হচ্ছে তার দ্বারা বুঝতে পারি আমাদের জীবনে ইমোশনের মূল্য কতটা। লঙের জীবন-বৃত্তান্ত বুঝতে হলে তাঁর ইমোশনকেও বুঝতে হবে। কারণ তাঁর মধ্যে যুক্তিবাদ ও ইমোশন মিলেমিশে রয়েছে। ইমোশন সম্পর্কিত আলোচনায় বিদ্বানেরা স্বীকার করেন যে—"There are commonalities in facial expression of emotion across many cultures, and probably universals across all cultures. This does not mean, however, that there is no variation in affective behavior from culture to culture...

I have already mentioned the likelihood that affective behavior can be incorporated into the communicative scheme of a culture, as when the smile takes on meaning beyond being the behavior concomitant with happiness". (Jerry D. Boucher. op. cit), ইমোশন বলতে "Ekman, Friesen, and Ellsworth (1972) report that the emotions of angar, disgust, fear happiness, sadness, and surprise have been shown to be accurately identified in cross-cultural studies by different investigators. Based on their view, we can proceed with assumption that these six emotions constitute a set of pan-cultural emotions, at least as far as identification via facial expression is concerned. But what these studies do not tell us—nor did they try to tell us—what is the set of pan-cultural emotions...what we know about the social learning side of emotion involves a curious paradox...it seems quite evident that people can control, to a certain extent, their manifest affective behavior, and it is quite likely that this control is subject to social conventions and culture-based "display rules".[১] লঙের জীবন বৃত্তান্ত পরিবেশন করার সময় এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ লঙ সারা জীবন ইমোশনের দ্বারা চালিত হয়েছেন। তাঁর জীবন এত সহজ বা সরল নয় যে তাঁকে একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই শ্রেণী বা ওই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। তিনি বৈসাদৃশ্যেভরা অসাধারণ একজন

কর্মী, স্ববিরোধিতা ও ইমোশনে পূর্ণ মানবপ্রেমিক পাদরী, বৈদগ্ধমণ্ডিত শিক্ষক, অক্লান্তকর্মা লেখক ও গবেষক এবং প্রতিভাদীপ্ত সমাজ ও ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁর সমস্ত উদ্যম সমস্ত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ও দুঃস্থ জনতার সেবা। জীবকে শিবজ্ঞানে মেনে নিতে পেরেছিলেন বলেই এদেশের কৃষক, শ্রমজীবী, দেশী সাধারণ প্রভৃতির কাজে নিজেকে সঁপে দিতে পেরেছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রতিভাধর। তাঁর মত প্রতিভাধর মানুষদের রীতিই আলাদা একদিকে প্রচণ্ড আবেগ, ইমোশন ও অহংমন্যতা, অন্যদিকে অনুশোচনা ও অভিমান তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। একই সঙ্গে স্বদেশী সরকার ও স্বদেশীয়দের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার চেষ্টা এবং নেটিভদের দুঃখদুর্দশা দূর করতে, তাদের স্বার্থ দেখার ও উৎপীড়ন বন্ধ করতে এগিয়ে আসার চেষ্টা, পরস্পরবিরোধী কাজ। কিন্তু তিনি তা করেছেন তাঁর হিতবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে। পরস্পর-বিরোধী কাজের জন্য অনেক সময় তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে, সমালোচিত হয়েছে স্বদেশীয়দের এমন কি এদেশীয়দের দ্বারাও। কখনো কখনো তাঁর মধ্যে একাকীত্ব জাগিয়ে তুলেছে। সেই একাকীত্বের পীড়ণ দূর করার জন্য তিনি রকমারী কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, কখনো স্বদেশে পালিয়ে যেতেন। তবু বিবেকের সঙ্গে রফা করেননি, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেন নি। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে যে প্রত্যয়ী ছিলেন তা তাঁর প্রত্যেকটি কাজে প্রত্যেকটি আচরণে স্পষ্ট।

৩

জেমস লঙ প্রারম্ভিক শিক্ষা পেয়েছেন আয়ার্ল্যাণ্ডের উলসটার, রাশিয়ার সেণ্ট-পিটার্সবার্গ ও যুক্তরাজ্যের লণ্ডনে। ভারতবর্ষে চাকরি ও শিক্ষা একই সঙ্গে চলে। ধার্মিক পরিবার ও পরিবেশ এবং প্রোটেস্টাণ্ট শিক্ষা গুরুদের মারফৎ সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজচেতনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পান। ধর্মীয় শাস্ত্রানুশীলনের প্রতি যে অনুরাগ ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায় থেকে সঞ্চারিত হতে থাকে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ইশলিংটন কলেজের অধ্যয়নান্তে। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইউরোপের অন্তত নয়টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সেই সব ভাষার মুকুরে তত্তৎভাষার কবি লেখক ও দার্শনিকদের সন্দর্শন করেন, ধর্মগুরুদের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করেন।

আদর্শ পাঠক ছিলেন লঙ। দ্রুত এবং অধিক বিষয় পাঠ করলেও বদহজমে ভুগতেন না। কলকাতায় এসে শেখেন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা।

বাঙলা শেখেন বাঙলীদের মত করে। মেলামেশা করতে থাকেন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, সমাজসেবক, ভাষাশিক্ষক, ভাষালেখকদের সঙ্গে, এদেশের আপামরজনতার সঙ্গে। ফলে জ্ঞানের পরিধি এবং যোগাযোগের বিস্তৃতি ঘটে। এই বিস্তৃতি তাঁকে বিশ্বনাগরিকের মর্যাদা দেয়। তাঁর বহু রচনার মধ্যে দেখতে পাই স্বচ্ছ বিশ্ববোধ। অবশ্য কিছু পাদরী ও ইউরোপীয়দের একাংশ তাঁর বিশ্ববোধের মধ্যেও সংকীর্ণতা[১] দেখতে পেয়েছিলেন। কারণ, লঙের মানবপ্রীতি ও দেশীয় সর্বহারাদের প্রতি মমতা তাঁদের কাছে অসহ্য বা বিপদের সংকেত হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। বিরোধীদের বোঝাবার জন্য লঙ গলা ফাটা-চীৎকার করেছেন, Strike But Hear শিরোনামে পুস্তিকাও রচনা করেছেন। তারফলে অনেককে এমনকি লণ্ডনের চার্চ-মিশন সোসাইটির কেন্দ্রীয় সভাদেরও বোঝাতে পারেন তাঁর কথা, কিন্তু এই বোঝাতে যত সময় লেগেছে ততদিনের মধ্যে তাঁর কপালে যে ভোগান্তি ছিল তা সবই সহ্য করতে হয়েছে।

দোষগুণ নিয়েই মানুষ। দোষগুণকে সামাজিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানিয়ে নিয়ে মানুষ ভারসাম্য রক্ষা করে এগিয়ে যায়। পাদরী লঙও যেতেন। তিনি যখন যে নেশায় মশগুল হতেন তার হদ্দ করে ছাড়তেন। যখন ক্যাটালগ রচনায় হাত দিলেন তখন ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ, হ্যাণ্ডবুক, রিটার্ন প্রভৃতি একের পর প্রকাশ করে গেছেন. কণ্টিনিউয়াস প্রোসেসে এ কাজ করেছেন। যখন প্রশ্নাবলী নিয়ে মাতলেন তখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রশ্নমালা তৈরী করে গেছেন। যখন প্রবাদ নিয়ে মাতলেন তখন বিভিন্ন খণ্ডে প্রবাদমালা প্রকাশ করেছেন, তুলনামূলক আলোচনাদি করেছেন। যখন স্থানের ইতিহাস, সমাজজীবন প্রভৃতি নিয়ে তন্ময় তখন তা নিয়েই লেগে থেকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে করেছেন নিয়মিত কাজ—শিক্ষকতা, ধর্মপ্রচার, অনুবাদ, সম্পাদনা প্রভৃতি। অনেক সময় অনেক কাজের পর অবসাদেও ভুগতেন, কিন্তু তাতে তিনি থমকে থাকেন নি। কাজের গতি কমাননি। ক্ষুদ্র অর্থে তিনি স্বার্থপর ছিলেন না, কিন্তু মহৎ অর্থে স্বার্থপর ছিলেন। তাঁর স্বার্থচিন্তা ব্যক্তিগত লাভলোকসানের বিষয় ছিল না,

ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের দিকে, স্বদেশীয় শাসকদের শাসনকে ন্যায় ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর মধ্যে ঋজুতা ছিল, দার্ঢ্য ছিল এবং ছিল সততা ও নিষ্ঠা। তাই তিনি নির্ভয়ে এগোতে পেরেছিলেন।

জীবনের ব্রত ও বৃত্তি নির্বাচনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। নীলদর্পণ মামলার পর রাতারাতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠলেও তারজন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। একদিনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন নি। একাগ্রনিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন বছরের পর বছর। তিনি ছিলেন পৌরুষ ও প্রত্যয়ে ভরপুর, আবেগ ও করুণায় বিগলিত। তাই তাঁর জীবনের যে সাফল্য এবং অসাফল্য তা তৎকালীন বাঙলার সমাজ ও ধর্ম-জীবনের গতিপ্রকৃতি, সন্নীতি ও মানসিক শ্রেয়বুদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার বাঞ্ছনীয়।

আপনার সাধনা ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং চিন্তাচেতনার প্রতি অভিনিবিষ্ট লঙকে তাঁর নিজ দেশবাসীদের অনেকে অন্য এক মাপকাঠিতে নিন্দার্হ বলেছেন, সংকীর্ণমনা, রাজনৈতিক পাদরী বলে সমালোচনা করেছেন। কারণ, একেক সময় একেক আবেগ লঙের লেখা ও কাজকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছে যে তা তাঁর স্বদেশবাসী অনেকেরই স্বাদু মনে হয় নি। অনেকের আঁতে ঘা লাগাতে ক্রোধের কারণ হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি দমেন নি। তাঁর কাজে মনন ও সমীক্ষায় আহৃত তথ্যাদি যুক্ত থাকায় কায়েমীস্বার্থবাদীরা ভীত হয়েছিল। তিনি কাজ করতেন ফ্যাক্ট্স নিয়ে, শোনা কথা বা কল্পনা নির্ভর তথ্য নিয়ে এগোতেন না। তাছাড়া, তাঁর বোধির ব্যাপ্তি এবং শিক্ষারও বিস্তৃতি ছিল জগৎ জুড়ে। এ শিক্ষা মানে স্কুল-কলেজের ফরমাস শিক্ষা নয়, প্রকৃত জ্ঞান। অধিতবিদ্যাকে তিনি অভিজ্ঞতা সমাজ পরিবেশ এবং অনুভূতির রসে আত্মস্থ করে যে সব প্রবন্ধ গ্রন্থ, স্মারকলিপি প্রভৃতি রচনা করেছেন তাতে শুধু সার্থকই হননি, বহু রচনার জন্য অগ্রণী পুরুষ হিসাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

একদিক থেকে তিনি ছিলেম হিন্দু ও গ্রীকদের ন্যায় নিয়তির অলংঘ্যতায় বিশ্বাসী। গ্রীকরা বলতেন প্রতিকুলতার সঙ্গে মানুষকে লড়াই করতে হবে। কারণ, লড়াই জীবনের ধর্ম। কিন্তু ভবিতব্যের কাছে মাথা নোয়াতে হবে সকলকেই। তাঁর ইচ্ছাই সব। লঙের ভবিতব্য হচ্ছেন পরমপিতা যিশু, যিনি অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোয় নিয়ে আসেন। হিন্দু চিন্তায় ভবিতব্য অনেকটা স্থানই দখল করে আছেন। কিন্তু সকলেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন নি। দৈব বা পার্থিবশক্তিকে মান্য না করে চার্বাকপন্থীরা ঋণ করে ঘি খেতে বলেছেন। ইউলিসিসও দৈব বা পার্থিবশক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। শেষে অনেক নাকানিচুবানি খেয়ে কবুল করেছিলেন নিয়তির প্রাধান্য। হোমরীয় বীরগাথায়

যে আপোষরফা দেখি তা হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থের আপোষরফার চেয়ে কম আলোড়নকারী নয়। সোফোক্লিজের ট্রাজেডিতে নেমিসিস বা নিয়তির দুর্জয় শক্তি প্রায় পরমার্থের মতই অনতিক্রম্য। বাংলা নাটক ও যাত্রায় নিয়তির প্রাধান্য স্বীকৃত। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবেশের মতই গ্রীক থেকে রোমক, রোমক থেকে খ্রীষ্টান ধর্মে নিয়তিবাদ নিঃশব্দে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। জেমস লঙ এই নিয়তিবাদকে উপেক্ষা করে এগোতে পারেন নি। একদিকে তিনি নিয়তিবাদের শিকার, অপরদিকে পুরুষকারের প্রতি আস্থাশীল। আরিস্ততল, হেরাক্লিতাস প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একদিকে দেকার্তে স্পীনোজা, কান্টে প্রভৃতি অন্যদিকে হেগেল, মার্ক্স ও এঙ্গেলস প্রভৃতি যে ভবিতব্যবাদী ও হেতুবাদী তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে পরিসর সংকীর্ণ করে আমরা যদি গতশতকের দ্বিতীয়ার্ধের কিছু আগে ও পরে ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে খ্রীষ্ট মিশনারীদের যে তর্কযুদ্ধ হয় তা লক্ষ্য করি তবে দেখব সেখানেও নিয়তির প্রশ্রয়ে জন্মান্তর, কর্মফল, মোক্ষ প্রভৃতি নিয়ে রকমারী চিন্তা ও মতবাদের কথা উঠেছিল, এবং এখনও তা ঘুরপাক খাচ্ছে। পাদরী লঙ এর কোন ধারায় অনুবর্তী? তিনি ভবিতব্যবাদী না হেতুবাদী? একটু লক্ষ্য করলেই দেখব লঙের জীবনে নিয়তি নিয়ে আছে একটি অনড় প্রত্যয়, অন্য প্রত্যয় দেখি পুরুষকারের সাধনায় কর্মের সাধনায়। অর্থাৎ জেমস লঙের জীবনে উদ্যত ব্যক্তিত্ব বা পুরুষকারের যেমন স্থান আছে, তেমন আছে ভবিতব্যের স্থান ও ভালবাসার অত্যাচার।

নিষ্ঠা সাধনা ও নিরীক্ষার দ্বারা মানুষ যে জন্মগত পরিস্থিতির সীমা অতিক্রম করে অনেক দূরে পর্যন্ত যেতে পারে জেমস লঙের অগ্রজ পাদরী উইলিয়ম কেরী তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরও উত্তম, বোধহয় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্বামিত্র। কেরী ছিলেন মুচি, জাত ব্যবসা জুতো সেলাই, এখানেও তা করতে হয়েছে, তবু তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। কেরীর আগমনের কিছু আগে, অষ্টাদশ শতকের শেষপর্বে, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ১৭৮৬ সনে, জন টমাসের দ্বিতীয়বার এদেশে আসার পরই মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে রীতিমত প্রবৃত্ত হন। ১৭৯৩ সনে ইউলিয়ম কেরী এদেশে আসেন। তার ছ'বছর পর আসেন মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, ফাউন্টেন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি। ফাউন্টেন ও ওয়ার্ডের নাম ছিল লণ্ডনের পুলিশের খাতায়[১]। তাঁরা প্রকাশ্যে ফরাসী বিপ্লবের

১। David Kopf : *British Orientalism and the Bengali Renaissance*, KLM, Calcutta 1969.

কারণগুলো সমর্থন করেছিলেন। এই দলের ছ'জনকেই কোম্পানীর সরকার সন্দেহ করে। তাঁরা কোম্পানীর রাজত্বে স্থান না পেয়ে ডেনিশ আশ্রয় শ্রীরামপুরে চলে যান। ১৮০০ সনের ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধে ডেনিশ শক্তি ফ্রান্সের পক্ষে ছিল। এই যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ী হলে ১৮০১ সনের ৮ই মে কোম্পানীর সরকার শ্রীরামপুর দখল করে নেয়। তার আগেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের শিক্ষাদানের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর মিশনের সাহায্য নেয়ার ফলে সরকারের সঙ্গে পাদরীদের সম্পর্ক মধুর হতে থাকে।

১৮০০ সালে উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড-আদি বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে কতভাবে যুক্ত যোগ্য গবেষকেরা তা দেখিয়েছেন। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন না থাকলেও উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে জেমস লঙের যে অনেক ব্যাপারে মিল আছে তা স্মরণে রাখার দরকার থাকায় খুব সংক্ষেপে কেরী ও অন্যদের সম্পর্কে দুচার কথা জেনে নেব।

৪

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বাংলা গদ্যের প্রথম যুগকে কেরীর প্রভাবের যুগ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি কেরী, লঙ ইত্যাদির সত্যিকার প্রেম জন্মেছিল, যদিও সে প্রেম অহেতুকী ছিল না। উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল অখ্রীষ্টিয়ান সমাজে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষা চর্চা আরম্ভ করেন। কুড়ি বছর বয়সে কেরী বিয়ে করেন প্রভু জন ওয়ারের নিরক্ষরা শ্যালিকা ডরোথি প্লাকেটকে। সপরিবারে এদেশে আসেন। লঙ ছাব্বিশ বছর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় এদেশে আসেন, পরে বিবাহ করেন। কেরীকে ভারতবর্ষে আসতে উৎসাহিত করেন পাদরী টমাস। যে সময় তিনি এলেন সে সময় ও তার আগে কোম্পানীর সরকার পাদরী বিরোধী। তারা এতদ্দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও উৎসাহী ছিল না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নেটিভদের পরিচিতি করাতে তাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা অন্য এক উদ্দেশ্য বা খ্রীষ্টধর্মের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা নিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নেটিভদের পরিচিত করাতে উৎসাহী ছিলেন। সরকারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিশনারী পাদরীর দল নানাভাবে এদেশে এসে যান এবং ধর্ম ও শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ দেখাতে থাকেন।

ইংরেজ শাসনের আগে মুঘল যুগেই পাদরীরা এদেশে এসে গেছেন এবং

পলাশীর যুদ্ধের আগেই ১৭৪২ সনে "ওল্ড চ্যারিটি স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে[১]। এই স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ডেভিড ড্রামণ্ডের "ধর্মতলা একাডেমীতে"ও ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হত। ডিরোজিও এখানে শিক্ষা লাভ করেই হিন্দুস্কুলে যান। সীমিতভাবে হলেও এই সময় থেকে এতদ্দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজী ধীরে ধীরে বিস্তারিত হতে থাকে। গুটি গুটি পায়ে যে সব ইংরেজী জানা দেশী ও বিদেশী ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। পূর্বে ইংরেজী শিক্ষার সীমাবদ্ধ বেসরকারী ব্যবস্থা ছিল, তারজন্য যে প্রস্তুতি ছিল তা যখন হিন্দুকলেজের মাধ্যমে নিয়মমাফিক এবং অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের মধ্যে আসে তখন অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ইংরেজী বাঙালীমনকে আকৃষ্ট করতে পারে। কারণ, এ শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ থেকেই ইংরেজীর প্রসার, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আয়োজন চলে হিন্দু কলেজেরও অনেক আগে, যাকে আমরা ইংরেজী শিক্ষার প্রস্তুতির যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি।

কোম্পানীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ইয়র্কশায়রের কৃষক সন্তান মিঃ ব্রাউন ১৭৮৭ সনে কলকাতার "অরফান ইনষ্টিটিউটের" শিক্ষক। তিনি শিক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করতেন। তখনকার সরকার নেটিভদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকে স্বাগত জানান না। কারণ, তাতে নেটিভরা বিগড়ে গেলে তাদের আসল উদ্দেশ্য— অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন চালাতে অসুবিধা হবে। সুতরাং সরকার মিঃ ব্রাউনকে ইস্তাফা দিতে বাধ্য করান। চাকরিতে ইস্তাফা দিলেও তিনি এদেশ ছেড়ে চলে যান না। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। তাঁদের নেতৃত্ব দেন চার্লস গ্রাণ্ট, পাদরী টমাস প্রভৃতি। টমাসের অনুরোধে এলেন কেরী। তার আগে গ্রাণ্টস লর্ড কর্ণওয়ালিশের কাছে পাদরীদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান, কর্ণওয়ালিশ কোনপ্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি জানাতে অস্বীকার করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি প্রভাবশালী সংসদ সদস্য মিঃ উইলবার ফোর্সের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৯৩ সনের নতুন সনদ নেবার সময় সংসদ কোম্পানীর সরকারের নিকট ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি বিধানে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানায়। তা নিয়ে এদেশে ও বিলাতে বিতর্ক উপস্থিত হয়। শেষ অবধি সংসদ নির্দেশ বাতিল করে। এরই মধ্যে বহু পাদরী এদেশে চলে আসেন। তখন ঠিক হয়ে গ্রেট ব্রিটেন থেকে নতুন কোন পাদরী এদেশে আসবে না

পারেন তারজন্য প্রত্যেকটি পয়েন্টে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। কোম্পানীর ডিরেক্টরেরাও এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। তবু নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন করে বহু পাদরী আসতে থাকেন। এই সুযোগেই আসেন কেরী। এসে ওঠেন মালদহের মদনহাটিতে। পাদরী টমাসের মুন্সী রামরাম বসুর কাছে তিনি বাঙলা শেখেন। তিন বছর বাদে ১৭৯৬ সনে চারিত্রিক অপরাধের জন্য তিনি রামরাম বসুকে তাড়িয়ে দেন। ১৭৯৯ সনে কেরী মদনহাটি থেকে চলে আসেন উঠনি সাহেবের নীলকুঠি কিনে খিদিরপুর গ্রামে। ঐ বৎসরই মার্শম্যান আদি ছয়জন পাদরী তৎকালীন সরকারের তাড়া খেয়ে শ্রীরামপুর গিয়ে ওঠেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

তাঁরা শ্রীরামপুর থেকে নৌকাযোগে খিদিরপুর গিয়ে কেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কেরীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন শ্রীরামপুরে। প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুরে মিশন ১৮০০ সনে [১]। এই বৎসরই লর্ড ওয়েলেসলির চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাদরীদের সঙ্গেও হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হচ্ছে ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার প্রথম সংগঠন যেখানে ভারতীয়দের দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে[২]। কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ এশিয়াটিক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর মিশনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষযোগ ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং কলেজে শিক্ষাদানের ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী হয়। রাজী হয় শ্রীরামপুর মিশনও, কিন্তু কেরী এই ফাঁকে মিশনারীদের প্রতি সুবিচার ও সুযোগ সুবিধার কথাটা তুলে ধরেন। লর্ড ওয়েলেসলি শ্রীরামপুর মিশনের পাদরীদের ওপর নির্ভর করতে চান। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান হিসাবে ওয়েলেসলি এবং শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান হিসাবে কেরী একটা চুক্তিতে আসেন। এই চুক্তি বা "Wellesely's act of friendliness of the missionaries constituted the first *defecto* acceptance by Indian Government of missionary activity in India[৩] সরকারীভাবে মিশনারীদের স্বীকৃতি আসে ১৮০০ সনেই। ১৮০৫ সনের মধ্যেই মিশনারীরা সরকারের আস্থাভাজন। কেরী লিখেছেন—"We are in good terms with the Government.... I had breakfast with the Deputy Governor General yesterday

and his attitude was most cordial" (Carrey to Fuller, Dec. 10. 1805). অর্থাৎ মিশনারী ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার যে বাতাস এই সময় থেকে বইতে থাকে তা আর বন্ধ হয় না।

তবু মিশনারী পাদরীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে সরকারী আমলা ও স্বাধীন বণিকদের মন কষাকষি চলে। কারণ, মিশনারী পাদরীদের প্রবল উৎসাহ খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ও দীক্ষা। তারজন্য তাঁদের জনসাধারণের কাছে যেতে হয়, জনসাধারণের মতামত শুনতে হয়। কিন্তু কোম্পানীর লোকদের উৎসাহ যেন-তেন প্রকারে টাকা আয় করা। টাকা আয় করার ব্যাপারে অমানবিক অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন করা। অত্যাচারিত নেটিভরা প্রভুদের বা সাদা চামড়ার লোকদের এড়িয়ে চলতে অভিলাষী। ধর্মপ্রচারকদেরও তারা অত্যাচারী শোষক ইংরেজদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখতে থাকে। তাতে ধর্মপ্রচার ব্যাহত হয়। মিশনারী পাদরীদের একাংশ তখন সরকারের অমানবিক নীতির, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে থাকেন। এই প্রতিবাদের সামিল হন এদেশে বসবাসকারী কিছু ইউরোপীয় ভারত বন্ধু। তাঁরা বিলাতে কোম্পানীর অপকর্মের কথাও ছড়াতে থাকেন। বিলাতের কিছু-কিছু লোকও এই অপকর্মের বিরোধী ছিলেন, তাঁরাও অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন বন্ধের দাবীতে সরব হন। কুড়ি বছর অন্তর-অন্তর নতুন সনদ দানের সময় অনেকেই কোম্পানীর অপকর্মের উদাহরণ তুলে সংসদে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাদের নিরস্ত করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নিতে বা নেওয়াতে পারতেন না। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনকারী কিছু সাহেব ও বেশ কিছু মিশনারী পাদরী কোম্পানীর অপকর্মকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা মুনাফা-খোরদের যথেচ্ছ কাজের সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁদের মত প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সরকার আইনের সাহায্য নেন। নতুন প্রেস আইনে অনেকের মুখ বন্ধ হয় বটে, অন্তরের আগুন বেশী দিন চাপা থাকে না।

ইতিমধ্যে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতায় কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখানে এমন সব পণ্ডিত ও মৌলভী সৃষ্টি করা হতে থাকে যাঁরা কর্তাদের আইন বুঝিয়ে দিয়েই তৃপ্ত থাকতেন। সাধারণ শিক্ষার প্রসার তখনও হয় নি। কোম্পানীর সরকার বিলাতের কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পারেন যে নেটিভদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দরকার নেই। কারণ, শিক্ষা পেলেই নেটিভরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। অন্যদিকে বেশ কিছু মিশনারী ও শুভানুধ্যায়ী বিদেশী ক্রমাগত ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য দাবী জানিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন দেশীয় প্রধানেরাও।

৫

১৮১৩ সনের নতুন সনদ দেবার সময় সাব্যস্ত হয় সরকারকে প্রতিবৎসর ভারত-বাসীদের শিক্ষার জন্য অন্যূন একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। দেশীয় ভাষায় না ইংরেজীতে শিক্ষাদান করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সুপারিশ থাকে না। অনিচ্ছুক সরকার টালবাহানা করে আরও দশবছর কাটিয়ে দেয়। এবং ১৮২৩ সন থেকে প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ওপর জোর দিতে বাধ্য হয়। এই সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে শ্রীরামপুর মিশন, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠনের যে চাপ ছিল তা অনুমান করতে পারি।

সর্বপ্রাচীন বিদ্বৎসভা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ সনে। কিন্তু প্রায় ৪৫ বৎসর এই সোসাইটি "represented the elite of the European community in Calcutta" (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর একদিকে যেমন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে আসা হতে থাকে কলকাতায় অধ্যাপনার কাজ দিয়ে তেমন অন্যদিকে সরকারী খরচে দেশীয় ভাষায় নানা পুস্তক প্রকাশিতও হতে থাকে। এই সব সংগঠনের প্রচেষ্টায় প্রাচ্য ভাষার আলোচনা নতুন গতি পায়। এবং ইংরেজ সিভিলিয়ানদের একটা বড় অংশ প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের মহিমা অনুভব করতে আরম্ভ করেন। প্রাচ্য ভাষা চর্চার সঙ্গে বাঙলাভাষার বনিয়াদও পাকা হতে থাকে। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ কোম্পানীর দখলে আসে, কিন্তু মহীশূরের টিপুকে তখনো বাগে আনা যায় না, তবে, ১৮১৭-১৮ সনে মারাঠা শক্তিকে পুরোপুরি অধীনে আনা যায়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর দশবছর পরে, ১৮৪৯ সনের দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে, পাঞ্জাবও ইংরেজের অধীনে আসে। তার আগেই হায়দরাবাদের নিজামের সহায়তায় টিপু সুলতানকে পরাজিত করা যায়। পাঞ্জাব ও মহীশূর জয়ের পর আসমুদ্রহিমাচলে কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হয়।

স্মরণে আছে, কেরী যখন এলেন তখন এদেশে পাদরীরা অনাবশ্যক। তিনি মদনহাটি নীলকুঠীর সুপারিন্টেনডেণ্ট-এর চাকরি নিয়েছিলেন। এখানেই শ্রীরামপুর ছাপাখানার জন্ম হয়। এই ছাপাখানার লোভেই লর্ড ওয়েলেসলি কেরীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কেরীর নীলকুঠীর চাকরি অনেকটাই ছলনা। নিজেদের একজিস্টেন্স্ বজায় রাখার জন্যই ও-কাজ তাঁকে করতে হয়েছিল।

ইতিপূর্বে ১৮১৩ সনের সনদের ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৪ সনে কোম্পানীর সনদ শেষ হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই এ সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। তার ফলে ১৮১৩ সনে দেশ শাসন ও

ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে কোম্পানীর যে একচেটিয়া অধিকার ছিল তা সীমিত হয়, এবং শর্ত সাপেক্ষে অন্যদেরও এদেশে ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চতর সরকারী কর্মচারী নিয়োগ ছাড়া দেশ শাসনের যাবতীয় ভার কোম্পানীর ওপরই থাকে। এই সময় ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে পাদরীদের ওপর যেসব বাধা-নিষেধ ছিল তা-ও তুলে নেয়া হয়। এবং ভারতবর্ষীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে জন্যও যে অর্থ বরাদ্দ হয় কিছু পূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। এই সময় থেকে পূর্ণোদ্যোমে পাদরীদের আগমন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও দীক্ষার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। পাদরীদের কাজে প্রথমদিকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা বিব্রত বোধ করে না, কিন্তু পাদরীরাজ আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ সনে এদেশে এসে মহা হুলুস্থূলু বাঁধিয়ে দিলেন। তাঁর জেনারেল এসেম্‌ব্লি ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের টনক নড়ে। তিনি বেছে-বেছে উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বলতে থাকেন, একহাজার নিম্নশ্রেণীর লোককে দীক্ষা দেবার চেয়ে একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে দীক্ষা দিলে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। কলকাতার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মান্তর আন্দোলনের সূত্রপাত করে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোপীনাথ নন্দী প্রভৃতিকে দীক্ষা দেন। পরে কৃষ্ণমোহনও একাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৪০ সনে মধুসূদন দীক্ষিত হন এবং ১৮৫১ সনে তিনি নিজে দীক্ষা দেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে।[১]

উনিশ শতকের ত্রিশ থেকে যে ধর্মান্তর আন্দোলন তা উনষাট-ষাট অবধি অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে জেমস্ লঙ এদেশে এসে গেছেন এবং নানাভাবে তিনি নিজেকে একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মান্তর আন্দোলনও অন্যদিকে দেশীয় সমাজের মধ্যে মিশিয়ে ফেলতে পারেন। মিশনারী কার্যকলাপ তীব্র হলে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ খ্রীষ্টান বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সনাতনী ও ব্রহ্মবাদীরা একত্রিত কণ্ঠে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী প্রচার আরম্ভ করে দেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"সময় বুঝিয়া এই সময়ে সুবাগ্মী খ্রীষ্টিয় প্রচারক ডফ তাঁহার মধ্যবয়সের অদম্য উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। ডিরোজিও শিষ্য ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন সুহৃদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করার পর দেশের মধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে গেলে তাহা আর থামে

নাই। এই সময় বা ইহার কয়েক বৎসর পর প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। এতদ্ব্যতীত গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে খ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ানের পুত্র উমেশচন্দ্র সরকার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আশয়ে সস্ত্রীক পালাইয়া মিশনারীদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে মিশনারীদিগের হাত হইতে ছিঁড়িয়া লইবার জন্য তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা করেন। ডফ সাহেব সে পথে অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডয়মান হন। ইহা লইয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্তে পড়িয়া খ্রীষ্টিয় বিরোধী দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়ান।"[১] অবস্থা কি রূপ শোচনীয় হয়ে পড়ে তার আরেকটি বিবরণ পাই সংবাদপ্রভাকর পত্রে। "আমরা বিপুল বিলাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিতেছি সংপ্রতি ওলাউঠার হেঙ্গামা অপেক্ষা ঈশুখ্রীষ্টি হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েক দিবসের মধ্যে ৫/৭ পাঁচ-সাতটি হিন্দু শিশু এঁদো হেদোর কেঁদো গ্রাসে পরিণত হইয়াছে... আমরা দস্যুদিগকে অধিক ভয় করি না, যেহেতু তাহারা শাসনের শঙ্কা করে, পাদ্রিস্বরূপ দস্যুগণ শাসনের ভয় রাখে না।[২] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১লা আষাঢ় ১৭৬৭ শক) সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেন—"আমরা পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়াছি এবং এখনও অনুরোধ করিতেছি যে ইহার প্রতিকারের জন্য আপামর সাধারণ সকলে যত্নবান হও। দাবাগ্নি চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়াছে, এখনও যদি না নির্বাণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে অবিলম্বে সমুদায় দগ্ধ হইয়া ভষ্মসাৎ হইবে। বিবেচনা করিলে আমারদিগেরই সম্পূর্ণ দোষ। মিশনারীরা তাঁহাদের কৌশল গোপনে রাখে নাই। তাহারা আমারদের চক্ষুর সম্মুখে জাল বিস্তার করিতেছে আমরা যদি তাহাকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিয়াও অন্ধের ন্যায় তাহাতে পতিত হইব তবে আর উপায় কি?...খ্রীষ্টানেরা আমারদিগের দেশের বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আমারদিগের ধর্মনাশের জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে তাহার নিবারণের যত্ন করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাপূর্বক আমরা আপন সন্তান-দিগকে তাহারদিগের ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ করিতেছি।...অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা

কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরে রাখ। তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও।"[১] পাদরীদের পাঠশালায় হিন্দু ছেলেমেয়েরা যাতে না যায় তার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও দেশহিতৈষীব্যক্তি হিন্দু সমাজকে নানাভাবে সাবধান করতে থাকেন। কিন্তু তাতে হিন্দুদের টনক নড়ে না। তারা খ্রীষ্টান পাঠশালায় ছাত্র পাঠান বন্ধ করে না। পাদরীদের কার্যকলাপও বন্ধ হয় না।

সুদীর্ঘ সময় ধরে কি ভাবে পাদরীরা তাঁদের ধর্মদীক্ষা দিয়ে চলেছেন তার একটি হিসাব প্রকাশ করেছে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা। এই পত্রিকার হিসাবে দেখি ১৭৮৪ সনে ধর্ম প্রচারকদিগের সংখ্যা ৬৫, বাঙালী খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ১২৬৭৭, আরও সতের-আঠার বছর আগে—"খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রচার নিমিত্তে এদেশস্থ বিবিধ সভার মধ্যে চর্চ মিশনারী নামক একটি খ্রীষ্টিয়ান সভার চেষ্টার দ্বারা এদেশীয় ১৩০০ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তি এ পর্যন্ত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। তাহারদিগের মধ্যে মৃজাপুরে ১২২, কলিকাতার দক্ষিণে ১৯২, আগরপাড়ায় ৭০, বৰ্দ্ধমানে ৪৫, কৃষ্ণনগরে ৭৮৬ এবং গোরক্ষপুরে ৯৬ ব্যক্তি বসতি করিতেছে। যদিও ইহাদের মধ্যে ভদ্রলোক প্রায় নাই কিন্তু এদেশীয় লোকের অনুৎসাহ এরূপ থাকিলে ভদ্র সমাজে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রবল হইবার অসম্ভাবনা কি?" এ অনুমান যে অমূলক নয় তা কিছুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া গেল। ১৮৩০ সন থেকে আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অন্যান্য পাদরীরা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজের ওপর হাত বাড়ালেন। স্বার্থ চিন্তা থেকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে খ্রীষ্টান হবার বাসনা জেগে উঠল। চারদিকে দেখা দিল খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনে সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে পাদরীদের সমর্থন জানায়। নানা কায়দায় পাদরীদের রক্ষা করতে থাকে।

শিক্ষা জগতে মেকলে-আদি যেমন ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালালেন, তেমনি ধর্মজগতে এসে গেলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ। "Like Macaulay he (Dr. Duff) violently attacked Oriental languages while praising the usefulness of English—though he did so as an advocate not of British nationalism but of evangelization. Duff's *magnum opus India and Indian Mission*, ranks with Macaulay's *Minute*, Mill's *History*, and Grant's *Observations* as one of the most effective and highly publicised indictments of Hinduism. Probably no other missionary before or since aroused such organised opposition on the part

১। বিনয় ঘোষ প্রাগুক্ত

of Calcutta elite as did Duff. His goal, which seemed to fascinate him to the point of obsessions, was to convert the entire city of Calcutta, whose population of 2,000,000 was twice of his native Scotland."[১] বহু চেষ্টা করেও ডাফ সারা কলকাতা-বাসীকে খ্রীষ্টান করতে পারেন নি। কিছু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সন্তানদের খ্রীষ্টান করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ক্রমেই তাদের অনুৎসাহ তাঁকে হতাশ করে।

আলেকজান্ডার ডাফ ইংরেজের মন ও মেজাজ নিয়ে ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, আর উইলিয়ম কেরী ভারতীয় সমাজ-জীবনকে প্রত্যক্ষ করে যে ভারতীয় মন উপার্জন করেন সেই মন ও উপলব্ধিকে সম্বল করে অন্যভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এখানে উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে জেমস লঙের সহমর্মিতা অনেক বেশী। ডাফকে তীব্র সমালোচনা সহ্য করতে হয়, প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়, শেষ অবধি বাধ্য হয়ে এদেশ ছেড়ে চলেও যেতে হয় অনেকটা ভগ্ন হৃদয়ে, অকৃতকার্য হয়ে। ভারতবাসীকে ভারতীয় দেহ নিয়ে পুরোপুরি পশ্চিমা সাজাবার ব্যাপারে ডাফের যে প্রচেষ্টা, সমগ্র কলকাতাবাসীকে খ্রীষ্টান করার ব্যাপারে যে অসাফল্য, তা ডাফকে নিরাশ করে। অপরদিকে কেরী, লঙ ও অন্যান্য ভারতবন্ধু পাদরীরা এ দেশের ভাবধারায় অবগাহন করে এ দেশকেই নিজেদের জন্মভূমি বলে মেনে নিলেন। কেরী এদেশেই দেহ রাখেন। লঙ অসুস্থতাবশতঃ এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তবে এ দেশ ছেড়ে গেলেও যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এদেশের চিন্তায় মশগুল ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন থেকে ভারতের নানা ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। [লঙ এই গ্রন্থের একটি ক্যাটালগ নির্মাণ করেছেন। লঙের বইও শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়]। কিন্তু ডঃ ডাফের স্কটিশ মিশন থেকে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না। ডাফ নিজে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় গ্রন্থ বা রচনা প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন না, যদিও তিনি একাধিক ভাষা জানতেন। তবে ইংরেজীর সঙ্গে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে খুব অনাগ্রহী ছিলেন না। ডাফের জেনারেল এসেম্ব্লি বা স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলত। পাঠ্য-পুস্তক পুরোপুরি পাদরী নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক উচ্চ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত। কিন্তু ১৮৩৪ সনে কেরীর মৃত্যু পর্যন্ত শ্রীরামপুর কলেজের পাঠ্যসূচী ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাভাবনাকে নিয়েই এগিয়েছে। ১৮৪০ সনে লঙ যখন চার্চ মিশন সোসাইটির মীরজাপুর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এলেন, তখন

১। David Kopf. op. cit.

তিনিও ইউরোপের কায়দায়ই তাঁর বিদ্যালয়কে চালাতে চাইলেন। পরে যখন এদেশের ভাষা শিখলেন, সাহিত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক পাতালেন, সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন, তখন দেশীয় ভাষাও দেশীয় সাহিত্যের কার্যকারীতা বুঝে তা রক্ষার্থে সরব হলেন, দেশীয় সাধারণের উন্নতি কল্পে নিজেকে পুরোপুরি ভাবে নিয়োজিত করলেন।

৬

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ ও দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নির্ভীকভাবে স্বাধীন মতামত প্রচার করতে থাকায় সরকার বিব্রত হয়ে পড়ে। ফলে ১৭৯৯ সনের মে মাসে লর্ড ওয়েলেসলি প্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ১৮১৮ সনে লর্ড হেষ্টিংস এ আইন তুলে দিয়ে কতগুলো নিয়ম বেঁধে দেন যা অমান্য করলে সম্পাদককে জবাবদিহি করতে হত। প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর "মিরাৎ-উল-আখবার" বন্ধ করে আন্দোলনে নামলেন।[১] তার আগে ১৮১৭ সনে গোরাচাঁদ বসাকের চীৎপুরের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে। তবে ইংরেজীর ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়। বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৩৯ সনে কলেজ সংলগ্ন পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন নিজেও নতুন ইংরেজী স্কুল খুললেন।

১৮২৩ সনে নতুন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয়। রামমোহন-আদি দেশীয় প্রধানেরা তখন পাশ্চাত্য রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিলেন। সরকারী তত্ত্বাবধানে ১৮৩৫ সনের পূর্বে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয় না। যদিও বেসরকারীভাবে ইংরেজী শিক্ষা চালু ছিল হিন্দু-কলেজে ও অন্যত্র। যুগযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষিতরা ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এঁরাও ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র। ডিরোজিও ছাত্রদের মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে "অ্যাকাডেমিক এসোশিয়েশন" গঠন করেন। প্রাচীন হিন্দু সমাজ নব্যযুবকদের কাজকর্ম দেখে আঁতকে ওঠেন। তাঁদের চেষ্টায় ১৮৩১ সনে ডিরোজিও হিন্দু-কলেজের চাকরি থেকে অপসারিত হন। এর কিছুদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। ডিরোজিও, আলেকজাণ্ডার ডাফ এবং

লর্ড বেণ্টিক এঁরা তিনজনই সনাতনী হিন্দুদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যদিও এই তিনজনের সমজে-উন্নয়ন আন্দোলনের উদ্দেশ্য এক ছিল না।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদলকে খৃষ্টান করার চেষ্টায় আলেকজাণ্ডার ডাফ নানা কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন জেনারেল এসেম্ব্লি ইনস্টিটিউশন। অন্যদিকে নব্যযুবকেরা যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন স্বদেশবাসীর কাছে সে জ্ঞান বিতরণ করার সৎ উদ্দেশ্যে কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে বহু অবৈতনিকবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চললেন। তাঁরা দেশবিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন করে নিজেদের যে স্বাধীন মত গঠন করেছিলেন ধর্ম সমাজ শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাজগতের পণ্ডিতেরা আমাদের জানিয়েছেন হিন্দু কলেজ থেকেই ইংরেজী শিক্ষার শুরু, অর্থাৎ হিন্দু কলেজের আগে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার অবকাশ ছিল না। এ সংবাদ তথ্য নির্ভর নয়। হিন্দু কলেজের আগেও সীমাবদ্ধভাবে ইংরেজীর চর্চা হত এ দেশে। প্রাক-হিন্দু কলেজের যুগেও ইংরেজী জানা কিছু লোক ছিলেন বলেই হিন্দু কলেজ যেদিন থেকে অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন অনুযায়ী ইংরেজী শেখাতে আরম্ভ করেন সেদিন থেকেই এ ভাষা শেখার দিকে বাঙালী হিন্দুর নজর পড়ে। হিন্দু সমাজের অনেক পরে বাঙালী মুসলমান ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু কলেজ ইংরেজীকে ছাত্রসমাজের মধ্যে অনেকটাই জনপ্রিয় করে। অনেকটা বলছি এজন্য যে, এখানে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল। ইতিমধ্যে গোড়াসম্প্রদায়ের প্রবল বাধা সত্ত্বেও লর্ড বেণ্টিক সতী দাহ প্রথা রহিত করেন। সংবাদপত্রের উপর থেকে হেস্টিংস প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ তুলে না নিলেও তিনি তার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন। ১৮৩৩ সনের সনদে স্বদেশ শাসনে ইংরেজদের ন্যায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃতি পায়। ১৮৩৫ সনে সংবাদপত্রের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ উঠে যায়। ঐ বৎসরই ঠিক হয় সরকারী অর্থ প্রধানত ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনা নির্দিষ্ট গতি পায়। ১৮৩৮ সনে ভূম্যধি-কারী সভা গঠিত হয়। এই সভা প্রতিষ্ঠার বছরখানেক পর অ্যাডম স্মিথ ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন অ্যাডম স্মিথ ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তাঁর অধ্যক্ষতায় শিক্ষা সংস্কারের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে এদেশীয়দের কাছে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল। যে বৎসর স্মিথ লণ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন সে বৎসর জেমস লঙ চার্চ মিশন সোসাইটির কলেজ থেকে যাজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডেকনের কাজ পান। এই বৎসরই তাঁর ভারতবর্ষ আসার কথাও ঠিক হয়। লঙ লণ্ডনে রেভারেণ্ড অ্যাডম স্মিথের সঙ্গে দেখা করেন ভারতের অবস্থা, বিশেষ করে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, জানতে। লণ্ডন থেকে মীরজাপুরে স্কুলের দায়িত্ব দিয়ে লঙকে পাঠান হয়। সে দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যই তাঁর স্মিথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। পরে লঙ স্মিথের শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্টকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁর মতামত সমন্বিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও যুক্ত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাথনাথ বসু যখন স্মিথের রিপোর্টটি পুনঃপ্রকাশ করেন তখন তিনি পরিশিষ্টে লঙের রিপোর্টটিও যুক্ত করেন।

১৮৪৩ সনে জর্জ থমসন বিলাতে ভূম্যধিকারী সভার এজেন্ট নিযুক্ত হন। তার আগেই তিনি কলকাতা এসে গেছেন। তিনি ভারতবাসীর আর্থিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা দূরে করার জন্য কলম ধরেছিলেন, আন্দোলন করেছিলেন।

শহরে নানাধরণের আন্দোলন এবং বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা দেখতে পেয়ে মিশনারী পাদরীর দল গ্রাম্য পাঠশালা, দেশীর ভাষা ও শিক্ষা দেশীয়জনগনকে খৃীটান করার দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। ১৮১৮ সনে স্কুল বুক সোসাইটির চেষ্টায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ সনের মধ্যে এ সোসাইটির অধীনে ১৬৬টি স্কুল চলে আসে। কিন্তু লর্ড বেণ্টিকের আমলে এ সোসাইটি ক্ষয়িষ্ণু এবং সোসাইটির স্কুল সমূহের অবস্থা শোচনীয়[১]। ১৮৩০ সনে ধর্মসভা গঠিত হয়। অনেকের মতে ধর্মসভা সতী প্রথাকে সমর্থন করার জন্যই গঠিত হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর অন্য উদ্দেশও ছিল এবং সেগুলিই মুখ্য। এই সভা-ই প্রথমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে জাতীয়করণের দাবী জানায়, হিন্দুজীবন ও সংস্কৃতি রক্ষায় তৎপর হয় এবং আধুনিকতাকে মেনে নেয়। কিন্তু উগ্র পাশ্চাত্যানুকরণকে নিন্দা করে।[২] এই সনেই আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ডিরোজিও বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিরোধীতা আর গোঁড়া-সম্প্রদায়ের ডিরোজিও বিরোধীতার উদ্দেশ্য এক ছিল না। ডিরোজিও বিরোধীতার ব্যাপারে ধর্মসভার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ডাফের সহমত, আবার খৃীষ্টানধর্মে দীক্ষিত ব্যাপার নিয়ে ধর্মসভায় সঙ্গে ও অন্যান্য দেশীয় সভা ও দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে ডাফের বিরোধ। বিভিন্ন কারেন্ট ও ক্রসকারেন্টের মধ্য দিয়ে কলকাতার বাবু ও

সাধারণ সমাজ যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাফ ইত্যাদি পাদরীদের দীক্ষা দেবার চেষ্টা যখন তুঙ্গমুখী, তখন কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দুদের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার বহু উদাহরণ সহ সুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে বোমা ফাটালেন। কাশীপ্রসাদ ডাফের দিকে মুখ করে থাকা হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য আনতে সক্ষম হন। নতুন করে হিন্দুচিন্তা, প্রাচীনশিক্ষা, সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বাতাস বইতে আরম্ভ করে। তার ফলে পাদরী-সাহেবেরা হিন্দু কলেজের সামনে যে গীরজা স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন তা ভেস্তে যায়। এ সবের কিছু আগে উইলসন সাহেব ১৮২৯ সনে এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেশীয় সদস্য নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৭৮৪ থেকে এই সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বার খুলে গেলে রামকমল সেন, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এর সদস্যভুক্ত হন। প্রিন্সেপ যখন সম্পাদক তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটিতে ঢুকেই সাড়া জাগালেন। জেমস-লঙ যখন এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য তখন তা দেশী ও বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত। ১৮৪৩ সনের ৬ই ডিসেম্বর লঙ এশিয়াটিক সোসাইটির এসোসিয়েট সদস্য নির্বাচিত হন, এবং এই বৎসরই "Table of Comparative Philosophy shewing specimens of the effinity of the Greek, Latin and English languages with Sanskrit, Persian, Russian, Celtic, Web Lithunian, German, and Anglo-Saxon" রচনার দ্বারা বিদ্বৎ সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটি জার্নালে তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সনে—"Analysis of the Bengali Poem Rajmala, or Chronicles of Tripura." সঠিক স্থানে তাঁর রচনাদি নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ পাওয়া যাবে।

মনে রাখতে হবে জেমস লঙ এদেশে আসার আগে দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা যেমন নানা দলে বিভক্ত, তেমন চলছে পাদরী সাহেবদের দৌরাত্ম। সাধারণ মানুষ দিশেহারা। ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে শিক্ষানীতি। বিভিন্ন সভা ও সংগঠন নানাভাবে দেশীয়লোকদের সমস্যাদির কথা কর্তাদের কাছে তুলে ধরতে থাকেন। তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইয়ংবেঙ্গল দল হিন্দুসংস্কৃতি পুনরুত্থানের ব্যাপারে একরকম চিন্তা করছেন, সনাতনপন্থীরা অন্যরকম চিন্তা করছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটা বৃহৎ অংশ প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

রক্ষায় চেষ্টিত হলেন, ক্ষুদ্র এক অংশ খ্রীষ্টধর্মের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। বুদ্ধিমান লঙ এসব দেখে, দেশীয় সমাজের ভাবচরিত্র প্রত্যক্ষ করে, নিজের পথ নির্দিষ্ট করে এগিয়ে যেতে থাকেন।

পূর্বেই বলেছি জেমস লঙ উইলিয়ম কেরীর ন্যায় অখ্রীষ্টান সমাজে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে নিলেও তাঁর বিশ্ববোধ হিন্দু ও মুসলমানের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করেছে। মননের বিপুল বিস্তারে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞানপাঠের দ্বারা বিজ্ঞানীর ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ থাকার শক্তি অর্জন করেছিলেন। তাই সর্বদাই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যকে আঁকড়ে থাকতে পারেন নি। উপলব্ধির আন্তরিকতায় তিনি আপামর জনতার সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় বাছবিচার তাঁকে আরষ্ট করে নি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব ও জ্ঞান বিনিময়ের অন্যতম দূত হিসাবে জেমস লঙ গত শতকের অন্যতম একটি অবিস্মরণীয় নাম। আশৈশব ধর্মচর্চার ফলে বিভিন্ন ধর্মীয়গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি পাঠ, চর্চা ও অনুশীলন এবং তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তিনি বহু অনুরাগী ও বিতরাগী সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ, তাঁর নিজস্ব মননস্বাতন্ত্র। খ্রীস্টীয় আদর্শবোধের মানদণ্ডে বাস্তব জীবনযাত্রা ও লোককল্যাণের জন্য তিনি কাজ করে গেছেন, বহু ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ও সংশয় ঘোষণা করেছেন। এসব করার জন্য অনেকসময় তাঁর অনেক কাজে স্ববিরোধ দেখা দিয়েছে। স্ববিরোধে ফুটে উঠেছে আন্তরিকতা, ফুটে উঠেছে এমন একটি জীবনবোধ যেখানে ধর্ম ও রাজনীতিকে দুটি আলাদা মহলের বস্তু হিসাবে দেখা হয় না। নীলকরদের সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করে লঙকে যাঁরা রাজনৈতিক পাদরী হিসাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের জবাবে জোর গলায় বলেছিলেন—"Christianity itself is political in the extended sense" [১] ধর্মের উদার ও মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজনীতির শুদ্ধি ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, গেয়েছেন জেমস লঙ। তাঁরা সার্বজনীন প্রীতি ও করুণাকে আচরণীয় আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন।

খ্রীষ্টিয় নৈতিক আদর্শের প্রতি লঙের যে অটল বিশ্বাস সে বিশ্বাস থেকেই তিনি কৃষকের উন্নতি, দাসপ্রথার অবসান, শোষকের নিপাত ও অত্যাচারীর বিনাশ কামনা করেছেন। রক্তপাতকে পরিহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শান্তির অতন্দ্রপ্রহারা একজন মিশনারীর পবিত্র কর্ম। এদেশে

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে, তাঁর মতে, জমিতে কৃষকের রায়তি সত্ত্ব দিতে হবে। তা না-দিলে রায়তদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আসবে না। বাঙলার রায়তেরা যদি দাসদের মত, ভবঘুরেদের মত বা দিনমজুরদের মত ব্যবহৃত হয় তবে কোন শক্তিমানই বেশীদিন এখানে লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে না। তারা গ্রীকপুরাণের বহু নিন্দিত রাজা সিসিফাসের মত ব্যর্থ হবে। তিনি লিখেছেন—"If the Bengal ryot is to be treated as a serf or a mere of squatter or day-labourer, the missionary, the school master, even the Developer of the resources of India, will find their work that of Sisyphus—vain and useless." [১] রায়তি-সত্ত্বদানের সুফলের উদাহরণ টেনে তিনি লিখেছেন—সংখ্যাতত্ত্ব বলবে "that in French, Switzarland., Holland, Belgium, Sweden, Denmark, Saxony, the education of the peasant, along with the security of tenure he enjoys on his small farms, has encouraged, industrious, temperate, virtuous, and cleanly habits, fostered a respect for poperty, increased social comforts, cherished a spirit of healthy and active independence, improved the cultivation of the land, lessened pauperism, and has rendered the people averse to revolution, and friends of order". [২] তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতার শত্রু আর স্বৈরাচারের বন্ধুর দল কোন দেশে কোন কালে সফল হয়নি, হবে না। লঙের এই বিশ্বাস মানবতার মৃণালবৃন্তে ভর করে বাঙালীদের সেবায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গতঃ জেমস লঙ যখন এদেশে এলেন তখন এদেশ শাসিত হচ্ছে বণিক বা ফ্রি-ট্রেডারদের দ্বারা। তাঁর আগমনের সতের-আঠার বছরের মধ্যে দেশ শাসনের দায়িত্ব কোম্পানীর হাত থেকে গিয়ে ন্যস্ত হয় কুইনের ওপর। এই পরিবর্তনের মূলে শুধুমাত্র সিপাহী বা প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ-ই দায়ী একথা মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে ফ্রি-ট্রেডারদের জোরজুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন এতই বেপরোয়া ছিল যে তার বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ, এদেশে বসবাসকারী বেসরকারী ইউরোপীয়দের একাংশ, পাদরীদের একাংশও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বীতরাগের কথা বিলাতের বন্ধুদের কাছে, ক্ষমতাবানদের কাছে, জানাতে থাকেন। বিলাতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষের একাংশ বণিকদের

অপশাসন, বেআইনীকাজ, স্বেচ্ছাচারিতা, লুণ্ঠন ও শোষণকে ধিক্কার দিতে থাকেন, সমালোচনা করতে থাকেন, তাঁদের দলে লোক টানতে থাকেন। ফ্রি-ট্রেডারদের আইনের শাসনে আনার জন্য নানামহল থেকে দাবী ওঠে, সংবাদপত্রে লেখালেখি আরম্ভ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র, মেমরেন্ডাম প্রভৃতি যেতে থাকে। এর মধ্যে শুরু হয়ে যায় সিপাহী বিদ্রোহ। অচিরেই এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হলেও কর্তৃপক্ষ ভয়ানক ঘাবড়ে যায়।

জেমস লঙ শিশু বয়সে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের যে চরিত্র দেখে এসেছেন তাঁর মাতৃভূমি আয়ারল্যান্ডে, সেই একই চরিত্র দেখতে পান ভারতবর্ষে। দেখলেই ওদের চেনা যায়। অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছায় সময়ের তালে তালে এদেশের সাধারণমানুষ বিলাতের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন লিবারেল সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে যখন আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে থাকে তখন জেমস লঙ লক্ষ্য করলেন, তাঁর মাতৃভূমি আয়ারল্যান্ড থেকেও আওয়াজ উঠেছে—জুলুমবাজী বন্ধ কর, শোষণ করা চলবে না, আইনের শাসন কায়েম কর ইত্যাদি। লড়াই চলে ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্টান্টদের। প্রোটেস্টান্ট ধর্ম বিদেশী ধর্ম বলে বিবেচিত হত ক্যাথলিকদের কাছে। লঙ এদেশের ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে, রায়তদের ওপর অত্যারের ব্যাপারে, একাধিকবার আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে এদেশের তুলনা করেছেন বিভিন্ন নিবন্ধ ও বক্তৃতায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অত্যাচারে-উৎপীড়নে পীড়িত লক্ষ লক্ষ আয়ারল্যান্ডবাসী ভূমিহীন হয়ে আমেরিকা ও অন্যত্র পালিয়ে যায়। ভারতের অবস্থা প্রায় সেদিকেই চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে লঙ কষ্ট পান। স্বদেশের কৃষক নিপীড়নের, সন্ত্রাস সৃষ্টির ছবি অন্তরে গেঁথে নিয়ে লঙ যখন এদেশের দুর্দশাগ্রস্থ, ভুখা মানুষদের মধ্যে কাজে নামলেন তখন দেখলেন এদেশের সাধারণমানুষ সাদা চামড়ার মানুষ দেখলেই আঁতকে ওঠে, তাদের এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। ভাবটা এমন—সাদা চামড়ার লোক মাত্রেই লুঠেরা, তঞ্চক, উৎপীড়ক ও শোষক। তারা আইন মানে না, শাসন মানে না, তারা যা করবে সেটা আইন, যা বলবে সেটা শাসন। বোঝে শুধু টাকা। শোষক ইংরেজদের প্রতি লঙ বীতশ্রদ্ধ দুটি কারণে, প্রথম, ওরা খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের অন্তরায় এবং দ্বিতীয়, আইন, শাসন, মানবতা বাদ দিয়ে যে জীবন সে জীবন উচ্ছৃঙ্খল, বন্য, হিংস্র এবং বিবেকহীন। মানবতাবাদী লঙের কাছে উভয়শ্রেণীর মানুষই পরিত্যাজ্য। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা জনসাধারণকে বোঝাবার যে চেষ্টা তিনি করেন জনসাধারণ প্রথমে তা চালবাজী বলে গ্রহণ করে। মনে করে ছলচাতুরী করে তাদিগকে বশ করার এটা একটা চাল। লঙ বিলাতের

বন্ধুদের, এদেশের মিশনারীদের, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইউরোপীয়দের এসব কথা জানালেন। তাঁদের অনেকেও বণিকদের শোষণ ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শাসকদলের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা কোম্পানীর হঠকারী নীতি ও সর্দারী পছন্দ করেন না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু মনেপ্রাণে বণিকদের সব কাজ মানিয়ে নিতে পারছেন না। সমস্ত ন্যায় ও নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কোম্পানীর লোকেরা তাঁদের দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নেয় যাতে তাঁদের সায় নেই, অথচ করতে হয়। লঙ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যে নানাচাপের জন্য কাগজে কলমে কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলেও বাস্তবে দেখা যেতে থাকে কোম্পানীর লোকেদের বাড়াবাড়ি নিয়ে কোনরকম কোন কথা বলার চেষ্টা যে-ই করেছে সে-ই তাদের শিকার হয়েছে। শিকার হয়েছেন জেমস লঙ নিজে, শিকার হয়েছেন স্যার সীটনকার, এমন কি, ছোটলাট স্যার জে. পি. গ্র্যাণ্ট অবধি।[১]

ভুলে গেলে চলবে না যে যে-যুগে তিনি নানাধরণের কাজ করে গেছেন সে-যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে মুক্ত মননসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞানের নানা উপাদান শোধন করে নিতে শিখেছিলেন। মুক্তবোধ সম্পন্ন বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে লঙের যোগাযোগ ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন বৈজ্ঞানিক মননের অধিকারী। এদেশের ও ওদেশের নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার জন্য, এদেশীয় জনগণের দুঃখদুর্দশার উপর সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকার জন্য, ইংলণ্ডের অন্যতম কলোনী আয়ারলাণ্ডের সন্তান হবার জন্য, তিনি বণিক তথা ফ্রি-ট্রেডার বা শোষকদের হাড়ে হাড়ে চিনতেন। প্রতিপত্তিশালী স্বাধীন ব্যবসায়ীদের অত্যাচার, অনাচার, অসাধুতার উপর তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষানীতিকে তিনি মানবতাবাদী মাপকাঠী দিয়ে মেপে চলতেন। সেজন্য স্বদেশী উৎপীড়কদের সমালোচনা করেছেন। কেননা, তারা খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের বাঁধা হচ্ছে এবং স্বদেশীয় শাসকদের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে। তাঁর এ বোধের জন্য একদিকে তিনি স্বদেশীয় স্বার্থবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন, অন্যদিকে এতদ্দেশীয়দের দ্বারা কখনো অভিনন্দিত কখনো নিন্দিত হয়েছেন।

আইরিশ হলেও ইংরেজদের মন ও চরিত্র পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন জেমস লঙ। এই ইংরেজ-চরিত্রের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা এখানে

উল্লেখের দাবী রাখে। ইংরেজ-জাতি অদ্ভুত জাতি। তাঁরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, কঠোর পরিশ্রমী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আইনের অনুরক্ত। আগামী বিশ-তিরিশ বছর পরে কি ঘটতে যাচ্ছে তা আন্দাজ করে নেবার মত মানসিকতা ও বোধ তাঁদের আছে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনায় ক্ষমতাবান শাসন ও শোষণকে একই রজ্জুতে বেঁধে তা চালনা করার বলে বলীয়ান। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে চটপট এবং অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী। নিজেরা নিজেদের কাজের দোষত্রুটী বুঝতে পারেন, সমালোচনা করতে পারেন। বাণিজ্য এবং শোষণে যেমন পটু, তেমন বিশ্বস্ত আইন মান্য করতে, ঐতিহ্যকে সম্মান করতে। ইংরেজ মাত্রেই যেমন বণিক নয়, তেমন সব ইংরেজই বণিকদের দোসর নয়।

স্বাধীন বা ফ্রি-ট্রেডারদের শাসন করা না গেলে ওরা ইংরেজ শাসনকে দুর্বল করে অবসান ঘটাবার কারণ হবে, এ কথা অনেক আগেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা ফ্রি-ট্রেডারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাদের অপকর্ম, অত্যাচার, উৎপীড়ণের কাহিনী তুলে ধরেছিলেন খাস বিলাতে। যখন এতদ্দেশীয়রা এ সব কাজ করতে সাহস পেত না তখনই তাঁরা একাজ করেছেন। বলেছেন, স্বার্থবাদী মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের সংযত করতে হবে, তাদের আইনের শাসনে বেঁধে ফেলতে হবে। তা না করলে তাদের দুর্দমনীয় লোভ ইংরেজ রাজত্বকে তথা গোটা ইংরেজ জাতিকে রসাতলে নিয়ে যাবে। নিজেরা নিজেদের লোকদের কঠোর ও কঠিন ভাষায় সমালোচনা করতে পারার মত সাহস ও মনের জোর ইংরেজদের আছে। কিন্তু মানুষের সুবুদ্ধি যখন কাজ করে না তখন সে উম্মাদ। তখন সে ভয়ঙ্কর। প্রচন্ড দাপটে তখন কুবুদ্ধি সুবুদ্ধির ওপর সর্দারী করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাই একের পর এক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে— সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আদিবাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ প্রভৃতি। এই সব বিদ্রোহ ও সচেতনতার পথ ধরে এগিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লব। তবু স্বাধীন ব্যবসায়ী ইংরেজদের দল, শোষকদের দল শুভানুধ্যায়ীদের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করে না। গ্রাহ্য তো করেই না পরন্তু তাঁদের মুখ বন্ধ করার জন্য একের পর এক ফন্দী এঁটে চলে। এই বণিকেরাই লন্ডনে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শ্লোগান তুলে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন লন্ডনের পাদরী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায় মানবতার জয়গান গাইবার উদ্দেশ্যে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও ছিলেন তাদের সহযোগী। ১৮৩২ সনের রিফর্ম বিলে এদের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করার পর বণিকেরা প্রতিশ্রুতি পালন করে

না। মানুষের স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেরা নতুন কায়দায় শোষণ ও লুণ্ঠনে মাতে। চার্চকেও নতুন ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চালায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনবৈষম্য ও শিল্পবণিকদের অপরিসীম লোভ দেখে যে সব পাদরী এই সব লোভী ব্যক্তিদের সমালোচনায় এগিয়ে আসেন তাঁদের একজন জেমস লঙ। তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে থাকেন সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে বণিকপ্রভুদের কোন তফাৎ নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে সামন্তপ্রভুদের চেয়েও নতুন বণিকপ্রভুরা ভয়ংকর। এই চিন্তায় চিন্তিত পাদরীদের দ্বারা ভিক্টোরিয়া যুগের শুরুতেই চার্টিষ্ট আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় ইংলণ্ডে।

১৮৩০ থেকে ১৮৫০ অবধি বণিক ও তাদের বশম্বদরা খ্রীষ্টানদের আক্রমণ বিষয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে। পাদরীরাও সুসমাচারের বাণী প্রচারের ফাঁকে-ফাঁকে বণিকদের লোভ দমন করার ব্যাপারে ন্যায় ও নীতির কথা তুলে ধরতে থাকেন। অনেকেই প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নভাবে খ্রীষ্টান ইণ্টার-নেশনালিজমকে সমর্থণ করতে থাকে। পাদরীরা সরাসরি বলতে আরম্ভ করেন কারখানার মালিকদের লোভ তাঁদের মনুষ্যত্ব ও বিবেক কেড়ে নিয়েছে। রেভারেণ্ড গ্যাসকেলের স্ত্রী শ্রীমতি গ্যাসকেল খ্রীষ্টান পাদরীদের সমর্থণে কলম ধরলেন। শার্লট এলিজাবেথ সরাসরি লিখলেন, কারখানার মালিকেরা শয়তানের সঙ্গী, কণ্ট্রাক্ট লেবার মানে ভণ্ডামী। এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে এদের কঠিন শাসনে বেঁধে ফেলতে হবে। জনচৈতন্যকে বাড়াতে হবে।

এই লিবারেল ভাবধারার ইংরেজরা শাসনকে পাকাপোক্ত ও দীর্ঘায়ু করার ইচ্ছা নিয়ে শোষক ও উৎপীড়ক বণিকদের শাসনের আওতায় আনার পক্ষপাতী ছিলেন। লঙের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ অনেকটা লিবারেল ভাবধারা ঘেঁষা। তিনি স্বদেশীয়-দের সমালোচনা করতেন—স্বদেশীয় শাসনকে পাকাপোক্ত করতে। শিক্ষক হিসাবে তিনি যেমন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, মানব দরদী ; পাদরী হিসাবেও তেমনি ধর্মনিষ্ঠ ও অত্যাচারবিরোধী। ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে যেমন পটু ছিলেন, তেমন দেশীয় সাধারণের সঙ্গে আন্তরিক ছিলেন। ক্লাশের পড়াশুনা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তদের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানসমূহকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতেন। কোন একটি প্রসঙ্গ তুলে ছাত্রদের সেই বিষয় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে বলতেন, তাতে ছাত্রদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। লঙকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বুঝতে হলে এ সব স্মরণে রাখতে হবে। তাঁর বৈচিত্র্যময় স্বভাবটিকেও বুঝতে হবে।

আরো একটা ব্যাপারে মনে রাখতে হবে। লঙের সময় সরকারী নীতি পাদরী

ঘেঁষা। তাই সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা তাঁর কম জোটে নি। এ সম্পর্কে সরকারী স্বীকৃতি আছে। তবুও তিনি যখন-তখন বণিক ও সরকারের সমালোচনা করেছেন। কারণ, তাঁর মানবতাবাদ তাঁকে ঠেলা দিয়েছে অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন বিরোধী হতে। তিনি সরকারকে সাহায্য করতে ইউরোপীয়দের স্বার্থ-রক্ষায় যতটা উৎসাহী ছিলেন ঠিক ততটাই উৎসাহী ছিলেন দুঃস্থ দেশীয় জনগণের সেবায়। খ্রীষ্টিয় মানবতাবোধের শিক্ষা থেকেই যে তিনি এ চরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন সে কথাও ভুললে চলবে না।

৯

১৮৪০-এর হিন্দু সমাজের আদর্শগত রূপ তিরিশের মতই অপরিস্কার। সমাজ সংস্কারে রামমোহনপন্থীরা মানসিক দিক থেকে দুর্বল। নতুন অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই রক্ষণশীল। একটা ক্ষুদ্র দল উদারপন্থী। ইংরেজী শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দু-বিদ্বেষী, অন্যেরা রক্ষণশীল বা গোঁড়া অথবা বলা যেতে পারে, উদার বা নিরপেক্ষ। তবে খ্রীষ্টান পাদরীদের ব্যাপারে সকলেই আতঙ্কিত। পাদরীরা যে সারাদেশে বিধর্মী সৃষ্টি করে চলেছেন তাতে সকলেই শঙ্কিত। সকলেই খ্রীষ্টান আগ্রাসন বন্ধ করতে সচেষ্ট। দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলো খ্রীষ্টান আগ্রাসনের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করাতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিকেও ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ১৮৪৪-৪৫ সনে। আরও প্রায় বিশ বছর বাদে একই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবকে ১৮৬৩ সনে। অর্থাৎ ১৮৩০ সন থেকে পাদরীদের যে আগ্রাসন তা চল্লিশে তীব্রতা পেয়ে পঞ্চাশের দশকে ব্যাপক হয়; ষাটের দশক থেকে ধীরে ধীরে সংযত হতে থাকে। ১৮৫৯-৬০ সনে পাদরীরা দীক্ষার ব্যাপারে রাশ টেনে ধরতে বাধ্য হন। এই রাশটানার পেছনে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের হাত ছিল।

সামাজিক প্রগতির বিরুদ্ধে সনাতন ধর্মী হিন্দুদের আক্রমণ, নব্যদলের স্বধর্মের ওপর বিদ্বেষ ও পাদরীদের খ্রীষ্টান করার তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বুদ্ধিজীবীদের অনেকে ব্রাহ্ম-সমাজের ছাউনির নীচে এসে মিলিত হলেন। লোকচিত্তকে ধর্মক্ষেত্রে বহুমুখী না করে অন্তর্মুখী করার এই আন্দোলনের সঙ্গে ইউরোপের প্রোটেস্টান্ট ধর্মান্দোলনের আংশিক সাদৃশ্য আছে। জেমস লঙ প্রোটেস্টান্ট পাদরী। ক্যাথলিক আয়ারল্যান্ডের প্রোটেস্টান্ট সমাজ ও পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। তিনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় বিরোধ ও কোন্দল

সমূহ স্বদেশের রোমানক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট বিরোধের আয়নায় ফেলে দেখতে লাগলেন। যদিও ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট বিরোধ ও সংগ্রামের মূলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ছিল হিন্দু সমাজের দলীয় কোন্দলে সে রকম কোন ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া, এ কোন্দল রক্তক্ষয়ীও ছিল না। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট লড়াই বা Sinn Feinn আন্দোলন ছিল রক্তক্ষয়ী। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সনে আয়ারল্যান্ড বিভক্ত হয়। লঙ জীবিতাবস্থায় নিজ দেশে যে ধর্মীয় আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছেন তা পরিণতি লাভ করে তাঁর মৃত্যুর বাষট্টি বৎসর পর রিপাবলিক অব্ আয়ারল্যান্ড গঠনের দ্বারা। কিন্তু এর পিছনে আয়াল্যান্ডবাসীর সুদীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। শিশু বয়স থেকে লঙ নিজ দেশের স্বদেশীয় শোষকদের শোষণ ও ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখেছেন। কৈশরে লক্ষ্য করেছেন রাশিয়ায় জারের শোষণ, কৃষক ও ভূমিদাস আন্দোলন, এবং যৌবনের পূর্ণ উদ্যম নিয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন ভারতবর্ষের বণিক শাসক ও শোষকদের কার্যকলাপ, শোষিতদের বিদ্রোহ এবং দেশীয় সমাজের আদর্শগত ধর্ম বিরোধ। এ সবই তাঁর মনের ও চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তার উপর ফরাসী-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব এবং অন্যান্য বিপ্লব ও আন্দোলনাদির ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তিনি নিজেই নিজের পথ ঠিক করে নিয়েছিলেন।

এ দেশে আসার কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলেন বিদ্যাসাগর, কেশব প্রভৃতির আগমনে হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল ভাবধারা খরস্রোতা হয়েছে। এই সময় থেকে কোম্পানীর শাসকদের সঙ্গে দেশীয় উপশাসকদের শোষণ ও উৎপীড়ন নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে। অর্থাৎ এতদ্দেশীয়রা নিজ দেশের অত্যাচারী, উৎপীড়ক, শোষকদের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করতে থাকেন। নতুন ভূস্বামীর দল রাজস্ব ছাড়া বাটা, বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বণী, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করে যেভাবে প্রজা নিপীড়ণ করতে থাকে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। এদের বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষ ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকে। তার ওপর প্রজাদের গৃহে বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা কোন উৎসব অনুষ্ঠান করলে ভূস্বামীদের শুল্কদান করতে হত প্রায় নিয়মিত। এসবের জন্য প্রজা সাধারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে। তার ওপর আইন ও শাসন ভঙ্গুর, চুরি, ডাকাতি, কলহ-বিবাদ, ভ্রূণ হত্যা ; আমলাদের "বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন, ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণার আলোচনায় আর ধৈর্য রাখা অসাধ্য" হয়ে পড়ে [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা]। স্বার্থপরতা, কত্রবৎ হৃদয়হীনতা, পরশ্রীকাতরতা, 'দারুণ নীলকরদের নিদারুণ গোমস্তা দালাল'

শ্রেণীয়রা সমগ্র সমাজকে পঙ্গু, অথর্ব করে তুললে তার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হতে আরম্ভ করে। আরম্ভ হয় প্রগতিশীল আন্দোলন। বিবাহ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, ধর্মাচরণাদি-সংস্কার, স্বদেশ-চিন্তা প্রভৃতি যখন বাঙালীকে নবজাগরণের দিকে ঠেলে দিতে থাকে তখন জেমস লঙ বাঙালীদের সঙ্গে থেকে বাঙলার সমাজ, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করতে থাকেন। এই সময় বাঙলার ও বাঙালীর যে ইতিহাস তা বুঝতে হলে বুঝতে হবে—"a history of two civilizations in contact, of the institutional innovations that served as net works of interaction between them and of unique pattern and universal process of culture change that resulted from them."[১] লঙের মুক্তবুদ্ধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা এ জিনিসটি বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখব এই বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত ছিল। এই বোধ থেকে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে অনেক ধাক্কা খেয়েছেন। কারণ, তিনি যে সময় এ চিন্তা নিয়ে এগিয়েছেন সে সময় এ চিন্তা অনুধাবন করার মত লোক বেশী ছিল না। তাঁর কালের থেকে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা এগিয়ে ছিলেন।

নতুন শিক্ষানীতি গৃহীত হলে "দি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি" বন্ধ হয় ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পঙ্গু হয়ে পড়ে। ১৮৪৩ সনে সীটনকার-এই কলেজ থেকে স্বর্ণপদক পেয়ে উত্তীর্ণ হলে কলেজের সাময়িক সুদিন আসে। এই সময় থেকেই সীটনকারের সঙ্গে লঙের ঘনিষ্ঠতা। কলেজের দুর্দিনে কলেজকে চালু রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী লিখলেন—"no college, no buildings, no rooms, no professors, no lecturers, but only a few Moonsis, whom the Government pays but who have no employment."[২] ফলে কলেজটি 'বোর্ড অব একজামিনার্স'-এর অঙ্গীভূত হয়ে উঠে যায়। এই কলেজে একটি ভাল গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারটি ১৮১৮ পর্যন্ত জনগণের ব্যবহার আসে না। কিন্তু ১৮১৬ থেকেই কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে দাবী উঠতে থাকে। হেস্টিংস তখন কলেজের উপগ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুরকে নির্দেশ দেন লাইব্রেরীর গ্রন্থ ও পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করতে। ১৮১৭ সনে তালিকা প্রস্তুত হলে দেখা যায় ৮,৩৪১টি ছাপা বই এবং ২,৯৯৪টি পুঁথি আছে। এই বই ও পুঁথি হচ্ছে ইংলিশ লাইব্রেরী এবং ভাষা লাইব্রেরী এই

১। David Kopf. op. cit ২। ঐ

দুই সংস্থার মোট গ্রন্থ। কলেজ লাইব্রেরীয়ান মিঃ অ্যান্টনী লকেট মিঃ গ্র্যান্টকে জানালেন—"The English library in the college is small but valuable... The whole collection however does not probably exceed 2000 volumes and will constitute I believe the only public library in India".[১] প্রস্তুত ক্যাটালগটি ১৮১৮ সনে ইউরোপীয় ও দেশীয় সাহিত্যরসিকদের কাছে উন্মুক্ত করা হয়।

এই বৎসর এপ্রিল মাস থেকে মাসিক পত্রিকা "দিগ্দর্শন" ও মে মাস থেকে "সমাচার দর্পণ", "বাঙ্গাল গেজেটি" এবং জুন মাস থেকে "The Friend of India" প্রকাশিত হতে থাকে। এর কিছুদিন আগে ১৮১৪ সনে কলকাতায় এসে ১৮১৫ সনে "বেদান্তগ্রন্থ" প্রকাশের দ্বারা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়। ১৮১৭ ও ১৮১৮ সনে যথাক্রমে স্কুলবুক সোসাইটি ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় সে কথা পূর্বেই বলেছি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত ও মুনশী হিসাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়। কোনও সাহিত্য সাধনার নিদর্শন ইঁহারা রাখিয়া যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইঁহাদের কীর্তির উল্লেখ নাই। দুই-একজনের কীর্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু কীর্তি বাঁচিয়া নাই। কীর্তির সহিত যাঁহাদের নাম বাঁচিয়া আছে, আমাদের ইতিহাসে তাঁহারাই স্মরণীয়"।[২] এই স্মরণীয় ব্যক্তিদের একজন জেমস লঙ—আমাদের আলোচ্য চরিত্র। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোন যোগ হয়ত ছিল না কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিত ও মুনশীদের সঙ্গে লঙের ঘনিষ্ঠতা ছিল। লঙের কর্মময় দীর্ঘজীবনের কাহিনী, তাঁর আগমনের সময় বাঙলা সাহিত্যের অবস্থা ইত্যাদি পরিস্কার না করে বাঙালী জীবন ও বাঙলাসাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। তাই তৎকালীন সমাজ ও বাঙালী জীবনের কথা নানাভাবে বলে নিতে হবে। অন্যথায় তাঁর কীর্তি কথা মাত্র প্রচার করলে সম্পূর্ণরূপে লঙকে জানা যাবে না। কোন মানুষকে এভাবে দেখলে কোন খণ্ড বিষয় নিয়েও তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ সহজ হয়। লঙের জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সঙ্গে অনুধাবন করবেন তিনি বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন থেকে লঙকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। লঙের ন্যায় বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যসেবকদের কীর্তি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবনের দ্বারাই বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নজরুল তথা আধুনিক সাহিত্যিকদের কীর্তির সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব।

১। David Kopf. op. cit. ২। সজনীকান্ত দাস—পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ।

১০

লঙের সঙ্গে বাঙলাসাহিত্য ও বাঙালীর সমাজজীবনের যে ক্রমবিকাশ তা কাকতালীয় ঘটনা নয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে পাদরী সাহেবেরা বাঙলা ভাষার ও বাঙালীর জীবনের যে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তার জন্য সত্যসন্ধানী প্রত্যেকটি বাঙালী তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। উইলিয়ম কেরীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এদেশ থেকে তাঁর অপর সকল কীর্তি যদি কোনদিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় তবু "বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম প্রভূত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিতজনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।"[১] এবং জেমস লঙকে উৎসাহদাতা, সংকলক, অনুবাদক, শিক্ষক, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক হিসাবে যাঁরা ষোলআনা স্বীকৃতি দিতে নারাজ, তাঁরা যদি তাঁর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাসমূহ পাঠ করে দেখেন, ক্যাটালগ, প্রবাদ, সংবাদসার, সিকেলশন্স্, অনুবাদ, ও সংগঠনাদি ইত্যাদি সব নিয়ে পর্যালোচনা করেন তবে তাঁরাও কথা বা জেমস লঙের, ধর্মপ্রচারকের সঙ্কীর্ণতার কথা তুলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারবেন না।

বিদেশী হয়েও লঙ অনুভব করেছিলেন মাতৃভাষার উন্নতি না হলে শিক্ষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি হবে না। কেরী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যা বুঝেছিলেন—"একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক, ব্যবহারিক, দৈনন্দিন সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষাই যথেষ্ট, মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে।"[২] উনিশ শতকের মধ্যভাগে লঙ কেরীর এই অনুভবকেই বিস্তৃত করেন। এবং কেরী, লঙ, প্রভৃতির চেষ্টায় বাঙলা সাহিত্য ও ভাষা যে গতি পায়—"বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল লাগিয়াছিল।"[৩] অসাধারণ সংগঠক এবং অক্লান্তকর্মী জেমস লঙ ভারতবর্ষে ছিলেন ১৮৪০ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত। তারমধ্যে কয়েকবার স্বদেশ গেছেন, স্বদেশ অবস্থান দীর্ঘ হয় ১৮৬২ সনের যাত্রায়। প্রায় তিন বছর ছিলেন। ১৮৭২ সনে স্বাস্থ্যের কারণে রুগ্ন লঙ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে যান লণ্ডন। ১৮৮৭ সনে লণ্ডনের "অ্যাডলফী", ৩নং অ্যাডম স্ট্রীটের নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। দিনটি ছিল ২৩শে মার্চ।

২৩শে মার্চ স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকে মানুষের স্মরণীয়। এই দিনে লঙের মৃত্যুর একশ বারো বছর আগে প্যাট্রিক হেনরীর যে বিখ্যাত বক্তৃতা প্রবাদে

১। সজনীকান্ত দাস—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ ২। ঐ ৩। ঐ

পরিণত হয়ে আছে তা : হচ্ছে—"Give me liberty or Give me death"১ জেমস লঙও জনগণের লিবার্টি বা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে-করতে পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর দুটি বিবাহ। দুটি পত্নীরই মৃত্যু ঘটে জাহাজে বিলাত থেকে আসা-যাওয়ার পথে। তাঁর কোন সন্তান ছিল না বলেই শুনেছি।

যে ৭৩ বছর বেঁচেছিলেন অঙ্কের হিসাবে তার ৩২ বছর কেটেছে ভারতবর্ষে, কিন্তু বাস্তবে এই ৩২ বছরের ৫/৬ বছর স্বদেশে ছিলেন। গিয়েছেন, এসেছেন আবার গিয়েছেন, এভাবে ৫/৬ বছর স্বদেশে থেকেছেন। যৌবনের পূর্ণ উদ্যম এবং প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে এদেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। বয়সের হিসাবে ২৬ থেকে ৫৮ বছর পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসী। বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থা বাদ দিলে যতদিন মানুষ পূর্ণ কর্মক্ষম তার প্রায় সব সময়ই তিনি ব্যয় করেছেন ভারতবর্ষে। তাঁর কাজের দ্বারা তিনি সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর নিকট থেকেই আন্তরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। বিধর্মী পাদরীরা হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, শিক্ষা ও দীক্ষা প্রভৃতি নিয়ে যখন সমালোচিত এবং নিন্দিত, তখন কিভাবে তিনি ও তাঁর মত ভারতবন্ধুরা ভূমিসন্তানদের নিকট থেকে এত সম্মান এত ভালবাসা পেতে পারেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন হঠাৎ। তবু স্থানে-স্থানে বীরের ন্যায় বিদায় সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন, আরো অনেকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দিতে ইচ্ছা করেছিলেন, পারেন নি। জেল থেকে মুক্ত করার জন্য ত্রিশ হাজার লোকের সই সম্বলিত দাবী সনদ তৈরী হয়েছিল, লঙের ইচ্ছানুসারে তা সরকারের কাছে প্রেরিত হয় না। তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন প্রতিদিন জেলে যত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে তত লোক গর্ভনর জেনারেলের সঙ্গেও কোনদিন দেখা করে নি বলে তৎকালের সংবাদপত্র উল্লেখ করেছে। দর্শকদের মধ্যে দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং পাদরীদেরও দেখা যেত।

জেমস লঙের জীবনে যে অন্বেষণবৃত্তি দেখতে পাই তার মূলে যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার, কারিগরি বিজ্ঞানের প্রসার এবং ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই অন্বেষণেরই বিকাশ দেখি লঙের যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনার মধ্যে। তিনি তাঁর কালের বাঙালীর মননশীলতাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন। কারণ, সে চিন্তাধারার মূল কথা ছিল জ্ঞানের আলো জ্বালানো মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা। নতুন আবিষ্কার ও চিন্তাকে

১। Young Students Encyclopedia, Funk & Wagnalls, New York.

কালের পরিবর্তনকে, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের জ্ঞানকে দেশীয় সাধারণের মধ্যে সমন্বিত করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল।

১১

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও নবযুগের বিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে যে মননভূমি গড়ে উঠল তার সঙ্গে জেমস লঙের যে আত্মীয়তা ছিল তা সকলেরই জানা। তাঁর সত্যানুসন্ধানের আদর্শ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে বাঙালীর মনোজগতে নতুন চেতনা আনে। তিনি বাঙালীকে যুক্তিবাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে, সত্য ও সততার প্রতি অনুরক্ত হতে, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সাহসী হতে এবং সমাজ জীবনের সঠিক তথ্যাদি আহরণের জন্য বল জুগিয়েছেন। ন্যায় ও নীতির প্রতি অবিচলিত থাকার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি ঝিমিয়ে থাকা ও স্বার্থপর বাঙালীদের কঠোর পরিশ্রমী ও সেবাব্রতী হতে বলেছেন। সমালোচনা করেছেন শহরের আত্মসর্বস্ব বুদ্ধিজীবী তথা বাবুদের। তাঁর দৃষ্টিতে তাঁরা স্বার্থবাদী, গ্রামীণ মানুষদের প্রতি আন্তরিকতাহীন, সুতরাং; "At every opportunity Long warned the Calcutta intellegentsia on their social responsibilities and criticised their being callous for the cause of humanity. They were, according to him, 'intensely selfish' and 'indifferent it not hostile to the welfare of the common people"[১] কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা লঙের এই সমালোচনাকে আত্মসমালোচনা হিসাবে গ্রহণ করে লজ্জিত হয়েছেন।

লঙের প্রতিভা বহুমুখী হলেও তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেশীয় খ্রীষ্টানদের শিক্ষিত করা, দেশীয় জনগণের সমুন্নতির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া, এবং দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলা। এ কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে গিয়েই তিনি দেশীয় ভাষা শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও দেশীয় পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অপ্রধান কাজ দেশীয় মানুষদের চিন্তা-চেতনা ও ভাব-ভাবনা যা, সাহিত্য ও গ্রন্থাদিতে প্রতিফলিত, তা স্বদেশী সরকার ও পাদরী সাহেবদের গোচরে আনা। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল, দেশীয় সমাজের প্রোগ্রেম্‌স্‌ কর্তাদের সম্মুখে তুলে ধরা গেলে তার সুরাহার চেষ্টা ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু কর্তারা লঙের কাজকে

১। B.B. Kling. "The Blue Mutiny", Illinois (USA) 1964. also by KLM, Cal.

অন্যভাবে নিয়েছে। তারা দেশীয় সাধারণকে সংযত করতে লঙের এ কাজে উৎসাহ দেখিয়েছে, তাতে লঙের দুর্নাম রটেছে বেসরকারী ইন্টেলীজেন্স বিভাগের কর্মী হিসাবে।[১] লঙের যে-সব কাজের দ্বারা সরকার উপকৃত হয়েছে লঙ সরকারের সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বোধহয় সে-সব কাজ করেন নি।

জেমস লঙ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তাঁর শিক্ষক জীবনকে বুঝতে হলে তাঁর সময়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্ম-ব্যবস্থার ওপরও এক লহমা চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। কারণ, পূর্বেই বলেছি, কোম্পানীর সরকার প্রথমে এদেশের শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায় না। তাদের উৎসাহ থাকে বাণিজ্য প্রসারের দিকে। যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারে যে, স্থানীয় জনগণের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, হাবভাব, চালচলন প্রভৃতি সম্বন্ধে অপরিচিত থেকে দেশ শাসনে অসুবিধা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে বাণিজ্য প্রসারেও, তখনই শিক্ষা সংস্কারে সরকার মনোযোগী হয়। প্রথম দিকে ফারসী ভাষায় কাজ চলত, কিন্তু ফারসীও দেশীয় ভাষা নয়। স্থানীয় জনগণ এ ভাষায় কথা বলে না। শিক্ষিত লোকেরা এ ভাষা শিখে নিতেন। কেননা, তা না শিখলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যেত না।

তখন ভারতের শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী। এই ভাষার সাহায্যে ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, শাসনরীতি প্রভৃতি পড়ানো হত। বিজ্ঞান অধ্যয়নের দিকে কোন ঝোঁক ছিল না। শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরা টোল, পাঠশালা প্রভৃতি মারফৎ শিক্ষা দিতেন।[২] মোল্লা, মৌলভীরা শিক্ষা দিতেন মক্তব, মাদ্রাসা মারফৎ। শিক্ষকেরা বেতন নিতেন না। অনেকস্থানে ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করা হত। ছাত্রজীবন চলত পনের থেকে বিশ বছর। নদীয়া, কাশী প্রভৃতি স্থানে জমিদার ও শাসকদের সহায়তায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভাল ভাল ছাত্রদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রদান করতেন।

কোম্পানীর আমলে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চরম আর্থিক সঙ্কট দেখা

দেয়। অবস্থাবান লোকেরা এইসব বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠাতেন না। তাঁরা গৃহশিক্ষকদের দিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। মেয়েদের জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। দরিদ্রশ্রেণী আর্থিক দুর্দশার কারণে ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাত না। পাদরীরা এসে গেলে তাঁরা ধীরে-ধীরে স্থানীয় লোকদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। ছোট ছোট ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী শিক্ষা দিতে থাকেন, তখন পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা গভীর ছিল না।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই অবস্থার পরিবর্তনে চেষ্টিত হলেন। ডেভিড হেয়ার, রামমোহন প্রভৃতিও এগিয়ে এলেন। তাঁদের ও দেশীয় প্রধান এবং বিদেশী বিদ্যোৎসাহীদের চেষ্টায় একের পর এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮১৭ সনে ২০-জন ছাত্র নিয়ে যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সে কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ডেভিড হেয়ারের। যাঁদের চেষ্টায় ও যত্নে এ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় তাঁদের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা গোপীমোহন দেব ও তাঁর ছেলে রাধাকান্ত দেব ছিলেন অন্যতম। সূচনা থেকে এ কলেজের ডিরেক্টর গোপীমোহন দেব। ১৮১৮ সনে রাধাকান্ত ডিরেক্টর হন। ১৮১৯ থেকে কিছুকাল ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন নেয়া হত না। প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্দ্র ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮২৩ সনে সরকারী অর্থসাহায্য আসে এবং কলেজ পরিচালনায় কতকটা নতুনত্ব ঘটে। ডেভিড হেয়ার ১৮১৯ সন থেকে এই কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক, ১৯২৫ সন থেকে ডিরেক্টর। সরকারের প্রতিনিধি হয়ে আসেন উইলসন ১৮২৫ সনে। তিনি হলেন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। এই কলেজে ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এখানের শিক্ষায় একদিকে যেমন সুফল ফলতে থাকে তেমনি অন্যদিকে নব্যশিক্ষার প্রথম আভায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারে বীতরাগ হয়ে একদল যুবক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এজন্য কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিওকে দায়ী করা হয়। শেষঅবধি ডিরোজিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সঙ্গে-সঙ্গে পদত্যাগ করেন প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেলম। ডিরোজিওর পদত্যাগের পর আলেজাণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে নব্য-শিক্ষিত ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

১২

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বৎসরই রামমোহন উইলিয়ম কেরীকে শ্রীরামপুরের জমি দান করেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। কেরীর স্কুলে প্রায় ২০০ ছাত্র ভর্তি হয়। পড়াশুনার সব ব্যয় বহন করেন স্বয়ং রামমোহন। ১৮২২ সনে রামমোহন নিজের

বিদ্যালয় স্থাপন করেন [১]। ১৮২৩ সনেই এ বিদ্যালয় আর্থিক সঙ্কটে পড়ে। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডম স্মিথ এই বিদ্যালয়কে সরকারী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে পরামর্শ দেন। রামমোহন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৩০ সনে লণ্ডন যাবার সময় এই স্কুলের ভার দেন পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপর। চার বৎসর পর ১৮৩৪ সনে বিদ্যালয়ের নাম বদল করা হয়। নতুন নাম—"ইণ্ডিয়ান আকাডেমী"। ইণ্ডিয়ান আকাডেমীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাধাপ্রসাদ রায়। [২] তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৫ শকের ১৪ই বৈশাখ। এই পাঠশালায় পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, অঙ্ক, ইংরেজী বাঙলা, ব্যাকরণ, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হতে থাকে। শীলবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ শকের ১লা আষাঢ়। এখানেও নব্য শিক্ষা দেয়া হতে থাকে। বাঙলা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। পূর্বে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার, ইংরেজদের মত চালচলনের ও পোষাক-পরিচ্ছদ আহার-পানীয়াদির অনুকরণ করার প্রতি যে ঝোঁক এসেছিল এই সময় থেকে সে উগ্রতা কিছুটা কমতে আরম্ভ করে।

হিন্দু কলেজের সূত্রপাত থেকে বাঙালী জীবনে যে ইংরেজী হাওয়া বইতে থাকে দেশীয় পাঠশালাদির স্থাপনে তা কিছুটা হ্রাস পায়। ক্রমে বাঙলা শিক্ষার দিকে ঝোঁক আসে। ১৮৫৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী সংবাদ ভাস্কর একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন—"হিন্দু কলেজের প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুকাল মদ্য, মাংস ধ্বংস করিয়া তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন, এক্ষণে জু জু হইয়া বসিয়াছেন। আর তাঁহারদিগের সে প্রতিভা দেখিতে পাই না... ...দশটা বাঙ্গালা কহিতে হইলে তাহার মধ্যে আটটা ইংরাজী শব্দ না দিয়া কথা কহিতে পারেন না। কি দুঃখের কথা, যে-স্থলে পিতা মাতা বলিতে হইবেক সে-স্থলেও "ফাদর", "মাদর" বলিয়া বক্তব্য সমাধা করেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন কিছু লিখিয়া সমাচারপত্রে প্রেরণ করিবেন কিন্তু লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাটপানে উঠিয়া যায়, অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোঘর্ম পাদস্পর্শ করে।"[৩]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু পূর্বে ঠিক হয় কোন বিদ্যালয়েই ধর্ম শিক্ষা দেয়া হবে না। তা নিয়ে আন্দোলন হয়। নীতিশিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে মিশনারী পাদরী ও ব্রাহ্ম প্রধানদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। পাঠ্য-

১। D. P. Sinha op. cit ২। ঐ

৩। বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রাগুক্ত

সূচীতে বাইবেল অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপার নিয়েও আন্দোলন চলে। পাদরীরা বাইবেলের পরিবর্তে অন্যভাবে নীতিশিক্ষা দেবার কথা বললেন। ঠিক হয় সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে পাদরী নিযুক্ত করা হবে না। তাতেও পাদরী সাহেবদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা ইংরেজী ও মাতৃভাষা উভয় ভাষায় শিক্ষা দেবার নীতি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।[১] সরকার যখন মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তখনও সেভাবে শিক্ষা নীতি নির্দিষ্ট করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বছর বাদে একটি সম্পাদকীয়তে 'সম্বাদ প্রভাকর' লিখলেন—"বঙ্গভাষা এখনও দেশের প্রচলিত ভাষা এবং গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ অনাদর সত্ত্বেও যখন কেবল দেশীয় ব্যক্তিদের অনুরাগ, প্রযত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে তাহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া আসিতেছে তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার সম্পূর্ণ আদর করাই উচিত হইয়াছে, সিণ্ডিকেট মহাশয়েরা এদেশেই ইংরাজী ভাষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য অধিক অনুরাগ ও অধিক মনযোগ করিতেছেন, করুন, আমরা তাহার বিরোধী নহি। ইংরাজী এদেশের রাজভাষা এবং তাহাতে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি হওয়াতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ ক্রমে সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতেছেন। সত্য তাই, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী ভাষার আদর করিয়া প্রজাদিগের জাতীয় ভাষার অনাদর কদাচ উচিত হয় না। বিশেষতঃ জাতীয় ভাষার উন্নতি হইলে এদেশের চির উপকার হইতে পারে এবং তাহাদের অনুশীলনের দ্বারা দেশমধ্যে বিদ্যাজ্যোতির যেরূপ সহজে ও শীঘ্র সর্বত্র বিকীর্ণ হইতে পারে। আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি ইংরাজী ভাষার দ্বারা সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"[২] এইভাবে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশীয় লোকজন যেরূপ চীৎকার আরম্ভ করে প্রায় তদ্রূপই চীৎকার আরম্ভ করেন পাদরী ও অন্যান্য ভারতপথিকের দল। ভারতীয় ভাষার বিস্তার, প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজদের যে মসী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ভারতবাসী উপকৃত হয়েছে।

শ্রীরামপুর মিশনারীরা যে শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সব স্থানে বাঙলাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। ১৮২২ সনে ক্রীশ্চান নলেজ সোসাইটি মিশনারী বিদ্যালয়গুলোকে টালিগঞ্জ, কাশীপুর ও হাওড়া এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন।[৩] ১৮৩৬ সনে স্থাপিত হয় মেডিকেল কলেজ। একই

সময় আরম্ভ হয়ে যায় ইনজিনিয়ারীং শিক্ষা। প্রতিষ্ঠিত হয় শিবপুরে ইনজিনিয়ারীং কলেজ। স্কুল ও কলেজের ভাল ভাল ছাত্রদের জন্য যে সব বৃত্তিদান প্রথা প্রচলিত ছিল তা আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা হয়। বৃত্তির মূল্যও বাড়ানো হয়।

নতুন শিক্ষানীতিতে মিশনারী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য নতুন বিভাগ গঠিত হয়। তাঁরা নিজেরা তাঁদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও গ্রন্থাদি নির্দিষ্ট করতে থাকেন। অবশ্য তাঁদের দেয়া ডিগ্রীর মূল্যমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া ডিগ্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ঠিক হয়। ডিগ্রী সমূহের নাম বিভিন্ন হলেও ষ্ট্যান্ডার্ড একই। সারা ভারতবর্ষে একই মানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হয়।

লক্ষ্য করেছি যে, আধুনিক শিক্ষানীতি গৃহীত হয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৫৭ সনে একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৮ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কুড়িটি। ১৯৭৩ সনে এদের সংখ্যা একশ একটি। তবু এদেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১৯৭১ লোক গণনা অনুসারে ৩৮৬ মিলিয়ন। শিক্ষার প্রসার হয়ে চলেছে, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেছে নিরক্ষরদের সংখ্যা। সরকারী হিসাবে দেখি ১৯৪১ সনে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২৭০ মিলিয়ন, ১৯৫১ সনে তাদের সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন, ১৯৬১ সনে ৩৬৪ মিলিয়ন এবং ১৯৭৩ সনে ৩৮৬ মিলিয়ন। ১৯৮১ সনের আদমসুমারীতে নিরক্ষরের সংখ্যা ৪০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বিদ্যালয়ের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলেছে, ১৯৭০-৭১ সনে ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০৪, ৪১১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮৮,৫৮৭টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ৩৫,৭৭৩টি। কলেজের সংখ্যা ১৯৭২-৭৩ সন অবধি ৪,১৫৮টি। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, তবু নিরক্ষরদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, এটাই আশ্চর্য!

১৩

জেমস লঙের আসার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় ডিরোজিও যুগের "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র মত হিন্দু কলেজের ছাত্র ও যুবকেরা গঠন করেন "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি"। এখানে ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তৃতা করতেন। এই সোসাইটিতে পাদরী লঙ ও পাদরী ডালের বক্তৃতায় যে বাদবিতন্ডা হত তা যেমন উপভোগ্য হত তেমন তার মধ্যে

বহু জানবার বিষয় থাকত বলে জানিয়েছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। এ ধরণের সংগঠনে পাদরীদের অনুপ্রবেশের মারফৎ বুঝতে পারি দেশীয় প্রধান ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাদরী সাহেবদের আকর্ষণ তখনই এসে গেছে। ধর্ম দীক্ষার পুরাতন তিক্ততা অনেকটা কমে গেছে। মূলতঃ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত পাদরী ও সিভিলিয়ানরাই এ ধরণের দেশীয় সংগঠনে যোগদান করতেন। তাঁরাই দেশীয়দের কথা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন।

১৮৫৫ সনে গঠিত হয় শিক্ষা অধিকার।[১] প্রথম শিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হন—গরডন ইয়ং। তিনি প্রেসিডেন্সি সমূহে নতুন বিদ্যালয় গঠন, নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, প্রচলিত বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান ও সংরক্ষণ এবং আরও সরকারী বিদ্যালয়ের প্রসার, বিদ্যালয়ে অনুদানের ব্যবস্থা, নিয়মকানুন গঠন, টোল, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা প্রভৃতির জন্য অনুদানাদির ব্যবস্থার দায়িত্ব পান। এই সময় থেকেই "The attention of the Government is especially directed to the importance of placing the means of acquiring useful and practical knowledge within the reach of great mass of people."[২] এই বৎসর বাঙলার ছোটলাটের পদটি সৃষ্টি হয়। স্যার এফ. জে. হ্যালহেড প্রথম ছোটলাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। হ্যালহেড ছোটলাট হবার তিন বৎসরের মধ্যে আরম্ভ হয় সিপাহী বিদ্রোহ। একদল দায়িত্বশীল ইউরোপীয় তখন মনে করতে থাকেন বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার। তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করার জন্য ফন্দিফিকির আঁটতে থাকেন। এ নিয়ে সারা দেশে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ছোটলাট সাহেব স্পষ্ট মত দিলেন: "The mutiny had many causes of which schools were most trifling and inconsiderable; and it would have taken place sooner or later, though there had never been a child taught to cypher from one end of India to the other."[৩] শিক্ষার প্রসার বন্ধ করা যায় না, কিন্তু অন্যভাবে শিক্ষা সংকোচনের কাজ চলতে থাকে।[৪]

স্মরণে আছে ১৮১৬ পর্যন্ত এদেশীয়রা ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে গরজী ছিল না। হিন্দু কলেজ তাঁদের ইংরেজী শিখতে উৎসাহী করে। এবং ১৮৩৫ সনের মধ্যেই একদল তরুণ ইংরেজীকে মাতৃভাষার মত রপ্ত করে ফেলেন। ১৮৫৫ সনের শিক্ষা-অধিকার এবং ১৮৫৭ সনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হিসাবে সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়। ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদয় হলে সরকার উচ্চশিক্ষা দমন করার কাজে উৎসাহিত হয়। উচ্চশিক্ষা থেকে ইংরেজীকে বাদ দেবার পরিকল্পনা চলে। সরকার উচ্চশিক্ষাকে কমিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা ভাবতে থাকেন। মিশনারী পাদরীরাও এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাঁরা দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রসারের আন্দোলনে যোগ দেন। আলেকজাণ্ডার ডাফের মত স্কটিশ পাদরী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন।

জেমস লঙ প্রথম দিকে ইংরেজীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনিও দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যাপারে সরব হন। এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ দেখতে পাই ১৮৫০ সন থেকে।

১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সনের মধ্যে লঙ কয়েকবার বিলাত যান। ১৮৪৭ সনে যখন বিলাত যান তখন রাজনৈতিক কারণে দেশীয় শিক্ষাপ্রসারের যে অলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা জেনে আসেন। ১৮৪৮ সনে বিপত্নীক লঙ যখন এদেশে ফিরে আসেন তখন থেকেই দেশীয় শিক্ষা, দেশীয় খ্রীষ্টান, দেশীয় সাহিত্যাদি ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত হন। দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রসমূহ হঠাৎ সরকারের দেশীয় ভাষা প্রীতির ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেন না। সরকারের হঠাৎ দেশীয় ভাষা প্রীতিতে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। ১২৭৭ সনের ২৮শে আষাঢ় টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাবু রামানাথ ঠাকুর। বক্তা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীমোহন দাস, কিশোরীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি। সকলেই উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বহু পাদরী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউই মুখ খোলেন না। উচ্চশিক্ষাকে অবহেলা করে গণশিক্ষা প্রবর্তন করবার ইচ্ছায় এবং ইংরেজীর বদলে বাঙলাকে উচ্চস্থান দেবার চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার চেয়ে কপটতা দেখতে পান। সোমপ্রকাশ ১০ই জ্যৈষ্ঠ লিখলেন—যে ইংরেজী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলন করার জন্য সরকারকে "নানাপ্রকার কৌশল ও প্রলোভন দিয়া লোককে

শিক্ষা দিতে হইয়াছিল...এত করিয়াও রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছেন...এখন আর রাজপুরুষগণকে যত্ন করিয়া ইংরেজী শিক্ষা দিতে হয় না। ইহারা নিজেরাই আগ্রহ সহকারে উহা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ...ভারতবর্ষীয়গণের উন্নতি এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে...উচ্চতর শিক্ষা যাহাতে বন্ধ হয় তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন..." [১] দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে ঐ পত্রিকা ১৭ই জৈষ্ঠ লিখলেন: দেশীয় ভাষা রাজভাষা নহে। দেশীয় ভাষায় কাজকর্ম নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং ইহাতে অর্থাগমের সম্ভবনা অল্প। যাহাতে অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকে লোকে কি সেইদিকেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হয় না?... দেশীয় ভাষায় দেশীয়দিগকে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার মত আর মূর্খ অথবা কিঞ্চিদজ্ঞ করিয়া রাখিবার মত উভয়ই তুল্য। কিঞ্চিদজ্ঞতা অপেক্ষা মূর্খতা বরং ভাল"।[২] জেমস লঙ সোমপ্রকাশের এই অভিমতকে সমর্থণ করতে পারেন নি। তিনি এই অভিমতের জন্য শহরের বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থপর বলে ভৎর্সনা করেছেন। জেমস লঙ-আদি পাদরীরা নানাধরণের যুক্তি খাড়া করিয়ে দেখাতে থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হলে দেশের মঙ্গল সূচিত হবে না। লঙ বললেন, গ্রামের সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ রেখে কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা ওদের ওপর প্রাধান্য খাটাবার ইচ্ছায় দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। মিশনারী পাদরীরা লর্ড অর্গাইলকে পত্র দিয়ে বললেন—"মধ্যশ্রেণীর লোকেদের সন্তানদের অপেক্ষা নিম্ন বা ইতরশ্রেণীর লোকেদের সন্তানদের শেখানো আবশ্যক।" ২৮শে আষাঢ় টাউন হলের সভার বিরুদ্ধে মিশনারীরা স্মারকলিপি মারফৎ একথা সরকারকে জানালেন। মিশনারীদের এ কাজের প্রতিবাদ করে "সোমপ্রকাশ" ৩রা শ্রাবণ লিখলেন—"লঙ সাহেবকে যদি সাক্ষী মানা হয় তিনি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় বলিতে পারিবেন ২রা জুলাই-এর সভায় (মিশনারীদের সভা) এদেশের সাধারণ মত প্রকাশ করে নাই। তিনি তো দেশের আচার দেশের ব্যবহার ও দেশের মনোগত অভিপ্রায় অবগত আছেন। তিনি কি বলিতে পারিবেন ইংরাজী শিক্ষা এখন স্বাধীনভাবে চলিতেছে? ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের আত্মার শুদ্ধির নিমিত্ত বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা খ্রীষ্টিয় গীর্জাগুলিতে ব্যয় করা হয়...বঙ্গদেশের শিক্ষার নিমিত্ত ৭ লক্ষ টাকা কি অনাবশ্যক ব্যয়?"[২] মিশনারীদের প্রস্তাব ছিল

১। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২। ঐ

"উচ্চতর শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া দেশীয় নিম্নশ্রেণীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত। এই শ্রেণীর শিক্ষা বহুল প্রচার করা উচিত।" দেশীয় প্রধানেরা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শিক্ষার ব্যাপারে মোটেই অনাগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল—উচ্চশিক্ষা খাতে টাকা কমিয়ে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উচ্চশিক্ষা যেমন ছিল তেমনই চলুক, বাড়তি টাকার ব্যবস্থা করে নিম্নশ্রেণীদের জন্য শিক্ষা বাড়ানো হোক। কিন্তু সরকার বাড়তি টাকা বরাদ্দ করতে তো রাজী হলেনই না, পরন্তু উচ্চশিক্ষা খাতেও টাকা কমাবার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নিতে থাকেন।

উচ্চশিক্ষা উপেক্ষা করে দেশীয়দের শিক্ষাদানের ব্যাপারে মিশনারীদের প্রস্তাব সম্পর্কে সোমপ্রকাশ লিখলেন—"প্রতিবাদীগণের মধ্যে অনেকেই কলেজের অধ্যাপক। দুইজন বাঙালী খ্রীষ্টান,...আমরা জেমস লঙের নাম প্রতিবাদীগণের মধ্যে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যিনি বাঙ্গালীগণের পরমসুহৃদ, যিনি ইহাদিগের নিমিত্ত কারাগার ক্লেশ ভোগ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, তাঁহার এইরূপ বিগর্হিত ব্যাপারে প্রস্তাব অবলম্বন কি উচিত হইয়াছে, এতদ্বারা তাঁহার নামে কি কালিমা পড়িবে না? এতদ্বারা কি তাঁহার উপর বাঙ্গালীগণের মন উষ্ণ হইবে না?...লঙ সাহেব কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত এরূপ কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষা নিবন্ধন বিজ্ঞানের সমধিক চর্চা হওয়াতেই অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন"।[১]

১৪

কেন দেশীয় শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে সরকার উঠে পড়ে লাগলেন, কেন শিক্ষার সংস্কার, ধর্মীয় আচার-আচরণ, জাতপাত, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য, স্ত্রীশিক্ষা, চড়কাদি ব্যাপার নিয়ে সরকার উৎসাহ দেখাতে থাকেন, কেন প্রশাসন সংস্কার, পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার, বিচার-বিভাগের সংস্কার, কলকাতার-সংস্কার প্রভৃতি কাজে হাত দেন—এই মুহূর্তে তা আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে জেমস লঙ কেন প্রতিবাদকারীদের মধ্যে একজন, একজন কেন অন্যতম নেতৃস্থানীয় একজন হিসাবে দেখা দিলেন, তা লক্ষ্য করতেই হয়।

মনে রাখতে হবে নবজাগরণের ঊষাপর্বে জেমস লঙ এদেশে আসেন। তাঁর আগমনের কিছু পূর্বের ও পরের সমাজ ও দেশ কি ভাবে এগিয়ে গেছে আশা করি উপরের আলোচনা থেকে তা আন্দাজ করা সম্ভব। যখন লঙ এদেশে

১। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রাগুক্ত।

এলেন তখন পাদরী ও অন্যান্য দায়িত্বশীল কাজের জন্য লণ্ডন থেকে বেছে বেছে এমন সব কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের এদেশে পাঠানো হত যাঁরা তদীয় কাজ-কর্মের দ্বারা ইংরেজ শাসনকে দীর্ঘায়ু করতে পারেন। জেমস লঙ এদেশে আসার আগে তিনি এ ধরণের কাজে সম্পূর্ণ সক্ষম একথা বুঝতে পেরেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাজের সঙ্গে তৎকালীন শাসকদের কাজের ও চিন্তাভাবনার মিল থাকবে তা অনুমান করতে অসুবিধা নেই। তবু কাজ করতে যখন মাঠে নেমে পড়লেন তখন দেখলেন যে-উদ্দেশ্য সাধন করতে তিনি এদেশে এসেছেন তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে গেলে অত্যাচারী শাসক ও বণিকদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়, যে-মানবতার সেবা করার জন্য তিনি যাজকের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সে-মানবতার সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়। কিন্তু অত্যাচারী, উৎপীড়কের সঙ্গে এক পায়ে পা ফেলে চললে দেশীয় সাধারণের মধ্যে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। তাই তিনি দেশীয় সাধারণ ও তাদের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে দীর্ঘজীবনের সাধনার দ্বারা দেখিয়েছেন—তিনি ছিলেন কথায় ও কাজে এক। লঙ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সংগ্রামে তিনি সর্বদা জয়ী হয়েছেন এমন নয় —তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর জয়ের বার্তা সূচিত হয়েছে, এজন্যই ছোটখাট ত্রুটী, ছোটখাট পরাজয়ের কথা তুলে তাঁর কৃতিত্ব লাঘব করা উচিত নয়। মানবতাবাদী ও লিবারেল চিন্তা জেমস লঙকে এমন সব কাজ করতে উদ্দীপিত করেছিল যার ফলে এতদ্দেশীয়রা লাভবান হয়েছিল, আর ক্ষতিগ্রস্থ বা আতঙ্কিত হয়েছিল তাঁর স্বদেশীয়রা। খ্রীষ্টিয় মানবতাবোধ থেকে অত্যাচারকে ঘৃণা করার যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন সে-শিক্ষা তাঁকে শোষিতদের দলে থাকতে অন্তর থেকে প্রেরণা জুগিয়েছে [১] আর সেজন্যই তিনি ভারতবন্ধু হিসাবে মর্যাদা পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা দিয়েছে স্বদেশীয় জাতীয়তাবোধ। স্বদেশীয় শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। তার ফলে ডাবল ষ্টাণ্ডার্ডের মধ্যে তাঁকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে—না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে কষ্ট পেতে হয়েছে।

১। "Every student of history must know, or at least is supposed to know, how that sincere friend of Bengal Peasants we mean the late Rev. James Long, was incarcerated in the Presidency Jail of Calcutta for no other fault than that, he, as a follower of Jessus of Nazareth, thought it to be his primary duty to translate into English, the great Bengali drama entitled the *Neel Durpana* or the "Mirror of Indigo Scandals". Ram Gopal Sanyal in "A General Biography of Bengal Celebrities" ed. S. Majumdar. Rddhi, Calcutta 1976.

১৫

লঙ স্বদেশীয়দের বিরোধী ছিলেন না, ছিলেন ইংরেজশাসনের পূর্ণ সমর্থক। বিরোধী ছিলেন লুঠেরাদের। তারা ছিল বলশালী। শোষিতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি নাকানিচুবানি খেয়েছেন, তবু আদর্শচ্যুত হন নি।

"ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেণ হেষ্টিংসের... রাষ্ট্রজীবন যাহাই হউক, এদেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব! তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পন্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভান্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন.. জয় গর্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন"।[১] জেমস লঙও হেষ্টিংসের এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন—"আমি বিশ্বাস করি ভারতীয়দের মঙ্গলের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসনের সার্থকতা নিহিত আছে। গ্রেটব্রিটেন ও ভারতের বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় আমার এই বিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ একমত।"[২]

লঙ ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে দেশীয়দের দ্বারা এ দেশ শাসনে উৎসাহ দেখিয়েছেন। তার জন্য তাঁকে শোষিতদের কথা বলতে হয়েছে, উৎপীড়কদের নিন্দা করতে হয়েছে, শোষিতদের হয়ে লড়তে হয়েছে। কেন ও কি ভাবে তিনি এ সব কাজ করেছেন, তার বিভিন্ন উদ্যোগের দ্বারা ভারতবাসী তথা বাঙালী কতটা উপকৃত হয়েছে, পরবর্তী আলোচনায় তা পরিস্কার করা যাবে।

২ | জীবন-যুদ্ধে কর্মবীর

প্রকৃতই জেমস লঙ কর্মবীর, নানাদিকে তাঁর বিস্তৃতি, খ্যাতি বা অখ্যাতি।

জেমস লঙ ভারতবর্ষে আসার কয়েকমাস আগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বিধান দেন—সরকার পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে, ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সরকারের চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ইত্যাদি। ফলে ইংরেজী শিক্ষার দিকে সাধারণ মানুষের ঝোঁক বেড়ে যায়। এই বিধানের সুযোগ নিয়ে পাদরী সাহেবেরা নানাস্থানে অবৈতনিক, কোন-কোন স্থানে অল্প বেতনের ইংরেজী পাঠশালা খুলে চললেন। তাঁদের উত্তর দেন দেশীয় প্রধানেরা। তাঁরাও নানাস্থানে দেশীয় পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন।

১৮৪২ সনে সরকার নিজের হস্তে পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার গ্রহণ করেন। ঠিক হয়—পাঠ্যপুস্তক ইংরেজীতে লিখতে হবে, সে পুস্তক অনুমোদিত হলে যোগ্য অনুবাদকদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে ব্যবহার করতে হবে। সহজে এ কাজ করা যায় না। এই সিদ্ধান্তের আগে, ১৮৪০-৪১ সনে, হিন্দু কলেজ এবং শিক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কমিটির ব্যাপারেও সরকার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৪৮ সনে হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসুর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা, ১৮৪৯ সনে গুরুচরণ সিংহের দীক্ষা এবং ১৮৫৩ সনে জনৈকা নর্তকী-পুত্রের ভর্তির ব্যাপার নিয়ে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা সরকারের নতুন ব্যবস্থাপনায় কিছুটা চাপা পড়ে। তার আগেই হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ "হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ" স্থাপন করেন। এই কলেজে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভার অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য যোগদান করেন।[১] রাধাকান্ত দেব আগেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যখন একের পর এক পট পরিবর্তন হয়ে চলেছে তখন জেমস লঙ লণ্ডন থেকে চার্চ মিশন সোসাইটির মীরজাপুর স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা এলেন। কলকাতা আসার আগে

কি ভাবে তিনি নিজেকে তৈরী করেছেন তা জেনে নিতে হবে। তা না-জেনে পরবর্তী জীবন অনুশীলন সম্ভব নয়।

১৮১৪—৪০

শৈশব ও কৈশোর: জেমস লণ্ডের জন্ম ২৩শে জুলাই, ১৮১৪ সন। তিনি যে দীর্ঘদেহী ছিলেন তাঁর পদবী সে কথাই বলে। ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারে আয়ারল্যাণ্ডবাসী কতকগুলি পদ্ধতি মান্য করেন। তাঁদের "surname was formed by adding a prefix to the father's name. O'Brien (Grandson of Biren) McConnell (son of Connell)"[১] ইত্যাদি। আবার অনেক সময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা, বলশালী ইত্যাদি অনুযায়ীও নাম নির্দিষ্ট হয়। যেমন, "strength and height sometime took quality as their surname such as Strong or Long"[২] দীর্ঘদেহী ও বলশালী ছিলেন বলেই জেমসের পদবী লঙ।

অনেক চেষ্টা করেও এ যাবৎ তাঁর বাবা ও মায়ের নাম জানতে পারি নি।

জেমসের শৈশব-শিক্ষা হয় আয়ারল্যাণ্ডে। ছোট এই দেশটির আয়তন ২৬,৬০১ স্কোয়ার মাইল, জনসংখ্যা এখনও ৩,000,000 ছাড়ায় নি।[৩] সমুদ্র ও পাহাড়বেষ্টিত অধিবাসীরা কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল বলে খ্যাত।

আইরিশ সমুদ্র ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝে এবং গ্রেটব্রিটেনের পশ্চিমে এ দেশটি অবস্থিত। দেশটি দুটি অংশে বিভক্ত, অধিকাংশ অঞ্চল স্বাধীন, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল যুক্তরাজ্যের অধীন। প্রাচীন অধিবাসীরা কেলটিকদের বংশধর। তারা প্রায় ২000 বছর আগে বসতি স্থাপন করে। ভূমি-সন্তানেরা এখনও কেলটিক (গ্যালিক) ভাষায় কথা বলতে উৎসাহী। জেমস নিজেও এ ভাষা জানতেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে কেলটিকদের উল্লেখ আছে। বর্তমানে অধিকাংশ আইরিশ ইংরেজীতে কথা বলে, অনেকেই প্রায় ইংরেজ বনে গেছে। তবু ইংরেজদের চেয়ে নিজেদের একটু পৃথক বা স্বতন্ত্র বলে দাবী করে।

সেইণ্ট প্যাট্রিক আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। "After the barbarians overrun Europe in 500s-600s, devout Irish monks kept Christanity alive. They copied down the religious scripture by hand in beautifully decorated books, such as the

famous "Book of Kells". Ancient Celtic folklore survived in ballads and legends. Late Irish writers sometimes used these legends as themes for their stories and poems."[১] বাটলার ইয়েটস, জেমস জয়েস, অসকার ওয়াইল্ড, জর্জ বার্ণাড শ প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত আইরিশ। জেমস লঙ ঠিক এঁদের মাপের না হলেও যথেষ্ট বিখ্যাত। আরেকজন কৃতি আইরিশ ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। ভগ্নী নিবেদিতাকে আমরা আইরিশ বলে মনে করি না, তাঁকে ভারতীয়ের ন্যায়ই শ্রদ্ধা করি। ১১শতকে ইংরেজরা প্রথম আয়ারল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ১৫ শতকের মধ্যে ভূমি-সন্তানদের জমি দখল আরম্ভ হয়ে যায়। প্রোটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বীরা রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা নিগৃহীত হতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসী ইংরেজদের কাছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়।[২]

আইরিশদের প্রধান খাদ্য আলু। ১৮৪০ সনের শুরু থেকে পরপর কয়েক বৎসর আলুর চাষ নষ্ট হলে সারাদেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৪৫ সনে না খেতে পেয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়। অনেকে যুক্তরাজ্যে পালিয়ে যায়। এই দুর্ভিক্ষের কয়েক বছর আগে ১৮৩৮-৩৯ সনে ইংলণ্ডে যে চার্টিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হয় সেখানে বহু সংখ্যক আইরিশ অংশ নেয়। আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বায়ত্ব-শাসন, উৎপীড়ন রোধ, সমনির্বাচন কেন্দ্র স্থাপন এবং বাঁচার অধিকার দাবী।[৩] আয়াল্যাণ্ডবাসীর দারিদ্র, দুর্দশা, পরাধীনতা এবং অবমাননার হাত থেকে মুক্ত হবার এই সংগ্রাম লক্ষ্য করে বা আন্দোলনে কিশোর জেমস অনুপ্রাণিত হন নি তা মনে করা যায় না।

আয়ারল্যাণ্ডের অবস্থা যখন অশান্ত তখন পড়াশুনা করতে পিতা লঙকে পাঠিয়ে দেন ইংলণ্ড। নিজ দেশের দারিদ্র ও ইংরেজদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেখে শিশু জেমস গুমরাতে থাকেন। আন্দোলনকারীদের দলে ছেলে মিশে না যায় সেদিকে পিতার কড়া নজর ছিল। লণ্ডনের চার্টিষ্ট আন্দোলনের হাওয়া থেকে দূরে রাখার ইচ্ছায় তিনি জেমসকে পাঠিয়ে দিলেন সেণ্ট পিটার্সবার্গে। সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিদ্যালয়ের তখন সারা ইউরোপে খুব নামডাক।

১৮৩৫ সনে জেমস সেণ্ট পিটার্সবার্গের ছাত্র। সেখান থেকে ১৮৩৮ সনের মধ্যে চলে আসেন ইংলণ্ডে। ভর্তি হন চার্চ অব লণ্ডনের ইশলিংটন কলেজে। এখানে অ্যাংলিকান চার্চের যাজকদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেয়া হত। সুস্থ ও

খনেদী পরিবারের ছেলেরা এ কলেজে পাঠ নিতেন। ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল। চরিত্র, মেধা, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা প্রভৃতি যাচাই করে ছাত্র ভর্তি করা হত।

জেমস যখন ইশলিংটন কলেজের ছাত্র তখন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পিয়ারসন। অল্পদিনের মধ্যেই জেমস মিঃ পিয়ারসনের প্রিয় ছাত্রদের একজন হয়ে উঠলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যক্ষ মহোদয় অবসর নেন। নতুন অধ্যক্ষ হয়ে আসেন মিঃ চাইল্ড। মিঃ পিয়ারসনের বিদায় অভিনন্দন সভায় সভাপতিত্ব করেন মিঃ চাইল্ড। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন মিঃ পিয়ারসন। অনুষ্ঠানান্তে মিঃ পিয়ারসন জেমসকে মিঃ চাইল্ডের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটি একটি রত্নবিশেষ।' তিনি জেমসকে বহু ভাষাবিদ পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করে বললেন ভাষা শিক্ষার প্রতি এর যে নিষ্ঠা, আগ্রহ এবং যোগ্যতা তাতে ভবিষ্যতে কৃতী ভাষাবিজ্ঞানী হবে। ইতিমধ্যেই সে ইউরোপের নয়টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে।[১] শিক্ষকের এই প্রসংশা জেমসের মনে নতুন নতুন ভাষা শিখতে আগ্রহ জাগায়।

শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮৩৯ সনে তিনি লণ্ডনে যাজকের শিক্ষানবীশ। কয়েকমাস পরে যাজক। কর্মস্থল ভারতবর্ষ, কর্মস্থান কলকাতার মীরজাপুর অঞ্চলের চার্চ অব ইংলণ্ডের ইংরেজী পাঠশালা। ভারতবর্ষে আসার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি লণ্ডনে অগ্রজ পাদরী অ্যাডম স্মিথের সঙ্গে দেখা করেন ভারতবর্ষীয় শিক্ষা ও সমাজের অবস্থা জানতে। স্মিথ লঙকে বললেন জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে (এই সময় অ্যাডম স্মিথ লণ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন করে ফেলেছেন সে কথা পূর্বেই বলেছি)। দেখা করলেন লণ্ডনের অন্যান্য ভারত বন্ধুদের সঙ্গেও। বিদেশে অর্থাৎ ভারতে চাকরির সর্তাদি বুঝে নিতেও কিছু সময় লাগে। তারপর ১৮৪০ সনের ১৪ই জুলাই কলকাতাগামী জাহাজে রওনা হলেন লণ্ডন থেকে।[২]

এখানে যখন এলেন স্থানীয় লোকেদের ভাষা তখন তিনি কিছুই জানেন না। অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা আয়ত্ব করে নিলেন। অধিকতর নজর দিলেন বাঙলা ভাষার দিকে। কারণ, ভারতবর্ষের যে স্থানে বসে তাঁকে কাজ করতে হবে সেখানকার স্থানীয় ভাষা বাঙলা। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করতেই দেখলেন যে ১৮১৫সনের রামমোহনের "বেদান্তগ্রন্থ" প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙালীরা মাতৃভাষা ও গদ্যসাহিত্যের দায়িত্ব না লওয়া পর্যন্ত

ইউরোপীয় পাদরী ও শিক্ষাবিদেরাই এই ভাষা ও সাহিত্যের ধারা বজায় রেখেছিলেন। লঙ পাদরী হিসাবে অগ্রজ পাদরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁকে প্রেরণা জোগালেন জোশুয়া মার্শম্যান। মার্শম্যান তখন গভর্ণমেণ্ট গেজেট ও আরও দুখানি পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতবাসীর শিক্ষা, কৃষি, বনসম্পদ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট। ১৮৪০ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত দেশীয় সংবাদপত্রের দ্বারা তিনি নিন্দিত ও সমালোচিত, তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ১৮৫২ সনে তিপান্ন বছরের কর্মস্থল ত্যাগ করে চিরতরে ইংলণ্ড চলে যান। লঙ আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে গিয়েছেন। লঙের মৃত্যুর মাত্র দশ বছর আগে ১৮৭৭ সনের ৮ই জুলাই তিনি লণ্ডনের রেডক্লিফ স্কোয়ার নর্থে দেহ রাখেন।[১] মার্শম্যান একদিকে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও কর্মবীর এবং অন্যদিকে খামখেয়ালী কবি, উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগলিপ্সু। তিনি বাঙলা সাহিত্যের যে উপকার সাধন করে গেছেন তা বিস্ময়কর। তিনি লঙকে বোঝালেন, অষ্টদশ শতকের বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান প্রায় কিছুই নেই। রামরাম বসু বাঙালী ছিলেন, কিন্তু তিনিও বিদেশীয়দের দ্বারা উৎসাহিত এবং তাঁদেরই অন্নে প্রতিপালিত ছিলেন। পরবর্তীকালে জেমস লঙ কি ভাবে বাঙলাভাষা, সাহিত্য এবং বাঙালী জীবনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গীকৃত করলেন তা পরিস্কার করার আগে চার্চ মিশন অব ইংলণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলে নেব।

চার্চ মিশন অব ইংলণ্ড ঃ লণ্ডনে চার্চ মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৯ সনে। ১৮০৭ সনে এই সোসাইটি ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় শাখা খোলার প্রস্তাব নিয়ে অর্থ মঞ্জুর করেন। ১৮১৪ সনে মঞ্জুরীকৃত টাকার কিছু অংশ দেশীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তদনুযায়ী ১৮১৫ সনে কলকাতায় এবং ১৮১৬ সনে খিদিরপুরে সোসাইটির ভার্ণাকুলার স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন কাপ্তেন স্টুয়ার্ট। ১৮২০ সনে লণ্ডনের কেন্দ্রীয় অফিস কলকাতায় স্থায়ী শাখা কার্যালয় স্থাপন করার নির্দেশ দেন। মিশন হাউস, মিশনচার্চ, বিদ্যালয়, ছাপাখানা, বাঁধাই বিভাগ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়। স্থানীয় কমিটি তখন অক্টোবর মাসে মীরজাপুর অঞ্চলের একটি বড় বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন তিন একর জমি ক্রয় করেন। আরও জমির প্রয়োজন হলে ১৮২৬ সনে আমহার্স্ট স্ট্রীট সংলগ্ন অংশটি ক্রয় করেন লটারী কমিটির নিকট থেকে। ১৮২১ সনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, উদ্বোধন করেন মিস কুক।

১। সজনীকান্ত দাস : বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

১৮২২ সনে জার্মান মিশনারী মিঃ জে এ জেটারের তত্ত্বাবধানে খোলা হয় ইংরেজী স্কুল। ১৮২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় মিশন হাউস।[১] প্রতিষ্ঠা বৎসর থেকে তের-চৌদ্দ বছর পর জেমস লঙ যখন কলকাতা এলেন তখন মিশন হাউসের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। এগিয়ে চলেছে ওদের ধর্মদীক্ষার কাজ এবং দেশীয় প্রধান ও দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের খ্রীষ্টানবিরোধী প্রচারাভিযান।

ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশ বছর (১৮২২-৩২) স্কুলের দায়িত্বে থাকেন ইউরোপীয় পাদরীরা। ১৮৩২ সনে উপযুক্ত দেশীয় শিক্ষক পাওয়া গেলে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের উপর ইংরেজী বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, কৃষ্ণমোহন স্কটিশ মিশনের দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি স্কটিশ মিশনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চার্চ মিশনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সেজন্য আলেকজাণ্ডার ডাফ কৃষ্ণমোহনের ওপর সুখী ছিলেন না। কৃষ্ণমোহন চার বৎসরের বেশী মীরজাপুর স্কুলের দায়িত্বে থাকতে পারেন না। ১৮৩৬ সনে চার্চ মিশনের সভ্যদের মধ্যে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২] কৃষ্ণমোহনের পদত্যাগের পর প্রধান শিক্ষক হলেন মহেশচন্দ্র ঘোষ তিনি এক বছরের মধ্যে পরলোকগত হন। পুনরায় এ স্কুলের দায়িত্ব চলে যায় ইউরোপীয় পাদরীদের হাতে। ১৮৩৭ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত বা জেমস লঙের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এ স্কুলের সর্বেসর্বা মিঃ ম্যাকলিয়ন।

লঙ এসেই নতুন হাওয়া বওয়াতে চাইলেন। নতুন যৌবনের উদ্যমে পুরাতন বা চলতি পদ্ধতিতে কাজ করতে উৎসাহ পেলেন না। তার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই মিশনের কিছু সভ্যকে প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করালেন। তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা দলে ভারী ছিলেন না, ক্ষমতাও না। তবু তাঁরা নানা প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করতে পারছিলেন। লঙের লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গিজাত বহু কাজে তাঁদের অসুবিধা হতে থাকে। বিরোধীদের উপেক্ষা করে লঙ নিজের ভাবনা অনুযায়ী এগোচ্ছিলেন। অন্যদিকে বিরোধীরাও নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধতে থাকেন।

ছাব্বিশ বছরের যুবকের মাথায় তখন আইডিয়া ও পরিকল্পনা গিজ-গিজ করছে। তিনি বললেন, ধর্মপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মপ্রচারকে কাজে লাগাতে হলে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে

হবে। ছাত্রদের মধ্যে সত্যিকার জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়াতে হবে। তাদের অনুসন্ধিৎসা বাড়াবার জন্য স্বাস্থ্য-চর্চা, ভ্রমণ, যাদুঘর এবং বিশেষ স্থান পরিদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারের উপর আকর্ষণ বাড়াতে হবে। অর্থাৎ অধ্যয়ন ও পাঠ্যসূচীর মধ্যেই ছাত্রদের আবদ্ধ রাখলে চলবে না। তিনি এসবের ব্যবস্থাও করলেন। আরও ব্যবস্থা করলেন বিতর্ক, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির। লঙের অভিভাবকত্বে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। ক্রমেই অধিক সংখ্যক ছাত্র লঙের স্কুলের দিকে ধাবিত হতে থাকে। স্কুলের ছাত্রদের মারফৎ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজও এগিয়ে চলে।

শিক্ষাকে নতুন খাতে বহাতে গিয়ে নানাধরণের বাড়তি কাজের মধ্যে গিয়ে পড়লেন লঙ। তখন পর্তুগীজ বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ বেড়ে যায়, বহু মণ্ডলী স্থাপিত হয়। কলকাতার হেদুয়ায় স্কটল্যাণ্ড মিশন, মীরজাপুর অঞ্চলে চার্চ মিশনারী সোসাইটি, বেকবাগান, টালীগঞ্জ ও বারুইপুরে সোসাইটি ফর দি প্রপাগেশন অব গসপেল, ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে খিদিরপুর, চেতলা, কালীঘাট অঞ্চলে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, ধর্মতলা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মেথডিষ্ট মিশন এবং শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে শ্রীরামপুর মিশন (পরে ব্যাপটিষ্ট মিশন) খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নানা উদ্যোগ নিলেন। মিশনারী পাদরী সম্প্রদায় ক্রমে বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করলেন। মিশনারী পাদরীর দল নৌকা, পালকি অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ও পদব্রজে দুর্গত মানুষের সেবায় মনোনিবেশ করতে থাকেন। তখন রাস্তাঘাট একপ্রকার ছিল না বললেই চলে, তাই যাতায়াতের কষ্টেরও অবধি ছিল না। লঙ যখন চার্চ মিশনারী সোসাইটির কাজ নিয়ে এগোলেন তখন মীরজাপুর কেন্দ্র উত্তর কলকাতার বরানগর, দমদম, আগরপাড়া, পটলডাঙ্গা; দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর, খিদিরপুর এবং ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে বাইলা, ঠাকুরপুকুর, রামনগর, বসপুঁজি, কলাগাছিয়া, দিঘিরপার, কুলপি, বজবজ প্রভৃতি স্থানের দায়িত্ব পেয়েছিল। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও মণ্ডলী স্থাপিত হতে থাকে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর অঞ্চল, বর্ধমান, আগ্রা, বেনারস, চুনার, গোরখপুর, জৌনপুর, ভাগলপুর, মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি উত্তর ভারতের নানা মণ্ডলী কলকাতার কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পরিচালিত হতে থাকে।

ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে পাঠশালা ও মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল রেভারেণ্ড হেবলিনের দ্বারা, তাঁকে সাহায্য করেছিলেন টি· সাণ্ডিস ও জে· জি· লিংকে। লঙ ১৮৪৪ সন থেকে ঠাকুরপুকুর আসা-যাওয়া করতে থাকেন, এবং ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৯

সনের মধ্যে এতদঞ্চলের বহু অধিবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে, দীক্ষা দিতে পারেন। সি. এম. এস. মিশনের ১৮৪৪ সনের ৮ই আগষ্ট এবং ২৯শে ডিসেম্বর মিনিট থেকে জানা যায় যে ১৮৩৬ সনে রেভারেণ্ড হেবলিন প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরপুকুরের গীর্জাঘর উপাসকদের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত না হওয়ায় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশস্ত উপাসনাঘর, ছাত্রাবাস, ও মিশনারীদের আবাসস্থল প্রভৃতির দরকার হয়ে পড়ে। এগুলো নির্মাণের জন্য জেমস লঙ মিশনের কাছে চার হাজার টাকা চান। টাকা পাওয়া গেলে জেমস লঙের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৯ সনের মধ্যেই নতুন চার্চ, বাঙলা পাঠশালা, মিশনারীদের থাকবার ঘর প্রভৃতি নির্মিত হয়। তখন লঙকে মীরজাপুরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঠাকুরপুকুরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৫০ সনে তিনি ঠাকুরপুকুরের কোয়ার্টারে চলে আসেন। লঙের এই বাড়ীটি ছিল দোতালা। অন্যান্য মিশনারীদের থাকার ঘরে ছিল মাটির দেওয়াল ও গোলপাতার ছাউনি। বিদ্যালয়ের বাড়ীটিও নতুন করে তৈরী হয়। লঙের আমলের চার্চের একটি মানচিত্র আছে ঠাকুরপুকুর চার্চে। এই মানচিত্রে ঠাকুরপুকুরের পরিকল্পনা, চার্চের প্রপার্টি প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

লঙ ঠাকুরপুকুরে এসে স্থানীয় মণ্ডলী, নিকটবর্তী গ্রামের অন্যান্য মণ্ডলী এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য নতুন জাগরণ আনেন। বাঙলা ভাষায় শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি আবিস্কার, সহজ পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং কবরস্থানের জন্য জমি ক্রয় করেন। মীরজাপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখেন। রোজ সকালে নিজস্ব ফিটনে করে লঙ মীরজাপুর আসতেন। দুপুরে ঠাকুরপুকুরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, বিকেলে লেখাপড়ার কাজ নিয়ে মেতে থাকতেন। লঙের পরিচালনায় ঠাকুরপুকুরের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশীবিদেশী প্রধান এবং আমলারা প্রায়ই এখানে আসতেন লঙের বাঙলা পাঠশালা ও কার্যধারা লক্ষ্য করতে।

মানসিক প্রস্তুতি ঃ প্রসঙ্গত জুলাই মাস জেমস লঙের জীবনের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এই মাসে তিনি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করেন, প্রথম বিয়ে করেন, প্রকাশ করেন সচিত্র মাসিক 'সত্যার্ণব'। যে কোন নতুন বা শুভকাজ করার জন্য জেমস লঙ জুলাই মাসকেই প্রশস্ত মনে করতেন। আইরিশ ঐতিহ্য ও চেতনার জন্য তিনি জুলাই মাসের ব্যাপারে স্পর্শকাতর ছিলেন। অবশ্য এই জুলাই মাস তাঁকে অনেক দুঃখও দিয়েছে। এ মাসে তিনি হারিয়েছেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীকে, হারিয়ে প্রায় বিশবছর বিপত্নীক ছিলেন। এবং এ মাসে অনুষ্ঠিত নীলদর্পণ মামলায় কারা ও অর্থদণ্ডে

দণ্ডিত হয়েছিলেন। তবু জুলাই মাসকে ভালবাসতে ভোলেন নি। আইরিশদের কাছে জুলাই মাস বড়ই প্রিয়। এ মাস তাঁদের ছুটির মাস।

জুলিয়াস সীজার নিজের নামানুসারে এ মাসের নামাকরণ করেন। বারোই জুলাই সিজারের জন্ম, এগারই রবার্ট ব্রুস স্কটল্যাণ্ডকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করেন। আইরিশরা ১২ জুলাইকে 'অরেঞ্জ-ডে' হিসাবে পালন করে। এই দিনে প্রোটেষ্ট্যাণ্টরা ক্যাথলিকদের হারিয়ে দিয়েছিল Battle of the Boyne-তে ১৬৯০ সনে।[১] পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের একটি অংশ সরকারের নিকট থেকে দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য যে '১২ই জুলাই কমিটি' গঠন করেছেন তা কাকতালীয়, তাঁরা বোধ হয় এ দিবসটির পূর্ববর্ণিত তাৎপর্য না জেনেই ১২ই জুলাই কমিটি গঠন করেছেন।

জেমস লঙ ছোটবেলা থেকেই প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের লড়াইর সঙ্গে পরিচিত। আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের চেয়ে প্রোটেষ্টাণ্টরা স্বচ্ছল, ব্যবসা বাণিজ্য যা-কিছু সবই ছিল তাদের হাতে। তাদের সঙ্গে বিত্তবান ও বলশালী ইংরেজদের সম্পর্ক দুঃস্থ নিপীড়িত আইরিশ ক্যাথলিকদের সম্পর্কের চেয়ে মধুর। মধুর হলেও অনেক বিষয়ে ফারাক এবং ব্যবধান ছিল। তা নিয়ে মতবিরোধ এবং সংঘর্ষও হত। ছোটবেলা থেকে জেমস লঙ এ সব প্রত্যক্ষ করেছেন, তার ফলে ইংলিশ-আইরিশ, অত্যাচারিত-উৎপীড়ক প্রভৃতির সম্পর্কে একটা ধারণাও নিশ্চয় করে নিয়েছিলেন।

লঙের কোন ভাই ছিল কিনা খোঁজ পাই নি, তবে একটি বোনের সন্ধান পাওয়া গেছে। নাম ছিল এলিজা, পরবর্তীকালে মিসেস হল। আয়ার্ল্যাণ্ডের মিঃ এস. সি. হলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। হল দম্পতি আইরিশ সমাজজীবন এবং ভূমি সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের রচিত গ্রন্থ আছে। এলিজার সঙ্গে লঙের সম্পর্ক হৃদ্য ছিল।

জেমস ও এলিজা জুলাই মাসের অগ্নি উৎসব বা বনফায়ারের অনুরক্ত ছিলেন। শুধু ওরা কেন, উলসটারের প্রত্যেকটি প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবারই জুলাই উৎসবকে জাতীয় উৎসব বলে মান্য করে। এই উৎসব উপলক্ষে আগুনকে ঘিরে নাচ, গান ও আনন্দস্ফূর্তি চলে। চলে খাদ্য ও পানীয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার। অনুষ্ঠানের সময় এক থেকে বারো জুলাই। এ উপলক্ষে যে বনফায়ার তা জাতীয় উৎসব।

তবে অন্য যে কোন উৎসব, অনুষ্ঠান, বিজয় প্রভৃতি উপলক্ষেও বনফায়ার অনুষ্ঠিত হতে পারে। একটি রিপোর্টে দেখি: "riot, bloodshed and

১। Young Students Encyclopadea, op. cit.

death inevitably attend bonfires."[১] অগ্নি উৎসবের দ্বারা অশুভশক্তিকে দাহ করা হয়। হিন্দুদের দোলপূর্ণিমার চাঁচর বা বুড়ীরঘর পোড়ানোর সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের অগ্নি উৎসবের একটা সাদৃশ্য খুঁজে বের করা সম্ভব। লোকপ্রচলিত কাহিনী অনুসারে প্রহলাদকে বধ করার জন্য দেবদ্বেষী রাজা হোলিকা রাক্ষসীকে নিযুক্ত করেন। তদনুসারে বিরাট আগুন জ্বালিয়ে হোলিকা প্রহলাদকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। বিষ্ণুর অনুগ্রহে প্রহলাদ রক্ষা পান, এবং ঐ আগুনে রাক্ষসী মারা যায়। এখন হোলি উপলক্ষে অমঙ্গলের প্রতীক হোলিকার বা ঢুণ্ডার দাহের অনুকরণ করা হয়—আগুনে সমস্ত আবর্জনা ও অশুভ বস্তু পুড়িয়ে দেয়া হয়। দক্ষিণভারতে এই অগ্ন্যুৎসবের নাম কামদহন। অনেকের মতে এই আগুনের উৎসব হচ্ছে নতুন শস্যোৎসব। তাই ছোলা, গম প্রভৃতি শস্যের শিষ এই আগুনে পোড়ানো হয়।[২] বাঙলাদেশের আগুন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুনে চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যায় (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)। আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় অগ্ন্যুৎসব অনুষ্ঠিত হয় জুলাই মাসের প্রথম পক্ষে। এই উৎসবে বিরোধী বা অশুভশক্তির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। মধ্যযুগে সমবেতভাবে অগ্নি প্রজ্বালনের যে রীতির কথা বিদ্বানেরা জানিয়েছেন তার অন্তরালে অগ্নি-আবিষ্কার জনিত উল্লাসের ব্যাপার আছে বলে অনেকে মনে করেন। অগ্নিকে শুভ মনে করা হয় বলেই পূজানুষ্ঠান, যাত্রা ইত্যাদিতে দীপ জ্বালা হয়। অগ্নি-প্রদক্ষিণ, অগ্নিবহন ও যজ্ঞাগ্নি প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধি আসে। Bon-fire-কে অনেকে বলতেন bone-fire বা শুভ-অগ্নি। "In Scotland...for the annual mid-summar 'bone-fire' or 'bon-fire' in the burgh of Hawick, old bones were regularly collected and stored up, down to c. 1800" (OED, Oxford, 1933). মৃতের হাড় সংরক্ষণ ও নেড়ার ঘর, মেড়া, খড় বা পিঁটুলি নির্মিত মানুষের আকৃতি দহনের দ্বারা সমস্ত অকল্যাণকর বস্তু দগ্ধ করা হয় বলে লোক বিশ্বাস।

জেমস লঙ যে বছর ভারতবর্ষে আসেন তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪১ সনে "Birth of an heir to the throne in November 1841 was marked by bonfires at Comber, in North County Down, and the acquittal of Queen Charlotte on a charge of adultry in 1820 was marked in Colaraine Ballymena and Autrein by celebratory bonfire and lighted tar barrels, the celebrants being referred

to as 'Bonfire Loyalists'. আরও নানাকারণে অগ্নি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আয়ারল্যাণ্ডে। যেমন—"in May 1836 the anticipated ejection of Daniel O'Connell from his seat as M. P. for Dublin was celebrated with lighted tar barrels in Bombridle, County Down and in Enniskillen county Fermanagh...in March 1833 the election of Lord Marcus Hill an M. P., favoured by the Orangemen, was celebrated in Norway by kindling bonfire at several places in town"[১] এগুলো হচ্ছে অকেশনাল উৎসব। কিন্তু জুলাই মাসের এক থেকে বারো পর্যন্ত যে অগ্নি-উৎসব তা জাতীয় উৎসব। যেমন দোল বা হোলি আমাদের জাতীয় উৎসব। আয়ারল্যাণ্ডের এই অগ্নি উৎসবের সঙ্গে ও জুলাই মাসের সঙ্গে ছিল জেমস লঙের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তা তাঁকে হোলি বা দোল উৎসবের ব্যাপারেও তথ্যাদি সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করে। তিনি দেশীয় জনসাধারণের কাছে নানাধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে হোলি বা দোলের এবং বুড়ীর ঘর বা চাঁচর পোড়াবার উদ্দেশ্য জানতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন—"In the Holi festival . is a castor oil tree planted as a kind of Maypole ? How far festivals such as the Holi contribute to idleness and dissipation ? Any observance like April fool in the Holi ? The significance of fire in the Holi ?[২] প্রভৃতি।

জুলাই মাসকে শুভ মাস হিসাবে গ্রহণের যে আইরিশ ঐতিহ্য তাঁর রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিল সেই ঐতিহ্য-চেতনা তাঁকে এ মাসে কার্যারম্ভ, যাত্রা ইত্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রেরণা জোগাত। পঞ্জিকা দেখে সব কাজ করার ঝোঁক না থাকলেও হিন্দু পঞ্জিকার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি দেশীয় পঞ্জিকা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে ১৮৪৬ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত ক্যালকাটা ট্রাক্ট সোসাইটি যে পঞ্জিকা প্রকাশ করে তাতে থাকে: "neat lithographic drawings of some heavenly bodies ; it contained information on the following subjects : the solar system ; comets, earth and moon, the various modes of calculating by the Hindus, English and Musalmans, Eclips calendar of sunrise, sunset, moon's phases, holidays, tides,

Jewise epochs coins, weights, stamp duties, human body, missionary statistics."[১]

গত শতকের তিরিশ থেকেই ভারতবর্ষ যেমন উত্তাল বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষাসংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে, লঙের মাতৃভূমি আয়ারল্যাণ্ডও তখন তেমনি উত্তাল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন নিয়ে। উভয় দেশের যুদ্ধ—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ডের যুবসম্প্রদায় এদেশের যুবসম্প্রদায়ের মতই তীব্র। যুবক জেমস সেই আন্দোলনের সময় শীতল ছিলেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। একদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা অন্যদিকে খ্রীষ্টিয় মানবতাবোধ তাঁকে শোষক ও উৎপীড়ক বিরোধী করে তুলেছিল। তাঁর মানবতাবোধ বণিক ইংরেজদের অস্বাভাবিক লাভ, লোভ ও শোষণকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। আবার প্রোটেষ্টাণ্ট হিসাবে ক্যাথলিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রোটেষ্টাণ্ট ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেতেও তাঁর সায় ছিল না। তাই তাঁকে অ্যাডজাষ্ট করে চলতে হয়েছে। দেশে থাকতে রোমান ক্যাথলিকদের দাবী সঠিক মনে হলেও তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন নি, এ দেশে ইংরেজ-স্বার্থরক্ষাকরার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা বণিক ও শোষকদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেন নি। এজন্য তাঁকে স্ববিরোধিতায় ভুগতে হয়েছে। মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্টও পেতে হয়েছে। জীবনযন্ত্রণার অস্থিরতা তাঁকে কর্মচঞ্চল রেখেছিল।

ষোল-সতের বৎসর বয়স থেকেই জেমস লঙ রাজনীতি সচেতন। কিন্তু পিতা ইংলিশ-আইরিশ বিবাদে ছেলেকে জড়াতে দেন নি।

১৮৩১ সনে লণ্ডনের হাউস অব লর্ডস যখন আয়ারল্যাণ্ডের রিফর্ম বিল অগ্রাহ্য করে তখন তা নিয়ে সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের পথ দিয়ে ১৮৩৫ সনে "while still in opposition Russel had revived his proposal for diverting part of revenues from Irish tiths to secular purposes. His success in carrying a resolution to this effect through the House of Commons finally decided Peel on resignation"[২] ইত্যাদি নিয়েও আন্দোলন চলে। একদিকে পদত্যাগ,

অন্যদিকে প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে থাকে। জেমস লঙ এই আন্দোলনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বা এ ব্যাপারে তাঁকে মাথা গলাতে দেখলে ছেলে কোন দলে ঝুঁকে পড়ার আগেই বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের বিদ্যায়তনে। কিন্তু তাতে জেমসের রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যাহত হয় নি। তিনি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও রাজনীতি সচেতন ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা পাদরী জীবনে তাঁকে অনেকে লালাটি দিয়েছে। তাই বিরোধীদের উদ্দেশ্যে আদালতে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিতে হয়েছিল—"Christianity itself is political in extended sense; for early ages it assailed the slavery of the :Roman Empire, in the middle ages it afforded an asylam to the serfs against the oppressions of the fedual chiefs; at the period of Reformation it brought freedom to the peasant's home; and in modern days it has abolished slavery in the West Indes. It has protested aganist American slavery and is now throwing its mantle of protection round the aboriginal tribes throughout the world."[১]

১৮৩৫ সনের "Report from the Select Committee appointed to inquire into the Nature, Character, Extent and Tendency of Orange Lodges Associations or Societies in Ireland" প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট যুবক জেমস লঙকে স্বদেশীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, হয়তো বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সামিল হতেও প্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু সে পথে যেতে পারেন নি। সংগ্রামী মন নিয়ে উদ্যত যৌবনে তিনি রাশিয়ার জন-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন দু-তিন বছর। ১৮৩৮ সনের মধ্যে স্বদেশের উত্তাপ কিছুটা কমে এলে ফিরে আসেন লণ্ডন।

ভারততীর্থে-কর্মক্ষেত্রে: পিতার অনিচ্ছায় বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন জেমস লঙ সেই বয়সেই। রাজনীতির উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধর্মনীতির সঙ্গে যুক্ত করলেন। আসলে ছোটবেলা থেকেই জেমস লঙ সঙ্কল্পে অটল। যা বুঝতেন যা ভাল মনে করতেন তা থেকে কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারতো না। তবু পিতাকে মান্য করতে গিয়ে রাজনীতিজ্ঞ হতে পারেন নি, অথচ রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাকেও একদম উপেক্ষা করতে পারেন নি।

স্মরণে আছে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম জেমস লঙ ভাগ্যবাদী না পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলেন? জেমস লঙ-আদি খ্রীস্টানদের বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের অভিনব সৃষ্টি। আত্মা অজর ও অমর। আত্মার জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু নেই। উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নেই। আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই। তাঁদের ধারণায় দণ্ডপুরস্কারের সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঈশ্বর পাপ ও পুণ্যের বিচারক। তিনি পাপ ও পুণ্যকে তৌল করে সুখদুঃখের বিধান দেন। পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ। ইহলোকে যে অবাধ কাম বা লোভ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তার ফলে তাকে কামলোকে ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। গ্রীক পুরাণের সিসিফস ও টেণ্টালাসের গল্পে এ শিক্ষা পাই। হিন্দুপুরাণের নরকযন্ত্রণা এবং রোমান ক্যাথলিকদের purgatory একই কল্পনা। খ্রীষ্টানেরা বলেন, 'As you sow, so you reap'. মহাভারত বলেছেন—"না বীজাৎ জায়তে কিঞ্চিৎ" অর্থাৎ কৃতির ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়মিত হয়। 'যৎ কর্ম কুরুতে, তদভিসংপদ্যতে", কর্মের গতি নির্ধারণ অতি দুরূহ। অনেক সময় স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা কর্মচক্রের মধ্যে নতুন শক্তি ও সম্ভাবনার সন্নিবেশ করা সম্ভব। কর্মই বলবান—বিধিও তার বিফলতা করতে পারেন না। কর্মই যদি জীবনের নিয়ন্তা হয় তবে প্রযত্ন বা পুরুষকারের স্থান কোথায়? মানুষ কি অদৃষ্টের দাস?

প্রাচীন গ্রীকদের তিনজন ভাগ্যদেবী ছিলেন, এঁরা এট্রোপস, লাকেসিস ও ক্লোথা। উরিপাইডস, সফোক্লস প্রভৃতি তাঁদের নাটকাদিতে ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামের কথা জানিয়েছেন। মুসলমানদের কিসমৎ এবং ইহুদীদের ফ্যারিসি দেব নির্ভরতার চিন্তা। সেইণ্ট আগাষ্টাইন pre-destination-এর আলোচনায় বলেছেন—জীব ভবিতব্যের দাস। পরবর্তীযুগে ক্যালভিন ভবিতব্যবাদকে দৃঢ়ীকৃত করলেন। তাঁর মতে ভাগ্যই প্রধান, পৌরুষ নিষ্ফল। পুরুষকারে বিশ্বাসীরা বললেন—ভাগ্য বা অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। প্রযত্নের দ্বারা মানুষ যা কিছু তা করতে পারে। মানুষ অবস্থার বা অদৃষ্টের দাস নয়, সে অবস্থার বা অদৃষ্টের প্রভু।

অন্যদিকে ভাগ্যবাদীরা বললেন—সমস্তই দৈবাধীন। কোথাও মানুষের পৌরুষ প্রকাশের অবকাশ নেই। যা ভবিতব্য, যা বিধাতৃবিহিত পাপপুণ্য, শুভাশুভ হিতাহিত, সুকৃত-দুস্কৃত সহস্র চেষ্টাতেও মানুষ তার অন্যথা করতে পারে না। কিন্তু দৈববাদকে যদি সত্য বলে মানা হয় তবে বিবেক ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, বিবেক উচিত-অনুচিত বিষয়ে উপদেশ দেয়—'এটা কর্তব্য, এটা কর; এটা অকর্তব্য, এটা করিও না।' যখনই কেউ পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখনই তার বিবেক হৃদয়কন্দর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে। একেই ক্যাণ্ট বলছেন

Categorical Imperative. এই নিষেধাজ্ঞা থেকে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মে নানা বিধিনিষেধ ও উপদেশ এসে গেছে। মানুষের ক্রিয়মান কর্মে স্বাধীনতা আছে সে আপন রুচি-প্রবৃত্তি অনুযায়ী পথ বেছে নিতে পারে। পথ বেছে নিতে গিয়ে ভুল না করে সে জন্যই শাস্ত্রকারের বিধিনিষেধ এবং বিবেকের বাণী। বিবেক অনেককে অদৃষ্টবাদী করে। কারণ, অদৃষ্টবাদে দৈব এবং পুরুষকারের সমন্বয় দেখতে পাই। অদৃষ্টবাদের মধ্যে যে দৈব ও পুরুষকারের সমন্বয় দেখি জেমস লঙের মধ্যেও তার সন্ধান পাই। অদৃষ্টবাদী কর্মাতিরিক্ত কোন দৈব মানেন না—"কল্পিতং মোহিতৈর্মন্দৈর্দৈবং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে"। বাস্তবিক দৈব বলে কিছু নেই—এটা কল্পনা। যা দৈব তা পৌরুষেরই নামান্তর। কার্যসিদ্ধির জন্য দৈব এবং পুরুষকারের যোজনা আবশ্যক। মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়াপুতুল নয় সে ভাগ্যের নিয়ামক। এই বিচারে জেমস লঙ ভাগ্যবাদী এবং অদৃষ্টবাদী দুই-ই। ছাত্র ও বাল্য-জীবনে পেয়েছেন পিতামাতা ও শিক্ষকদের অগাধ স্নেহ। ছাত্রজীবন সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছেন চাকরি। কর্মজীবনে মিলেছে দেশী-বিদেশী সুহৃদ ও বন্ধুদের সহৃদয় ভালবাসা। তবু এ কথা উল্লেখ না করে পারি না যে বিশ্বে এমন লোক বোধহয় দেখা যায় না যিনি সোনার চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই চামচ মুখে নিয়েই পুষ্পশয্যায় গত হন। প্রত্যেক ভাগ্যবান ব্যক্তির সঙ্গেই ভাগ্য ও অভাগ্য হাত ধরাধরি করে চলে। লঙের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

বিপত্নীক অবস্থায় যখন লঙ কলকাতা ফিরলেন তখন থেকেই দেশীয় ভাষা সাহিত্য ও দেশীয় জনগণের ব্যাপারে তাঁর নতুন উৎসাহের ব্যাপার দেখতে পাই। এটা একটা পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ব্যাপারে লণ্ডনেরও নির্দেশ থাকতে পারে অথবা কলকাতার চার্চ মিশন সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে মতানৈক্য জনিত মানসিক পীড়াও কারণ হতে পারে।

১৮৬১ সনের পর জেমস লঙের জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ে তেমন বাড়ে মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা। নানামহল থেকে বিরূপ মন্তব্য ও নিন্দা শুনতে-শুনতে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েন। আদালতের সম্মুখে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন নিজের কাজের সমর্থনে। মনে রাখতে হবে এ বিবৃতিটি আদালতের সম্মুখে দিলেও যাঁদের উদ্দেশ্যে এ বিবৃতি দেওয়া হয় তাঁরা ছিলেন চার্চমিশন ও অন্যান্য মিশনের পাদরী এবং কিছু স্বদেশী আত্মসর্বস্ব বণিক। এই বিবৃতিতে তিনি বললেন—"as long as I live, have a brain to think and a pen to write, to advocate the social elevation of the masses as incidental with the progress of mental and moral light...I trust an

enlightend conscience, and confidently on the continued sympathy of many friends both among the European and Native community, and of all in India and great Britain, who desire to see India governed not merely for the advantage of its fluctuating population, but for the benefit of, and with considerable regard for, the feelings and interest of the 180,000,000 Natives over whom stretches the aegis of the Queen and Parliament. I know I shall have the sympathy of goodmen, the friends of Natives, in India and in England and of all those throughout the world who believe in indissoluble connection of the spiritual and intellectual improvement.[২] "যত দৃঢ় ভঙ্গিতে তিনি এসব কথা বলেছেন নানাধরণের চাপের কাছে নত হয়ে তত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি স্বাধীন মতামতকে নিয়ে এগোতে পারেন নি। তাই তাঁকে এখানে ওখানে সেখানে দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছুটি করতে হয়েছে শনির কোপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। শনিদেবতা তাঁকে দিয়েছেন অনেক, কেড়েও নিয়েছেন অনেক।

জেমস লঙের কার্যধারা বুঝতে হলে এক নিমিষে তাঁর সময়ের বাঙলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক অবস্থা কি ছিল তাও মাথায় রাখতে হবে।

পরিবেশ পরিচয়ঃ আমরা জানি জেমস লঙের কর্মজীবন তাঁর জ্ঞানচর্চার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তিনি যাজকের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই কাজে সার্থকতালাভের আশায় নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং জীবনের ব্রত সাধকের ন্যায় উদযাপন করেছিলেন। তখন এ দেশের অবস্থা ও পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নানাদিকে চলছে ভাঙ্গা-গড়া। সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবন ও শিক্ষা জগতে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে একের পর এক পরিবর্তন।

লঙ এদেশে আসার আগেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ পুরাতন জমিদারী খণ্ডছিন্ন। নতুন জমিদার হতে থাকেন শহরের বণিকশ্রেণী। তাঁরা জমিদারীর উন্নতিকল্পে চিন্তিত নন। চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দিয়ে নিজেদের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবার দিকে তাঁদের ঝোঁক। অবস্থা দেখে

রেভারেণ্ড ডাফ ও অন্যান্য পাদরীরা বলতে থাকেন "জমিদারেরা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন অনেকটা ক্রীতদাসের মত, ঠিক প্রজাদের মত নয়।"[১] তাঁরা নিজেদের রাজামহারাজাদের ন্যায় মনে করতে থাকেন। প্রজাদের নিকট থেকে প্রাপ্য খাজনার চেয়েও বেশী টাকা কৌশল করে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রজাদের নিজেদের কাজে খাটিয়ে নেন। অত্যাচার যে কত প্রকার করতে থাকেন তা বলে শেষ করা যায় না। ফলে চাষীর সর্বনাশ হয়েছে। গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে যে মধ্যস্বত্বভোগীরা ছিলেন তাঁরা এত ভয়ানক নিষ্ঠুর ছিলেন না। ইতিমধ্যে বিচার বিভাগের উন্নতি হয়। আদালত ও নতুন বিচার বিভাগের প্রবর্তনে গ্রাম্য সমাজে তথাকথিত মামলাবিশারদ শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এ সম্পর্কে তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশ—"পূর্বে লোকের বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিলে দেশের দশজনকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইত। এক্ষণে অর্দ্ধহস্ত ভূমির জন্য লোকে চতুর্দ্দশবার আদালতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। এই ছুটাছুটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একশ্রেণীর নতুন লোক দেখা দিয়াছে। লোকেদের বিবাদে সাহায্য করা ইহাদের কাজ। ঐ সকল অলস পরশ্রীকাতর লোকের হয়ত অন্নের সংস্থান আছে পরের কাজ পাইলে ইহাদের সময়টা একটু সুখে যায়। ইহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে যাতায়াত করিয়া কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। ইহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্বোধ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, জাল মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে, উকিল সাক্ষী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে ইহারা বড়ই পটু। ইহারা একজনের পক্ষ হইয়া অপরের সর্বনাশ করে। আবার সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্বনাশের চেষ্টা পায়।"[২] এই হচ্ছে একদিকের চিত্র। অন্যদিকে, বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন—"পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারাদার, গাঁতিদার, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব, গোমস্তা, দেওয়ান, ম্যানেজার, তহশীলদার থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ, এমন কি জমিদারের বাজারসরকার পর্যন্ত আমলাবর্গ নতুন পুলিশের দারোগা,

কনষ্টেবল, মহাজন এবং আইন আদালতের সঙ্গে সংলিপ্ট দালাল থেকে উকিল পর্যন্ত নানারকমের লোক নিয়ে বাংলার গ্রাম্য সমাজে যে বিপুল কলেবর এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হল, অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের (production) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রইল না।" [১] গোদের ওপর বিষফোঁড়ের মত এর ওপর আরম্ভ হয়ে গেল নীলকরদের অত্যাচার।

সারা বাঙলায় নীলকরেরা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ বা মামলা মোকদ্দমা রুজু করা যায় না। তারা জোর করে চাষীদের দিয়ে নীল চাষ করায়। চাষীদের পারিশ্রমিক দেয় না। সর্বত্রই ক্ষমতাবানদের চরম স্বেচ্ছাচারিতা। নদীয়া ও যশোর জেলায় উৎকৃষ্ট নীল হোত। নদীয়া জেলায় জেমস হিলের এগারটি নীল ফ্যাক্টরী ছিল। সবচেয়ে বড় নীল ব্যবসায়ী ছিল বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানী। এই কোম্পানীর নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বারাসতে ফ্যাক্টরী ছিল। জে. পি. ওয়াইজ ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার নীলের রাজা। নীলের অন্যতম রাজা ছিল রবার্ট ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানী। এই কোম্পানীর নদীয়ার উত্তরাংশ, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি স্থানে ফ্যাক্টরী ছিল। একেকটা কোম্পানীর পাঁচটা থেকে দশটা ফ্যাক্টরী ছিল। ফ্যাক্টরীর অধীনে ছিল আরও অনেক দাদনী সংগঠন। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার ছিলেন সর্বশক্তিমান। তিনি মালিকদের পরিস্থিতি জানাতেন, উৎপাদনের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, নিতেন। গ্রামকে গ্রাম লীজ নিতেন। গ্রাম থেকে খাজনা ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের সাহায্য করত ইউরোপীয় সহযোগীরা। ম্যানেজারদের মাসিক মাহিনা চারশ টাকা ও লাভের পাঁচ শতাংশ। সহকারীরা পেত পঞ্চাশ টাকা থেকে দুশ পঞ্চাশ টাকা বেতন। সকলকেই থাকার জায়গা এবং ঘোড়ার জন্য টাকা দেওয়া হত। ভারতীয় কর্মচারীদের তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হত—শাসন, উৎপাদন এবং পুলিশ। শাসন চালাতেন দেওয়ান, মাহিনা পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা, ও টাকায় দু'পয়সা থেকে এক আনা কমিশন ছিল যত টাকা দাদনে খাটাতে পারবে তার ওপর। তাকে সাহায্য করত কেরাণী প্রভৃতি যাদের মাহিনা ছিল মাসিক পাঁচ টাকা থেকে নয় টাকা। উৎপাদনের জন্য প্রধান ভারতীয় কর্মচারীর নাম ছিল গোমস্তা। গোমস্তার মাসিক মাহিনা বার টাকা থেকে কুড়ি টাকা। তাকে সাহায্য করত ওভারসিয়ার, তার মাসিক মাহিনা তিন থেকে চার টাকা। একদিকে স্বল্প মাহিনা কিন্তু প্রচুর দায়িত্ব, অন্যদিকে ওপরওয়ালার কমিশনের লোভ নীচের কর্মচারীদের প্রলুব্ধ

১। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, প্রাগুক্ত।

করত নানাভাবে কৃষিজীবীদের উৎপীড়ন করতে। বেশী টাকা আয় করতে। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে ছিল লাঠিয়াল, এদের কাজ ছিল পুলিশের বা মিলিটারীর। শক্ত সমর্থ যোদ্ধাদের একাজে নিযুক্ত করা হত। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর ও পাবনা থেকেই অধিক লাঠিয়াল পাওয়া যেত। আরও অনেক লোকের দরকার হত। মজুর হিসাবে কন্ট্রাক্টরদের মারফৎ আদিবাসীদের নিয়ে আসা হত মানভূম, সিংভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে। স্থানীয় শ্রমজীবীদের পাম্প, বয়লার, কাটিং মেশিন প্রভৃতির জন্য দরকার হত। তাছাড়া গাড়োয়ান, নৌকা-মাঝি প্রভৃতিও নানা ধরণের কাজে লাগত। এদের অনেককেই কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা দেওয়া হত না। টাকা চাইলে প্রহার করা হত। লাঠিয়ালদের ভয়ে জুজু হয়ে থাকত সব। অনেকেই চেষ্টা করত নীল ফ্যাক্টরী এড়িয়ে চলতে। কিন্তু গোমস্তা দেওয়ানাদি নানা কলাকৌশল করে তাদের ধরে আনত। কাজ করতে না চাইলে অত্যাচার, উৎপীড়নে তাদের জীবনান্ত করত। চাষীরা তাদের জমিতে ধান উৎপাদনে উৎসাহী। কারণ, তাতে অধিক লাভ। কিন্তু নীলকরেরা—"took pride in allowing for the rotation of crops, alternating indigo with rice, tobacco and other crops. Once a peasant had grown rice on his plot he was reluctant to return the land to indigo. This usually gave rise to a controversy over whether a given plot was "indigo land" or "rice land".[১] তাছাড়া, নীল তৈরীর যে পদ্ধতি তাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরকার হত। পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক মিলত না। মজুরেরাও তাই নীলের কাজে উৎসাহ পেত না। সকলকে উৎসাহিত করার জন্য চরম অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, পীড়ণ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলল। স্বেচ্ছাচারীর দল গ্রাম্য-সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ধ্বংস করল। কারিগরদের পথে বসাল। গ্রাম ধ্বংস হল। ফলে গ্রামের বাঙালী শহরমুখী হয়ে পড়ল। বিনিময় অর্থনীতির অবসান হলে অর্থাৎ টাকার অর্থনীতির ফলে নতুন শহর ও নগরের বিকাশ ঘটে। মর্যাদা, বিদ্যা, বাণিজ্য সামাজিক ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি সব কিছু টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট হতে থাকে। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রলোভনে গ্রামের জনগণ কলকাতামুখী হয়। কলকাতারও তখন বিস্তৃতি দরকার হয়ে পড়ে। আর সে বিস্তৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানাধরনের উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৮৪০ সনে, যে বৎসর জেমস লঙ কলকাতায় এলেন সে বছর, কলকাতাকে চারটি অংশে

১। Kling B. B. op. cit.

বিভক্ত করা হয় এবং "the Government was empowered on the application of the twc-thirds of the rate payers in any division, to entrust to them the assessment, collection and management of the rates on a scheme to be approved by the Government. But self working system never worked, for not a single application was made to the Government under Act." [১] কলকাতার নাগরিক বহিরাঙ্গিক বিন্যাস আরম্ভ হয়ে যায়। তার আগে লর্ড অকল্যান্ড ফেবার হসপিটাল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পৌর স্বায়ত্বশাসন কায়েম করেন। এই ব্যবস্থার আগে রাজকীয় চার্টারের দ্বারা একজন মেয়র, ও নয়জন অল্ডারম্যান কলকাতার রাস্তাঘাট পরিস্কার, কর আদায় ও শাসন চালাতেন। তাদের সাহায্য করত ওয়েলেসলি প্রতিষ্ঠিত টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি ও লটারী কমিটি। এই লটারী কমিটির নিকট থেকে জমি কিনেই চার্চ মিশন অব ইংলন্ড-এর প্রতিষ্ঠা সে কথা মনে আছে। ইতিমধ্যে বাঙলা মানে কলকাতা বলে গৃহীত হয় এবং কলকাতার উন্নয়নে সমগ্র শক্তি ব্যয়িত হতে থাকে। কলকাতার সমুন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে সাদা-কালো, ইউরোপীয়-নেটিভ প্রভৃতি জাতি-বৈষম্যবোধ জাগ্রত হয়। শাসক-শাসিতদের মধ্যে এই যে বর্ণবৈষম্যবোধ তা থেকে শহরে ব্ল্যাক বা নেটিভ টাউন এবং হোয়াইট বা ইংলিশ টাউন গড়ে ওঠে। পরে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও আরও নানা শ্রেণীগত বিভেদ ও বৃত্তিকেন্দ্রীক অঞ্চল গড়ে ওঠে। "ঔপনিবেশিক শহরের সামাজিক গতির বিশেষত্ব কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের এই ধারার মধ্যে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।" [২] কলকাতার বাসিন্দা হিসাবে লঙ এ সব লক্ষ্য করতে থাকেন, এবং সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে প্রত্যেকটা ব্যাপার তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন।

সরকার ও প্রশাসনকে শক্ত করার ব্যাপারে সরকারী নীতির প্লাস-মাইনাসের আলোচনায় তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। তারা নানাভাবে জনগণের অভাব অভিযোগ দাবী দাওয়ার কথাও সরকারের সমীপে উপস্থিত করতে থাকে। পাদরী সাহেবেরা নিজেদের আহৃত সংবাদ ও বিবেচনা অনুসারে নানা ধরণের সংস্কার সাধনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। চিঠিপত্র লেখেন। সভা সমিতি ও সম্মেলন থেকে প্রস্তাব নিতে থাকেন। এ সব কাজে জেমস লঙ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। লঙের আসার আগেই এদেশে

সরকারী কাজে ইংরেজী চললেও আইন-আদালতে তখনও চলছে ফারসী। ফারসী জনসাধারণের কথ্য বা ব্যবহৃত ভাষা ছিল না। শিক্ষিতদের এ ভাষা যেমন শিখতে হত, তেমন শিখতে হত ইংরেজী। শিক্ষিত দেশীয় প্রধানেরা ১৮৩৫ সনেই সরকারের কাছে আবেদনে বলেছিলেন আদালতের কাজে ইংরেজী ব্যবহারের জন্য। কারণ, বিদেশী ভাষা যদি শিখতেই হয় তবে অধিক উন্নত ইংরেজীর প্রতিই তাঁদের টান। এই সময় অবধি মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিখতে উৎসাহ দেখান না। তাঁদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে হুগলীর ধনী ব্যবসায়ী হাজী মোহাম্মদ মোহাসীন তাঁর সব সম্পত্তি দান করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় হুগলী কলেজ। ১৮৩৭ সনের মধ্যে সেখানে ১১১৪ জন ছাত্র ইংরেজী বিভাগে ও মাত্র ২০৯ জন ছাত্র আরবী বিভাগে। ১৮৩৯ সনে খোলা হয় প্রাইমারী স্কুল। এ স্কুলের ইংরেজী বিভাগে ছাত্র ২৯৯ জন এবং অন্য বিভাগে ৩৫ জন।[২] দেশীয় জনগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে গেলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষার আগ্রহ কমতে থাকে।

দেশীয় ভাষা শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার ১৮৪৪ সনে যে একশ একটি ভাষাস্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেন তাতে ঠিক হয় পাটনা বিভাগে ১৭, ভাগলপুর বিভাগে ১৭, মুর্শিদাবাদে ১৭, ঢাকায় ১৫, যশোহরে ১১, কটকে ১১, এবং চট্টগ্রামে ৮টি বিদ্যালয় খোলা হবে। পরীক্ষামূলকভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের এক বৎসরের চেষ্টায় ১৮৪৫ পর্যন্ত পাটনা, ভাগলপুর ও কটক বিভাগে কিছু বিদ্যালয় খোলা গেলেও নিম্নবঙ্গে শিক্ষকের অভাবে কোন স্কুলই খোলা যায় না। সরকারী ভাষা স্কুলের চেয়ে মিশনারী স্কুলের প্রতি জনসাধারণের অধিক টান লক্ষ্য করা যায়। বহু চেষ্টা করেও ঢাকা বিভাগে ৪টি, মুর্শিদাবাদে ২টি এবং ভাগলপুরে ৫টির বেশী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ দুবছরের চেষ্টায় ১০১টি স্কুলের বদলে মাত্র ৩৪টি বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়। এই ৩৪টি বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৯৯ জন। ১৮৩৮ আরও কয়েকটি স্কুল বাড়ে, সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩টি, কিন্তু ইতিমধ্যেই ২২টিকে বন্ধ করে দিতে হয় ছাত্রাভাবে।[১]

জেমস লঙ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কোলাহলপূর্ণ মীরজাপুর অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে, মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য, এ সব লক্ষ্য করতে থাকেন। নিজেকে তৈরী করার জন্য শিখতে থাকেন হিন্দী, উর্দু, বাঙলা

১। D. P. Sinha op. cit. ২। প্রাগুক্ত।

প্রভৃতি। এ সব শেখেন শ্যামাচরণ শর্ম সরকার ও অন্যান্যদের কাছে। শ্যামাচরণ চার্চ মিশনের প্রুফও সংশোধন করতেন।[১] লঙ এদেশে আসার সময় থেকেই শ্যামাচরণের সঙ্গে লঙের পরিচয়। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও লঙকে বাঙলা ও সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লঙ এ দেশীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। ১৮৪৮ সনের মধ্যে উচ্চশ্রেণীতে বাঙলা ও সংস্কৃত পড়াবার মত যোগ্যতা অর্জন করেন এবং ১৮৪৯ সনে বাঙলা মাসিক পত্র প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

১৮৩০ সন থেকে মহা হুলুস্থুলু বাধিয়ে ১৮৩৪ সনে আর এ দেশে আর ফিরবেন না মনস্থ করে আলেকজাণ্ডার ডাফ 'হোম' গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয় ১৮৪০ সনে। ফিরেই প্রচার করলেন—"India and India Mission" এই গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত বিষয়ে নিন্দাবাদ থাকায় দেবেন্দ্রনাথ আদি দেশীয় প্রধানেরা পাদরী সাহেবদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাতে থাকেন। পাদরীরাও ডাফকে মধ্যমণি করে দেশীয় প্রধানদের মোকাবিলা করতে থাকেন। পাদরীদের সঙ্গে আদর্শ নিয়ে সংঘাত এবং সরকারী সিদ্ধান্ত ধর্মহীন শিক্ষার ফলাফল নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ-আদি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নীতিশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থাপন করলেন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। নীতিশিক্ষার ব্যাপারে পাদরীরাও উৎসাহী ছিলেন তবে উভয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল না। 'অবশ্য কমনকজে' অনেক সময় উভয়ের স্বার্থ একসঙ্গে কাজ করেছে। সারা উনিশ শতক ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ জিনিষটা চলেছে। একই সঙ্গে মন কষাকষি এবং ভালবাসাবাসির আলিঙ্গন চলেছে দেশীয়দের সঙ্গে দেশীয়দের, এবং দেশীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের।

জেমস লঙ শিক্ষক, প্রধানত শিক্ষকের কাজেই তাঁর এদেশে আসা। তবু শুধু ছাত্র পড়িয়ে, ভাষা শিখে বা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন না। নানাদিকে নিজেকে বিস্তারিত করেছিলেন। যোগাযোগ, গবেষণা, গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি রচনা, সমীক্ষা, সম্পাদনা প্রভৃতি নানাজাতীয় কর্মযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিলেন। এই সময় দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে পাদরী সাহেবদের যে ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় সেখানেও জেমস লঙ নিজেকে মিলিয়ে দিলেন। পাদরীরা দেশীয়দের বুদ্ধিদীপ্তিতে বিচলিত হলেন। পাদরী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু এ সংস্থা ধর্মান্তর অভিযানকে মন্দীভূত করতে পারে না।[২]

ধর্মদীক্ষা নিয়ে দেশীয়দের মধ্যে যে আলোড়ন চলছে তারই মধ্যে স্বধর্মত্যাগী খ্রীষ্টানদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার আইন Lex Loci পাশ হয়। এই আইনের বলে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানেরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার পেতে আরম্ভ করলে তা নিয়েও হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন। পাদরী সাহেবেরাও বসে থাকেন না। জেমস লঙ সত্যার্ণবে এই আইনের সমর্থনে লিখলেন'—"কতিপয় হিন্দু মহাশয়েরা উক্ত নিয়ম স্থাপনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে, তাহাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার হইল এবং হিন্দুধর্ম বিনাশ হইবার উপক্রম হইল। কি আশ্চর্য পর পীড়ণ দ্বারাই কি তাঁহারদের ধর্ম রক্ষা হয়?...

একজন রাক্ষস একদা রামচন্দ্রকে কহিয়াছিল,—'হে রঘুনন্দন তুমি আমাদের প্রতি অত্যাচার কর কেন? ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ করা এবং মনুষ্যলোককে নষ্ট করা আমাদের ধর্ম।' রামচন্দ্র তাহাকে উত্তর করেন—'হে রাক্ষস ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করা তোমার ধর্ম বটে, আমিও রাজা, আমারও ধর্ম যে ব্রাহ্মণ হিংসক সকলকে বধ করি।' অতএব গভর্ণর জেনারেল সাহেব পাষণ্ড পীড়নে উদ্যত হিন্দু মহাশয়দিগকে কহিতে পারেন, 'হে মহাশয়েরা ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুগণকে পৈতৃক বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করা তোমাদিগের ধর্ম বটে, কিন্তু আমারও ধর্ম এই যে পক্ষপাত বিহীন হইয়া সকল জাতীয় লোককে রক্ষা করি। কি বেদ পরায়ণ, কি বেদ নিন্দক সকল লোকই আমার প্রতিপাল্য। সকলেরি বিষয় রক্ষা করা আমার উচিত।'"[১] এইভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের জন্য ওকালতি করার ব্যাপারে জেমস লঙ হিন্দু ও ব্রাহ্ম সাধারণ ও প্রধানদের কাছে বিধর্মী পাদরী যাজক হিসাবেই গৃহীত হবেন, দূরে থেকে তাঁরা তাঁকে নমস্কার করবেন এটাই আশা করা যায়। অথচ কোন যাদুর স্পর্শে তিনি মহাত্মা, ভারতবন্ধু প্রভৃতি ভক্তিপূর্ণ সম্বোধনের দ্বারা ভূষিত হয়েছেন?

প্রসঙ্গত বেথুন সাহেবের স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক চেষ্টা সার্থক হবার পর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে রীতিমত বিতর্ক ও আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহু-বিবাহ ও কৌলীন্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই সময় আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয় ইউরোপীয় পারস্পরিক বৈষম্য অবসানকল্পে আইন সচিব হিসাবে বেথুন সাহেব যে আইনের খসড়া রচনা করেছিলেন তাতে ইংরেজরা রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তা নিয়ে ভারতীয়-ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জাত্যাভিমানের সংঘাত

১। সত্যার্ণব, ১৮৫০।

আরম্ভ হয়ে যায়। এ দেশীয়দের তরফে রামগোপাল ঘোষ জানতে চান্ এদেশে শাসক-শাসিতের শ্রেণীগত দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা যেভাবে বদ্ধপরিকর হয়েছেন তাতে কি তাঁদের স্বদেশবাসীরা গৌরববোধ করেন? [১] কালো আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫১ সনে গঠিত হয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন। এই সংস্থায় শ্বেতাঙ্গদের স্থান হয় না। দেশীয়দের আহ্বান জানানো হয় দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হতে। গঠিত হয় ভারতবর্ষীয় সভা। ধনিকশ্রেণী ভারতবর্ষীয় সভার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান না। আমরা জানি সিপাহী বা প্রথম জাতীয় বিদ্রোহের সময় জেমস লঙ এদেশে। এই বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় সরকার ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাদের সৃষ্ট জমিদারশ্রেণী। নতুন জমিদারদের স্বার্থ আর নতুন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ এক ছিল না। তবু উভয়ে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করতে থাকে।

যে বৎসর এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়, সে বৎসর জেমস লঙ উত্তর ভারতের আগ্রায়। তখন কেশবের বয়স উনিশ। উনিশ বৎসর বয়সেই কেশব ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁকে আবেষ্টন করে "ব্রাহ্মসমাজ সূর্যমণ্ডলের ন্যায় মানবচক্ষুর গোচর হলো [১]।" তিনি ১৮৭২ পর্যন্ত নবজাগরণের নায়ক।

১৮৬৪-৬৫ সনে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণ ব্রাহ্মদের বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটে। কেশব ১৮৬৫ সনে "Struggle for Religious Independence and Progress in Brahmo Samaj" বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তা বোমার মত বিস্ফোরিত হয়। গঠিত হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজ। পর বৎসর, ১৮৬৬ সনে, রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা। ব্রাহ্ম সমাজের বিভেদকালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুমেলা। এই সভা থেকে যে স্বাদেশিকতা বোধ জাগ্রত হয় তার পশ্চাতে জাতীয় বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের দান অস্বীকার করা যায় না।

নীলকরদের অত্যাচার মিশনারী পাদরীরাও সহ্য করেন না। তাঁরা নীলকরদের নিন্দা করতে থাকেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে মিশনারীদের অভিযানের কারণ—এক, নীলকরদের অমানবিক আচরণের জন্য দেশীয়সাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের অসুবিধা, এবং দুই, যে লোভ নীলকরদের অন্যায় উৎপীড়নে উৎসাহিত করছে সেই লোভকে অবিলম্বে দমন করা না গেলে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিনষ্ট করে ফেলবে। স্মরণীয়, নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পাদরীরা দেশীয় কৃষক ও জনগণের সঙ্গে থাকলেও ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে তাঁরা নীরবতা অবলম্বন

১। যোগেশচন্দ্র বাগল: উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা", রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

করেন। পাদরীদের এই নীরবতা লক্ষ্য করে "সোমপ্রকাশ" (১১ই বৈশাখ ১২৯০) লিখলেন—"সৎ ও মহৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ইংলণ্ডে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন। কথা অযথার্থ নয়। কিন্তু কথায় বলে ঢাকের কাছে টিমটিমা ইহাদের বাক্য ইংলণ্ডেও সেইরূপ...স্ত্রীলোকেরা অবধি ইলর্বাট সাহেবের বিরোধী হইয়া প্রতিবাদ করিতেছেন ..ইংরাজ জাতির নিকট ন্যায়ের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মান অধিক, অতএব ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহাদিগের বাক্য যে উপেক্ষিত হইবে তাহা হৃদয়াঙ্গম হইতেছে না। তৃতীয়, খৃীষ্টীয় মিশনারীরা যথার্থ ধার্মিক লোক। অন্যায়ের একান্ত বিরোধী। তাঁহাদিগের যত্নে নীলকরদের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল। লং সাহেব কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব হইতে যে অন্যায় হইতে চলিয়াছে, খৃীষ্ট মিশনারীরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন না ..যদি বল ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়, খৃীষ্ট মিশনারীরা ধর্ম বিষয় লইয়াই আছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে হাত দিবেন কেন? তদুত্তরে আমরা বলি নীলকরদিগের দৌরাত্ম নিবারণও রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় তাহাতে তাহারা কিরূপে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন?" এ সময় লঙ-আদি মিশনারীরা দেশীয়দের দ্বারা সমালোচিত হতে থাকেন তাঁদের ডাবল ষ্টাণ্ডার্ডের জন্য।

মনে রাখতে হবে, নীলকরদের বিরুদ্ধে "Bomwetsch was the most active. In the early 1850s the Zaminders in his mission, Balabhpur, had been selling and leasing their lands to the Ratnapur Factory. The village headman came to Bomwetsch pleading with him to lease the land himself to save from indigo cultivation. Minor landlords had asked him to save their lands and the peasants were willing to raise half the purchase price themselves. The ryots of a nearby Christian village believed Bomwetsch was especially obligated to protect them"[১] কিন্তু বোমওয়েটস তাদের জন্য কিছু করতে পারেন না। আবার নীলকরদের অত্যাচারের ব্যাপারেও নিস্পৃহ থাকেন না। তাতে নীলকরেরা নানাভাবে তাঁকে বিরত করতে থাকে। তিক্তবিরক্ত হয়ে তিনি ১৮৫৫ সনে বল্লভপুর ছেড়ে চলে আসেন। পুনরায় তাঁকে সেখানে যেতে হয় ১৮৫৯ সনে। এই সময় তাদের অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি রায়তদের হয়ে নীলকরদের মোকাবিলায় প্রস্তুত হলেন। উকিলের মতো রায়তদের উপদেশাদি দিতে থাকেন এবং "launched a campaign of letter-writing in the pro-ryot newspapers of Calcutta, the **Indian Field** and the **Hindu Patriot** condemning the indigo

১। Kling op. cit.

system and specifically the oppression of the Nischintipur concern with which he was intimately acquainted."[১] তাঁর চিঠিপত্রের অভিযোগ দেখে তাঁর ওপর নীলকরদের ক্রোধ আরো বেড়ে যায়।

১৮৫৫-৫৯ সনে বোমওয়েটস যখন বল্লভপুর ছিলেন না তখন রেভারেণ্ড জে. জি. লিঙ্কে বল্লভপুরের পরিচালক। এই সময় রত্নপুর ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। নীলকরদের লাঠিয়ালেরা সমস্ত গ্রাম তছনছ করে দেয়। গ্রামবাসী লিঙ্কের কাছে অভিযোগ করেন—"We have no rest day and night. Our Zamindar is not strong enough to protect us".[২] জে.জি. লিঙ্কে তখন কলকাতা চার্চ মিশন সোসাইটিকে গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ হ্যালিডে সাহেবের নজরে আনতে মিশনকে অনুরোধ করেন। গ্রামবাসী অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিজেরা তৈরী হয়—জমিদারদের লাঠিয়ালের ওপর ভরসা করে না। ১৮৬০ সনে তাঁরা দাদনের টাকা নিতেও অস্বীকার করে। লাঠিয়াল জবরদস্তি দাদন নেওয়াতে এলে প্রচণ্ড বাঁধার সম্মুখীন হয়। গ্রামবাসীদের একত্রিত চেষ্টায় নীলকরদের জবরদস্তি দাদনের চেষ্টা প্রতিহত হয়। এইভাবেই যে জাতীয়চেতনা উন্মেষ হতে থাকে তার পিছনে মিশনারীদের হাত থাকে। গ্রামে যখন এ ধরনের জাগরণ আসতে থাকে তখন শহরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও জাতীয়তার বিকাশ ঘটতে থাকে। দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয় ভারত-সভায়। নীলবিদ্রোহ, হিন্দুমেলা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে যে জাতীয়চেতনার উদয় হয় তারই প্রকাশ ঘটে ভারত-সভায়। আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হলে তা নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলে। আন্দোলনের পথ ধরে ১৮৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল কনফারেন্স ও ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দু'বছর বাদে লণ্ডনে লঙের মৃত্যু হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁদের অক্লান্ত দেশসেবা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হলে জাতীয়চেতনাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বেঙ্গল সেলিব্রেটিজ গ্রন্থে রামগোপাল স্যান্যাল লিখেছেন—"Education commenced in this land in the halcyon days of the immortal David Hare and the pupils of this watch-maker, notably among them, the immortal Ramgopal Ghose, and the Rev. K. M. Banerjee were the first pioneers in the field of political agitation. Then came Harishchandra Mookherjee and Kris Das Pal and a host of other men too numerous to be mentioned

---

১। Ibid. ২। Ibid.

here...Ram Gopal, Kristo Mohan, Harish and Kristo Das worked from within; but Surendranath rasied the building from without ...there is hardly a town of any note where Surendranath has not been, like the Apostles and Monks of the middle ages, to prech the lessons of political unity and of national effort for political enfranchisement"[১] আমাদের বর্তমান গ্রন্থে এতদ্দেশীয়দের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির আলোচনায় আর অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই, কারণ তা অন্য আলোচনার বিষয়।

লঙ রাজনীতির ব্যাপারে আর মুখ খুললেন না। কারণ, ইংলণ্ডের কর্তাদের নিকট থেকে এ ব্যাপারে নীরব থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। ক্লিঙ তাঁর "ব্লু-মিউটিনি" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে রাজনীতির ব্যাপারে মৌনভাব অবলম্বন করলেও সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলন থেকে লঙ দূরে সরে দাঁড়ালেন না। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের দ্বার উন্মোচন হয়। এই সংস্থার চেষ্টাতেই এদেশে সমাজ বিজ্ঞান আন্দোলন আরম্ভ হয়। ন্যাশনাল কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে যেমন জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; তেমনি বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদকে কেন্দ্র করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদেশে সমাজ অনুশীলনের কাজ শুরু হয়ে যায়। নানাধরনের সংস্থার দ্বারা যখন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক আন্দোলনাদি একে একে কদম বাড়িয়ে চলছিল তখন জেমস লঙ লণ্ডনে। লণ্ডনে বসেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সংবাদাদি রাখতেন। জাতীয় আন্দোলনের ধারার সঙ্গে "the revival of mediaevalism in Brahmo Samaj" ও থিয়োজোফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলন "was perhaps the most powerful of the forces." এই শক্তি মহা হিন্দুসমিতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। এবং তার ফলে অর্থাৎ নব্য হিন্দুধর্মের আন্দোলনের ফলে প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারের ধারা ব্যহত হয়। এই প্রবাহ পথেই জাতীয় আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। তারপর ধীরে ধীরে যখন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের বিকাশ হতে থাকে তখন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ব্যবধান বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার প্রবাহ বন্ধ করতে পারে না।

১। Ramgopal Sanyal op. cit.
২। বিনয় ঘোষ: সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে লঙ কি ভাবে বাঙালীকে এগিয়ে দিয়েছেন তা পরিস্কার করার জন্য উপরে যে সব কথা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দশক অর্থাৎ ১৮৪০-৫০ সনের কথা বলব।

১৮৪০—৫০

১৮৪০ সনে কলকাতা এসে জেমস লঙ প্রথমে হেড মাষ্টার মিঃ ম্যাকলিনসের নিকট থেকে মীরজাপুর স্কুলের দায়িত্ব বুঝে নেন। দ্বিতীয় কাজ, স্থানীয় মিশনারী পাদরীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। তৃতীয় কাজ দেশীয় ভাষা শিক্ষা। দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মালে দেশীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় মিশনারী, ইউরোপীয় ও সরকারের সম্পর্কে কি সব লেখা হচ্ছে তা ও দেশীয় সাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা সংগ্রহ করে সরকার, পাদরী ও অন্যান্যদের গোচরে আনা। চতুর্থ কাজ দেশীয় ভাষা শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত, স্ত্রীশিক্ষার জন্য এবং বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া। এবং পঞ্চম কাজ দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে থেকে তাদের উন্নতিতে সাহায্য করা।

তিন বছরের মধ্যে ১৮৪৩ সনে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির এসোসিয়েট সভ্য মনোনীত হন। এই বৎসর সোসাইটির জার্নালে "Table of Comparative Philosophy shewing specimen of the effinity of the Greek, Latin and English with Sanskrit, Persian, Russian, Celtic, Web Lithunian, German, Hebru and Anglo Saxon" নামে একটি বৈদগ্ধমণ্ডিত প্রবন্ধ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমহলে নিজের আসন পাকা করেন। এই সময় আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজে হাত দেন, এবং প্রায় পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় ১৮৪৮ সনে প্রকাশ করেন—"A Hand Book of Bengal Mission." গ্রন্থটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা পায়। নানা তথ্যের মধ্যে এখানে হিন্দু ইন্টেলেজেন্সার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের আত্মজীবনীমূলক একটি পত্র প্রকাশিত হয়। কাশীপ্রসাদ রক্ষণশীল এবং স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন।

জেমস লঙ আহৃত তথ্যাদি সরকার ও অন্যান্যদের কাজে আসে। সরকার এ ধরনের কাজ করার জন্য লঙকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। দেশীয় সমাজ জীবন ও সাহিত্য ব্যাপারে লঙের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পেলে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে জে. পি. ওয়াইজ সংগৃহীত "রাজমালা" সম্পাদনা করার দায়িত্ব দেন। ১৮৫০ সনে সোসাইটির জার্নালে "Analysis of the Bengali poem 'Rajmala' or the Chronicle etc." প্রকাশ করেন। পরে

এটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ঢাকার ঈশান প্রেস থেকে। সম্প্রতি গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে "Rajmala or an Analysis of the Chronicles of the kings of Tripura" এই নামে। নতুন সংস্করণটিকে পরিমার্জিত করেছেন শিবদাস চৌধুরী।

এই সময় থেকেই লঙ বাঙলা প্রবাদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। প্রবাদ সংগ্রহের দিকে লঙের ঝোঁক ছিল ছাত্র বয়স থেকেই। আঠারর তিরিশে তিনি যখন রাশিয়া তখন অধ্যাপক স্নীগরীফ রাশিয়ান একাডেমী থেকে ২৫,০০০ প্রবাদের যে সংগ্রহ প্রকাশ করেন তা লঙকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরে তিনি যখন রাশিয়া যান তখন চার খণ্ডে প্রকাশিত এই সংকলনটি সংগ্রহ করে আনেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"I brought with me from Moscow 25000 Russian proverbs, published by Russian Academy...Professor Snigrief, published in 1834, in Moscow, a work in four volumes on Russian Proverbs which is a model of what classification should be." [১] পরবর্তীকালে ওরিয়েন্টাল প্রোভার্বস" প্রকাশ করার সময় তিনি একথা লিখেছিলেন। প্রবাদ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবন: যখন এদেশে আসেন তখন তিনি অবিবাহিত। বছর তিনেকের মধ্যে ২৯ বৎসরের যুবক ২৭ বছরের এমিলি ওরমেকে বিবাহ করেন। অপরিণত বয়সে এমিলি মারা যান ১৮৪৭ সনে যখন তিনি ত্রিশ বৎসরও অতিক্রম করেন নি। কলকাতা থেকে লণ্ডন যাবার সময় সমুদ্রপথে কোন বিপর্যয় ঘটেনি, প্রত্যাবর্তনের সময় সামুদ্রিক রোগে আক্রান্ত হন এমিলি। জাহাজের ডাক্তারের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না, কিন্তু মহাকালের বিধান খণ্ডাতে পারেন না।

ফার্লো হয়ে লণ্ডন যাবার সময় বিদায় অভিনন্দন জানাতে বহু ছাত্র ও সুহৃদ জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্ররা লঙকে কারুকার্যময় একটি রৌপ্য দোয়াত উপহার দিয়েছিলেন স্মারক চিহ্ন হিসাবে।[২] পরম আহ্লাদের সঙ্গে তিনি তা গ্রহণ করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন লণ্ডন।

বিপত্নীক লঙ ফিরে এলেন কলকাতায়। প্রিয় বিরহে মনটা ভারী, তখন তিনি ৩০।৩২ বছরের যুবক। শুভার্থীরা পুনরায় বিয়ে করতে বললেন। কারণ, বিদেশে কাজ করতে গেলে বিশ্বস্ত সঙ্গী চাই-ই। পত্নীশোক ভোলার জন্য তিনি কাজ আরও কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

কাজের ধারাও পাল্টালেন। দেশীয় সাধারণ, দেশীয় পাঠশালা, দেশীয় ভাষার প্রসার প্রভৃতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এত কাজের মধ্যেও মনের ইচ্ছাটি চেপে রাখতে পারেন :না, প্রিয়জন বিরহ ভিতরে ভিতরে তাঁকে দগ্ধ করতে থাকে। এই সময় থেকে তাঁর কাজের গতি দেশীয় সমাজমুখী হলেও স্বদেশীয়দের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের চিন্তা থেকেও দূরে সরে যান না। তবে পূর্বে স্বদেশীয় প্রীতির যে বাহুল্য ছিল তা কিছুটা হ্রাস পায়। এ সময় থেকে তিনি ভাল ও সৎ ইংরেজ এবং অত্যাচারী ও টাকাসর্বস্ব বণিক ইংরেজদের আলাদা করে দেখতে আরম্ভ করেন। ক্রমেই ঝুঁকে পড়তে থাকেন দেশীয় জনগণের দিকে। দেশীয় খ্রীষ্টানদের সেবায়।

তার আগে কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা লঙকে কিছুটা বিচলিত করে। লঙের ছাত্র ভবানী রায়চৌধুরীর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে আলোড়ন ওঠে। তাছাড়া লঙের ছাত্রেরা আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা তুলে যে ১১০ টাকা প্রেরণ করেন, তা নিয়েও হৈ চৈ হয়। স্মরণে আছে, ১৮৪০ সন থেকে এক ধরনের গাছের মড়কে পর পর কয়েক বৎসর আলুর চাষ না হলে চল্লিশের দশকে আয়ারল্যাণ্ডে যে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় তাতে প্রায় পনের লক্ষ লোক মারা যায়। দুর্গত ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আয়ারল্যাণ্ডবাসীকে সাহায্য করার জন্য মীরজাপুর স্কুল ও অন্য দুটি মিশন স্কুলের ছাত্রেরা যে সামান্য টাকা চাঁদা তুলে ত্রাণকার্যে পাঠিয়েছিল তাতে হয়তো লঙের প্রভাব ও প্রেরণা ছিল। লঙের এই মানবিক কাজ সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত না হয়ে কিছু ব্যক্তি অন্যভাবে এ ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করতে থাকেন। লঙ এদেশে ফিরে এসেই বুঝতে পারেন হাওয়া বিপরীত দিকে বইতে শুরু করেছে। কিন্তু দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের সেবার কাজে তিনি নিজেকে এমনভাবে মিলিয়ে দিলেন যাতে পত্নীশোক থেকে সমালোচনা বা অসামাজিক আচরণাদিকে আমল দিলেন না।

ইতিমধ্যে ১৮৪৯ সনে চার্চ অব ইংলণ্ড লঙেরই উৎসাহে বাঙলা মুখপাত্র বের করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্পাদকীয় দায়িত্ব বর্তায় লঙের ওপর, যদিও প্রধান সম্পাদক হিসাবে নামে ছাপা হয় মিশনের স্থানীয় সম্পাদকের। ১৮৫০ সনের মধ্যে এতসব বিবিধ কাজের চাপ আসে যে তখন জনৈকা সহচরীর অভাব বেশী করে

অনুভব করতে থাকেন। এই সময় তিনি ক্রীশ্চিয়ানা হিল নাম্নী জনৈকা মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন। শুভদিনে উভয়ে পরিণয়াবদ্ধও হন। বিয়ের কিছুদিন পর তিনি বাসস্থানও পরিবর্তন করেন। কোলাহলপূর্ণ মীরজাপুর অঞ্চল ছেড়ে চলে আসেন ঠাকুরপুকুরের নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে। ইতিমধ্যে তাঁর বাসস্থান নির্মিত হয়েগেছে এবং চার্চকেও সংস্কার করা হয়েগেছে।

লঙের সহধর্মিণী ক্রীশ্চিয়ানা ভারতীয় মহিলাদের ন্যায়ই নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীর সেবায়। ছায়ায় মত স্বামীর সমস্ত কাজের সঙ্গিনী ছিলেন তিনি। নীলদর্পণের মামলায় স্বামীর সঙ্গে জেলেও কাটিয়েছেন।[১] ১৮৬২ সনে লঙ যখন বিলাত যান তখন মিসেস লঙও গেলেন। ১৮৬৫ সনে ফিরে আসেন। আবার উভয়ে লণ্ডন যাত্রা করেন ১৮৬৭ সনে। এবার যাবার সময় মিসেস লঙ সমুদ্ররোগে আক্রান্তা হয়ে পরলোকগমন করেন।

সবই ভবিতব্য। লঙ দু'দুবার বিয়ে করেন,।[২] দু'দুবারই স্ত্রী হারান সমুদ্র-পথে। সুকুমার সেন লিখেছেন—"নিপীড়িত নীলকর প্রজাদের পক্ষ সমর্থনেই নয় আরও অনেক অনেক দিকে হৃদয়বৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির পাকে লঙের মনীষার প্রকাশ ঘটেছিল।...লঙের জীবনে বৈচিত্র্য ছিল। কিছু অদ্ভুতত্ব ছিল। তাঁর দুই বিবাহ, কিন্তু দুই পত্নীরই মৃত্যু ঘটে জাহাজে বিলেত থেকে যাবার আসবার পথে।"[৩]

পাদরী হলেও লঙ পত্নীবিয়োগে বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের জন্ম-মৃত্যুর উপর কারোর হাত নেই। তাঁর মধ্যে স্নেহ ছিল, করুণা ছিল ও মানবিকতা-বোধ ব্যাপক ছিল। সেই স্নেহ, করুণা ও মানবিকতাবোধকে তিনি কাজে লাগালেন ঈশ্বরের সন্তানদের সেবায়। অন্ধকারের মানুষদের আলোতে নিয়ে আসার সাধনায়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাধকের ন্যায় নিজ অভিলষিত কর্মকৃত্যাদি প্রতিপালন করতে মগ্ন হয়ে পড়েন। এই কাজের একাকীত্ব দূর করার জন্য পুনরায় বিবাহ করেন। মানসিক যন্ত্রণা ও অশান্তি থেকে সাময়িক মুক্তি পান। দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুতে যথেষ্ট আঘাত পান, কিন্তু বিষাদযুক্ত হয়ে বসে থাকেন না। কাজে গাফিলতি করেন না।

ইতিমধ্যে পাদরীদের আগ্রাসন অনেকটাই বন্ধ হয়। বিদ্যাসাগর, কেশবাদি

প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সমাজ-বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে লঙ সমাজ আন্দোলন ও সমাজ-জীবন অনুশীলনের নতুন অধ্যায় সূচিত করতে থাকেন। ভারতবর্ষে সমাজ-বিজ্ঞান আন্দোলনের তিনিই অথবা বাঙলাই পথিকৃৎ। এ কথাটা স্বীকার করার মত লোকের আজ বড়ই অভাব। অবাঙালীরাতো বটেই বাঙালী সমাজ বিজ্ঞানীরাও বোম্বাই বা দিল্লীর নেতৃত্ব-মান্য করতে এক চক্ষুহরিণ। অথচ বাঙলাদেশ থেকেই সমাজ বিজ্ঞান চর্চা, অনুশীলন ও অধ্যয়নাদির শুরু হয় শতাধিক বৎসর পূর্বে। তার অনেক পরে বোম্বাই এবং বোম্বাইরও অনেক পরে দিল্লী সরকার ও আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সমাজ বিজ্ঞানের পীর হয়ে বসেছেন। অবশ্য সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, অনুশীলন বা অ্যাকাডেমিক চর্চায় লঙ বা বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পর্ষদের দান উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ, তখনও সমাজ বিজ্ঞান এদেশের বিদ্যাজগতের আওতায় আসে নি. প্রস্তুতি-পর্বের কাজ হিসাবে তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য, একথাটা মানতেই হবে।

মীরজাপুর স্কুল ঃ ১৮৫০ সনে ঠাকুরপুকুরের দায়িত্ব গ্রহণ করায় জেমস লঙ মীরজাপুর স্কুলের সীমাবদ্ধ দায়িত্বভার নিজের ওপর রাখেন। এর পিছনে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু, ভবানী রায়চৌধুরীর খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষা এবং আয়ারল্যান্ডের জন্য ত্রাণকার্যে অর্থ সাহায্যের ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। তা হচ্ছে মিশনের সভ্যদের সঙ্গে মতবিরোধ। ১৮৩৬ সনে পাদরী কৃষ্ণমোহনের পদত্যাগের সময় থেকেই মিশনের সভ্যদের মধ্যে মিশনের কাজ পরিচালনা ও বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে যে মতবিরোধ চলছিল জেমস লঙ এসে তার কিছুটা সমাধান করলেও স্বার্থান্ধশ্রেণীর সকলকে শান্ত করতে পারেন না। লঙ অনেকটা আপোষরফা করে এগুচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে চলে যেতেন। কখনো লণ্ডনেও চলে যেতেন। যখন তিনি কেন্দ্রে থাকতেন না তখন তাঁর অবর্তমানে অসন্তুষ্ট সভ্যেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। মিশনের কিছু সভ্য সরাসরি দীক্ষাদানে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁরা শিক্ষার প্রসারের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে পশ্চিমী হাওয়া বওয়াতে উৎসাহী ছিলেন। অনেকেই খ্রীষ্টিয় শিক্ষা প্রসারের দিকে আগ্রহী ছিলেন। লঙ দুটো ব্যাপারকে আলাদা করে দেখতে চাইলেন। তিনি বললেন—শিক্ষাদানের সময় ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন ছাত্রদের পরিচিত করাতে হবে তেমনি এতদ্দেশীয় জ্ঞানাদিকেও তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে দিতে হবে। যারা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাবে তাদের সরাসরি দীক্ষা দিতে হবে। তিনি একাজে শহরের চেয়ে গ্রামের

ওপর বেশী নজর দিতে উৎসাহী ছিলেন। সভ্যেরা চাইলেন শহরের লোকদের খ্রীষ্টান শিক্ষার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে। সরাসরি দীক্ষা দেবার ব্যাপারেও তাঁরা মন্থর গতিতে চলতে চাইলেন।

এদেশে আসার কিছুদিনের মধ্যেই লঙ বাঙলাভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। তিনি হ্যালহেডের "A Grammar of the Bengali Language" পড়েছিলেন। এর ভূমিকায় লেখক লিখেছিলেন—"বাংলা ভাষার শব্দ গৌরব অসীম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি যে কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে যত্নশীল নন।" হ্যালহেডের এ মন্তব্যে জেমস লঙ উৎসাহিত হন। তিনি বাঙলা ভাষা শেখার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। অল্পদিনের মধ্যেই এ ভাষা প্রায় বাঙালীদের মত আয়ত্ব করতে পারেন। জনৈক বিদ্বান লিখেছেন, "বস্তুতঃ পলাশি যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা ভাষা শিখেছিল। তাদের মধ্যে ক্যাসিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব একজন। এই ওয়াটস সাহেবের বাংলা ভাষাজ্ঞান দেখেই ক্লাইভ কোম্পানির সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম বিলাতের কোর্ট অভ্ ডিরেকটরদের কাছে ১৭৫৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রের দ্বিতীয় প্যারায় তিনি লেখেন— 'ওয়াটস সাহেব আমার সঙ্গে আছেন বলে, আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করছি। তিনি বহুদিন এদেশে বাস করছেন। বাঙালীর রীতিপ্রকৃতি ও ভাষাজ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট। কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারীগণের এরূপ এদেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন। একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য।"* এই প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্য ওয়ারেণ হেস্টিংস কোম্পানীর সিভিলিয়ানদের বাঙলা শেখাবার জন্য যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মারফৎ তা ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি।

১৮৪০ থেকে ১৮৬০-৬১ প্রায় বিশ বছর মীরজাপুর স্কুলের সঙ্গে লঙের সম্পর্ক। নতুন যৌবন ও উদ্যম নিয়ে কাজ করতে এসে মীরজাপুর স্কুলে তিনি যে নতুন বাতাস আমদানী করতে চাইলেন তাতে পুরাতন বাতাস জীইয়ে রাখার প্রতিনিধিরা যে অস্থির হয়ে পড়লেন তাও আগে বলেছি। অনেক চেষ্টা করেও অগ্রজ পাদরীরা অধিকসংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট করতে পারছিলেন না, অথচ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বেড়ে চলেছে। তিনি নতুন উপায়ে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং দেশীয় লোকদের খ্রীষ্টান করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। ছাত্রদের তিনি শুধু পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে বন্দী রাখলেন না।

যার যে দিকে উৎসাহ তিনি সেদিকে তার উৎসাহ বাড়াবার ব্যাপারে সাহায্য করতে থাকেন। সংগ্রহশালা দেখার জন্য ও বিভিন্ন জায়গা ঘোরার পরামর্শ দিতে থাকেন। উৎসাহ দিতে থাকেন ছাত্রদের ডিবেট, এক্সকারসন, প্রবন্ধাদি প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে অংশ নিতে। তিনি লিখেছেন—"almost every Saturday I am asked by my boys for notes of admission to the Asiatic Society's Museum, and on Monday I converse with them on what they have seen."[১] প্রতিভা ও মনীষাদ্দীপ্ত লঙ একটি নির্দিষ্ট আদর্শ সামনে রেখে কাজ করে গেছেন। তিনি বলতেন—"Next to implanting Christian principles, is to excite a taste for reading and to cherish curiosity, that great stimulator to all knowledge"[২] একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার দিকে ছাত্রদের উৎসাহ বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন তেমনি অভিভাবকদের মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচীরও পরিবর্তন করেন। পিতার স্নেহ নিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রদের অভিযোগাদি শুনতেন এবং সকলের অসুবিধা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁদের নানান কথা শুনতেন। নীতিশিক্ষা এবং মরাল তৈরীর দিকে জোর দিতেন। শৃঙ্খলা এবং রুটিনমাফিক কাজ করার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। এর ফলে তাঁর স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৪০ সনে তিনি যখন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেন তখন মোট ছাত্র ১৫০ জন, তিন বৎসরের মধ্যে, ১৮৪৩ সনে, সেই ছাত্র সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২৩০ জনে।[৩] অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি দেশীয় জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। তারা বলতে আরম্ভ করে—লঙ সাহেবের স্কুলে প্রকৃত শিক্ষা হয়।

তিনি মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করলেন। বৃত্তি নির্দিষ্ট হত মাসিক পরীক্ষার ফলাফল দেখে। তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির দোষত্রুটী সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর মতে—"All our system of school instruction must be so planned as to be completed by the time the boys arrive at the age of 16 or 17 as there is a little hope of their continuing at school beyond that period" সে সময় শিক্ষার ব্যাপারে বয়সের কোন কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু আমাদের মত গরীবদেশে অধিক বয়স অবধি ছেলেদের স্কুলে রাখা সম্ভব হয় না। কারণ, দুঃস্থ মানুষ

একদিকে পড়াশুনোর জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে না, অন্যদিকে উপার্জনক্ষম হবার পরেও স্কুলে আটকে থাকলে চলে না। উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়ই।

লঙের পরিচালনায় স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হলেও খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষার কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগোয় না। ডাফের স্কটিশ মিশন ও অন্যান্য মিশন যখন পূরোদমে দীক্ষা দিয়ে চলছে তখন ১৮২২ থেকে ১৮40 এর মধ্যে চার্চ মিশনে শহরের মাত্র মাত্র দুটি ছাত্রকে দীক্ষা দিতে পারে এ কথা জানিয়েছেন অমর দত্ত। যদিও প্রথমে তাদের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোতে থাকে। লঙ কলকাতার মিশনের দীক্ষা সংক্রান্ত কাজের শ্লথগতিতে বিরক্ত ছিলেন।* খ্রীষ্টান শিক্ষকদের অভাব এর অন্যতম একটা কারণ বলে তাঁর মনে হলো। এই অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি প্রিয় খ্রীষ্টান ছাত্রদের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করতে থাকেন। নতুন কায়দায় দেশীয় ছাত্রদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেন। তাতে একদিকে লাভ হলেও অন্যদিকে অসুবিধা দেখা দিল। ঘরের লোকেরা বিগড়ে গেল। ঘর সামলাতে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়।

সরকার শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে উৎসাহী। মিশনারী পাদরীরা তাঁদের স্কুলে ধর্মশিক্ষা থেকে বিরত হন না। তাঁরা সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন—"the desire for English education, and the supply of it which was created by the demand. It is of great importance to bear in mind that while the supply has greatly increased the demand, the demand again, in point of fact, preceded and gave occasion to the supply. The earliest promoters of English education were intelligent natives. In the face of great difficulties they made a creditable beginning. At a later period Government came to their aid. Neither the native pioneers nor the Government seem to have apprehended what was the legitimate and, unless counteracted, the inevitable effect of such education on the Hindu mind and the Hindu faith. European literature and philosophy and history cannot share with Hinduism a lodgment in the same mind. The one must, of necessity, destroy the other. Had the intelligent natives and the government apprehended this, it is not to be believed that they would have made religious neutrality a basis of their educational system....

The means actually employed for the counteraction of

* অমর দত্ত, পাদরি লঙ, প্রাগুক্ত।

this evil was the susception of English education by the missionary bodies, on no terms of neutrality, but with avowed intention of employing education as a means for the subversion of Hinduism and the inculcation of Christianty. [১] এই আন্দোলনের নেতা স্কটল্যান্ড চার্চ প্রেরিত প্রথম পাদরী ডঃ আলেকজান্ডার ডাফ। তিনি ওরিয়েন্টালিস্টদলের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে জেনারেল এসেমব্লি ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং চাইলেন দেশীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে শিক্ষার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে। মিশনারীদের বললেন—খৃষ্টের বাণী প্রচারের জন্য আরও তৎপর হতে। তিনি বললেন—"it was through the disscemination of Christanity that the moral and intellectual improvement of India could:be effected". জেমস লঙও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি ১৮৪০ সনে তাঁর স্কুলের প্রথম শ্রেণীর (বর্তমান দশম শ্রেণীর) যে পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করেছিলেন তাতে দেখি—(১) Greek History ...Life of Alexander (২) Roman History ...The first four Emperors, (৩) English History ... George,1 (৪) English Prose Johnson's Rasselas. Chap xxx, (৫) English Poetry ... Paradise Lost bk III, & Thompson's Seasons, Summer, (6) Geomətry... Euclid, bks. i, ii, iii, iv & vi (৭) Algebra...Adfected Quadratics, (৮) Arithmetic...Extraction of Cube Root. (৯) Hydrostatistic (১০) New Testaments...Acts of Apostles, (১১) Evidences of Christianty... By Bishop Porteus এবং (১২) Bengali...Tutsut [২]।

জেমস লঙ আসার দু'বছরের মধ্যে মারা যান ডেভিড হেয়ার। ১৮৪২ সনে তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবার নতুন করে দেশীয় শিক্ষার, স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ জাগতে থাকে। ১৮৪৫ সনে হেয়ারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে হেয়ার প্রাইজ ফান্ড গঠিত হয়। জেমস লঙ এই তহবিলে ১০ টাকা চাঁদা দেন। ফান্ডের টাকা দিয়ে শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে চার্চ অব ইংলন্ড লিখেছিল: "ধর্ম বিষয়ে হিয়ার সাহেবের সদাভিপ্রায় ছিল না এবং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও মরণান্তর পুনর্জন্ম এই দুই বিষয়ে তিনি সন্দেহ করিতেন, এবং খৃষ্টিয়ান ধর্ম কিছুই জানিতেন না।" "বেঙ্গল স্পেক্টেটরে" প্রকাশিত জুলাই ১৮৪২ সনের একটি পত্রে "চার্চ অব ইংলন্ড" ও "ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া" পত্রের হেয়ার

সমালোচনাকে নিন্দা করা হয়েছে। চার্চ মিশন হেয়ার সাহেবকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু তার একজন পাদরী হেয়ার ফাণ্ডে টাকা দিতে পারেন। কারণ, চার্চ মিশনের অন্যান্যরা যে ভাবে হেয়ারকে সমালোচনা করতেন লঙ বোধহয় সেভাবে হেয়ারকে নিন্দা করতেন না। তাই হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডে লঙ চাঁদা দিতে পেরেছিলেন। যদিও তিনি হেয়ারের গুণমুগ্ধ ছিলেন তবু তিনি তাঁর খ্রীষ্টিয়ান নীতিহীনতাকে পছন্দ করতেন না, একথা প্রকাশ্যেই বলতেন।

শুধু বিশুষ্ক জ্ঞানবাদের দ্বারা নয়, মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার জন্য জেমস লঙ বাঙালী সমাজে অনন্যসাধারণ মর্যাদা যেমন পেয়েছেন তেমন বেশ কিছু স্বদেশীয় ও এদেশীদের দ্বারা নিন্দিতও হয়েছেন। সমাজ ও জীবনের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর সমাজবোধ তাঁর চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করত। লঙ যে কারণে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন ঠিক সেই কারণে না হলেও অন্য কারণে দেশীয় প্রধানেরাও শিক্ষা-সংস্কারে এগিয়ে আসেন। কারণ, "The present system of education makes copyists and moderators" [১] এই সময় একদিকে প্রাচীনকে সংস্কার এবং রামমোহনীয় জ্ঞানবাদের দ্বারা অতীত ঐতিহ্যের মূল্যমান পরিবর্তনের চেষ্টা, অপরদিকে ইংরেজী শিক্ষার দরুণ ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আমদানীর জন্য যে পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শ বাঙলা ও বাঙালীকে আলোড়িত করে চলছিল তার মধ্য থেকে সংস্কারমুক্ত মন মানবপ্রেম ও যুক্তিবাদকে অবলম্বন করে ঈশ্বরচন্দ্র আর্বিভূত হলেন। জড়তাগ্রস্ত বাঙালীর চিত্তে উজ্জ্বল সূর্যকরের মত তীব্র বুদ্ধিবাদ জাগ্রত করার চেষ্টা করতে লাগলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এসে গেলেন রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রাধাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, আনন্দমোহন বসু ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বসু, কেশবচন্দ্র সেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, লালবিহারী দে, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রামকমল ভট্টাচার্য, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ শর্মসরকার, হরিশ মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। জেমস লঙের সঙ্গে এঁদের সকলেরই যোগাযোগ। দেশীয় প্রধান ও সাধারণদের

সঙ্গে আত্মীয়তা থেকে তিনি বাঙালী জীবন ও সমাজে অণুকরণীয় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

লঙ অলস মস্তিষ্ক চর্চাকে পছন্দ করতেন না বলে কোন উগ্র চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি এমন শিক্ষা প্রচারের পক্ষে ছিলেন যার দ্বারা বাঙালী বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। ছাত্র শুধু পাঠ করে যাবে, বিচার করবে না, বিতর্ক করবে না, এমন শিক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না। শিক্ষা ব্যাপারে তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তার মিল দেখতে পাই। ঈশ্বরচন্দ্রকে "আমরা দয়ার সাগর, বাঙলাগদ্যের জনক, স্ত্রীশিক্ষার প্রচারক, বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক, প্রভৃতি সদগুণে গুণবান ও বিপ্লবী মনোভাবের পুরোধা বলেই জানি।... কিন্তু তারও চেয়ে বড় সত্য সূর্য—দিব্য জ্যোতির্ময় বহ্নিবলয়; অগ্নি-জ্বালই তাকে সৌরমণ্ডলের অধিপতি করেছে তেজের প্রাণবীজরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেইরকম বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমী, 'হিউম্যানিস্ট'—যাই হোক না কেন, আসলে তিনি প্রেম ও মননের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ ব্যাকুল।.. সেই মানব-ধর্ম ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকট হয়ে পড়ল। মধুসূদন সেই নূতন মন্ত্র ঘোষণা করলেন। যাকে ফরাসী ভাষায় Eclaircissement অর্থাৎ নবজাগরণের যুগ বলা হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙলাদেশে সেই প্রভাস্বর প্রজ্ঞার যুগ (The Age of Illumination) সৃষ্টি করেছে। তাই নবযুগপ্রেরণা শিক্ষিত বাঙালীর মন ও প্রাণের ধাতু-ধর্মকে বিচলিত করল, রাজসিক উল্লাসে ব্যাকুল করে তুলল। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে চলছিল তার প্রস্তুতি।"[১] প্রস্তুতি পর্বে অন্তত এক দশক জেমস লঙ বাঙালীকে সাহস উদ্যম ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। প্রস্তুতি অন্তে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরও বিশ-বাইশ বছর সারা দেশ যখন সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের আন্দোলনে উচ্চকিত তখন তিনি দেশীয় প্রধান ও সাধারণদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যে সব কাজ করে গেছেন তাতে নব জীবনোল্লাসের প্রবল আলোড়ন আসে।

ঠাকুরপুকুর চার্চ ও বাঙলা পাঠশালা: পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঠাকুরপুকুরের প্রাথমিক চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন রেভারেণ্ড হেবলিন। জেমস লঙ এই চার্চের দায়িত্ব নেবার পর চার্চকে নতুনরূপে ঢেলে সাজালেন। জেমস লঙের আমলে চার্চ ও বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেড়ে যায় যে, যে কোন উল্লেখযোগ্য বিদেশী ব্যক্তি কলকাতা এলে ঠাকুরপুকুরেও একবার আসতেন। ১৮৫৫ সনে খৃষ্টিয়ান

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ প্রাগুক্ত।

ইণ্টালিজেন্সারে রেভারেণ্ড ডবল্. ডবল্. ফেল্পস্ ও ক্যাপ্টেন স্কটের বক্তৃতায় ঠাকুরপুকুরের কাজের বিশেষ প্রশংসা করা হয়। ১৮৩৭ সনে স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যক্তিগত দানে ঠাকুরপুকুরে যে চ্যাপেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৮৪৯ সনে তার সংস্কার সাধিত হয় লঙের দ্বারা। লঙের হাতে বেড়ে ওঠা এ চার্চটির প্রতি লঙের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ১৮৬১ সনের পর লঙের সঙ্গে ঠাকুরপুকুর চার্চ অব দি এপিফানির সদস্যদের মন কষাকষি আরম্ভ হয়ে যায়। যাঁরা লঙকে মিশনারী কাজ থেকে বহিস্কারের চেষ্টায় ছিলেন তাঁদের দলে ঠাকুরপুকুর মণ্ডলীর বেশ কিছু সদস্যও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু লঙের জনপ্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মচাঞ্চল্য এবং যোগাযোগের সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠছিলেন না। ১৮৬৫ সনে বিলাত থেকে লঙ যখন ঠাকুরপুকুর এলেন তখন সেখানে একটা থমথমে ভাব। তা উপেক্ষা করে ১৮৭২ সন অবধি প্রবল প্রতাপ নিয়েই তিনি সেখানে ছিলেন। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর বিরোধীরা সুযোগ নিতে থাকেন। ঠাকুরপুকুর চার্চের কার্যালয় থেকে লঙের নাম মুছে ফেলার সার্বিক চেষ্টা হয়। এই চার্চে লঙের প্রায় কোন চিহ্নই আর এখন পাওয়া যায় না। তবে এখানে একটি Baptismal Register আছে, সেখানে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭ এবং ১৯শে জানুয়ারী ১৮৬৮ দুজন লোককে দীক্ষা দেবার ব্যাপারে লঙের সই দেখতে পাই। অর্থাৎ ১৮৪৪ সন থেকে ১৮৭২ সন অবধি লঙ যে চার্চের প্রাণপুরুষ সেই চার্চের প্রধান পুরোহিত হিসাবে লঙের স্বাক্ষরযুক্ত খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষাপ্রাপ্ত দুজন মাত্র লোকের নাম দেখি। এ সময়ের মধ্যে কয়েক'শ ব্যক্তি দীক্ষা নিয়েছেন। রেজিষ্টারে প্রধান পুরোহিতদের স্বাক্ষর আবশ্যক। অধিকাংশ স্বাক্ষর দেখি M. S. Seal-এর। ঠাকুরপুকুর চার্চের সংগ্রাহক দাবী করেন এই রেজিষ্টারটি লঙের আমলের। আসলে এটি যে লঙের আমলেরই তারও কোন প্রমাণ নেই। যদি রেজিষ্টারটি লঙের আমলের হয় তবে কি লঙের সময় থেকেই প্রধান পুরোহিত অন্য ব্যক্তি? যে চার্চ "লঙ সাহেবের গীর্জা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং যেখানে লঙ এক নাগাড়ে অন্তত বাইশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেখান থেকে লঙের নাম খারিজ করার বা মুছে ফেলার চেষ্টা হয় নীলদর্পণ মামলার পর, ১৮৬২ সন থেকে। এর পিছনে এক ধরণের চক্রান্ত ও চরিত্র-হননের ব্যাপার স্পষ্ট। জেমস লঙ চলে যাবার পর ১৮৭২ সনে, ঠাকুরপুকুর চার্চে যখন নতুন একটা বিল্ডিং তৈরী করা হয় সেই বিল্ডিংকে সাক্ষী রেখে কোন কোন ব্যক্তি ঠাকুরপুকুর চার্চ

প্রতিষ্ঠার তারিখ হিসাবেও ১৮৭২ সনকে উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ১৮৭২ সনে চার্চের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করা গেলে লঙকে খারিজ করা সহজ। ঠাকুরপুকুর চার্চ থেকে ১৯৭৮ সনের বড়দিন উপলক্ষে যে স্মারক পুস্তিকা বের হয়েছে তাতে দেখি ঠাকুরপুকুরের পঞ্চাশ জন গ্রামবাসীর স্বাক্ষর সমন্বিত একটি পত্র। এই পত্রে তারা লঙকে জানিয়েছে—"We your unworthy servants are establishing a fund, and to perpetuate your name have given it the name of "The Long Pastorat Fund".. এই টাকা দিয়ে কি করা হয়েছে তার নাকি কোন হদিস এখন অবধি পাওয়া যায় নি।

লঙের পাঠশালাটিরও কোন অস্তিত্ব নেই। এই পাঠশালা উঠে গেলে তার সঙ্গে আরেকটি পাঠশালাকে যুক্ত করে যে সাধ্বী এলিজাবেথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নতুন সৃষ্টি। স্মরণে আছে, লঙ শ্রীরামপুর ত্রয়ীর (Trio of Serampore)—কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের—অনুরক্ত ছিলেন। কেরী সাত বছরের চেষ্টায় প্রথম যাকে দীক্ষা দিতে পারেন তার নাম ছিল কৃষ্ণদাস পাল। ফেলিক্স কেরী ও কৃষ্ণদাস পালকে একই দিনে দীক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দীক্ষিত ব্যক্তিটি ছিল একজন মুসলমান এবং তৃতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। ১৮১০ সনের মধ্যে এই মিশন প্রায় ৩০০ ব্যক্তিকে দীক্ষা দেয়। দীক্ষা ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চলে শিক্ষা প্রসারের কাজ। ১৮১৮ সনের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের অধীনে ১২৬টি ভাষা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যেখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০ হাজার। ১৮২১ সনে ৩৭ জন ছাত্র নিয়ে কেরী শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ৩৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১৯ জন দেশীয় খ্রীষ্টানও ১৮ জন হিন্দু। তার আগে ১৮০৭ সনে কেরীর প্রথম স্ত্রী দীর্ঘদিন মানসিক রোগভোগ করে মারা গেলে ঐ বৎসরই লেডী রুমর (পরবর্তী নাম শার্লট এমিলিয়া কেরী) নাম্নী জনৈকা জার্মান মহিলাকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী ১৩ বছর বেঁচেছিলেন।

লঙ বহু লোককে দীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কাকে তিনি প্রথম দীক্ষা দেন সে তথ্য এখনও জানতে পারি নি। কেরীর মতোই তিনি একদিকে ধর্মীয় কাজ অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেরীর মতোই তিনি দু'দুবার বিয়ে করেছিলেন এবং উভয়ের স্ত্রীরা উভয়ের চেয়ে অনেক আগে মারা যাওয়ায় উভয়কেই অনেকদিন বিপত্নীক থাকতে হয়েছিল।

১৭৯৬ সনে জর্জ হ্যামিলটন বিদেশে খ্রীষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বললেন—"Men must be polished and refined before they can be enlightened in religious truth" এই উদ্দেশ্যে দেশে-দেশে খ্রীষ্টান

মিশন প্রতিষ্ঠিত হতেআরম্ভ করে। ১৮২৪ সনে মিশনারীরা Moderates এবং Evengelicals এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং ১৮৪৩ সনে তা দানা বাঁধে। এই বিভাগ মিশনারী পাদরীদের কৃত্য বা দীক্ষা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। "The distinctive policy of the Mission was settled in accordance with traditional character of the Scottish nation : it was to be Educational."[১] এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা দেশে যে নানাধরণের পাদরী বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ডাফ যে প্রবল বিরোধিতার মধ্যে জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিশন গঠন করেছিলেন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জে. এন. ওগিলভাইর মতে ডাফের এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন পাশ্চাত্য-শিক্ষাও জ্ঞানের দিকে এতদ্দেশীয়দের আকৃষ্ট করে তেমন অন্যদিকে "This was the conversion of the Government of India from Orientalism to Occidentalism—in other words from Sanskrit to English as the ruling tongue in India.... It only needed the arrival of Macaulay in the Calcutta...to bring the Government a definite decision...Macaulay's minute remains the great landmark in the history our Empire considered as an institute of civilization."[২] এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪ সনে স্যার চার্লস উড যে ডেচপাচের দ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেন "Its lines, and to a considerable degree its language, reflect the influence of Duff.... By this system Duff and those who were working with him sought to secure the large development throughout India of schools and colleges under missionary guidance, where the religious element to which they attached prime importance would be sure of rightful prominence in the education given."[৩] ফলে কেরীর আমলে এদেশে প্রোটেস্টান্ট পাদরীদের সংখ্যা "never exceeded ten ; by the time Duff left India the number had grown to about 550 ; today the foreign missionaries, ordained and unordained, men and women...number 5682 এবং রোমান ক্যাথলিক ফাদার ও সিসটারসদের সংখ্যা ৪০০০ হাজারের উপর। এই তথ্য

জানতে পারি ১৯২৫ সনে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড মিশনারী অ্যাটলাস থেকে। পরিবর্তিত অবস্থায় জেমস লঙ যখন শিক্ষা-দীক্ষার কাজে এগোলেন তখন তিনি ইংরেজীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার দিকেই অধিক উৎসাহ দেখাতে থাকলেন। এই উৎসাহ একদিক থেকে চলতি হাওয়া বিরোধী, কিন্তু তাতেই তিনি অবিচল রইলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৭৮ সনে স্বদেশে মারা যান। লঙ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান ১৮৭২ সনে। তাঁর চলে যাবার পর ঠাকুরপুকুর চার্চেরও অনেক পরিবর্তন হয়। প্রথমে তা ছিল চার্চ মিশন সোসাইটির অঙ্গীভূত, তারপর ১৯২১ সনে যখন অক্সফোর্ড মিশনের সঙ্গে চার্চ মিশনের মিলন হয় তখন চার্চ মিশন হাওড়া অঞ্চলের ভার গ্রহণ করেন এবং অক্সফোর্ড মিশন ঠাকুরপুকুর ও আরও কিছু অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত হয়। অক্সফোর্ড মিশন প্রাচীন গীরজা, উপাসনা গৃহ প্রভৃতি নতুন করে তৈরী করেন। ১৯৭০ সনের ২৯শে নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত অক্সফোর্ড মিশনের অধীনে থেকেই ঠাকুরপুকুর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, কিন্তু এই তারিখ থেকে আবার এটি চলে আসে চার্চ অব নর্থ ইণ্ডিয়ার অধীনে। এখন চার্চ অব এপিফানি ঠাকুরপুকুর এ নামেই চার্চ চলছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এদেশে অবস্থানের প্রথমপর্বে জেমস লঙ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী ছিলেন। সেজন্য তিনি বাঙলার সর্বত্র এবং উত্তর-ভারতের নানাস্থানেও যেতেন ধর্ম প্রচার করতে। নবধর্ম-দীক্ষিতদের রেজেস্ট্রি বইতে প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বাক্ষর দান করতেন। চার্চ মিশন মীরজাপুর দীক্ষা দেবার কাজে সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারছে না বলে জেমস লঙ দুঃখও প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের খ্রীষ্ট বিরোধী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসাবে চিঠিপত্র, বিবৃতি, নিবন্ধ রচনা, প্রচার পুস্তিকা রচনা করেছেন। এসব কাজের জন্য তিনি দেশীয় সাধারণ ও প্রধানদের কাছে গোঁড়া-সম্প্রদায়ের কাছে, এবং জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের কাছে নিগৃহীত হবেন, সমালোচিত হবেন এটাই আশা করা যায়। অথচ দেখতে পাচ্ছি এসব কাজ করার পরও তিনি দেশীয় প্রধান ও সাধারণের দ্বারা বন্দিত। দেশীয় এবং ইউরোপীয় সর্ব্বোচ্চ শিখরের লোকেদের সঙ্গে যেমন তাঁর সদ্ভাব, তেমন সদ্ভাব দেশীয় সাধারণদের সঙ্গে ব্লাকটাউন ও হোয়াইটটাউনে লোকেদের সঙ্গেও। তিনি একই পোষাক, একই চরিত্র নিয়ে সর্বত্র যাতায়াত করেছেন। সাদা চামড়া দেখে তাঁর সঙ্গে যারা ভাঙ্গা ইংরেজী ও ভাঙ্গা বাঙলা বা হিন্দুস্থানীতে কথা বলতেন তাদের অনুরোধ করতেন মাতৃভাষায় কথা বলতে।

এই দশকে লঙের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান 'সত্যার্ণব'-সচিত্র মাসিকের প্রকাশ।

সত্যার্ণব (১৮৪৯-৫৫) : মিশনারীদের পরিচালিত সাময়িকপত্র হিসাবে 'সত্যার্ণব' নতুন নয় তা সকলেরই জানা। জেমস লঙের ক্যাটালগ অথবা বাঙলাগদ্য সাহিত্যের যেকোন ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে। মিশনারীদের পত্র-পত্রিকাদি বাঙলা-গদ্যের বিকাশে কিরূপ সহায়ক হয়েছিল তা নতুন করে উল্লেখের দাবী রাখে না। মিশনারীদের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে দেশীয় পত্র-পত্রিকার যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেকথাও সর্বজনবিদিত। দেশীয় পত্র-পত্রিকার খৃষ্ট বিরোধী প্রচারের জবাব দিতে সত্যার্ণব-এর আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সনের জুলাই মাসে। প্রধান সম্পাদক হিসাবে নাম থাকে ডবলু.ও.স্মিথের। চার্চ মিশনারী সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে স্মিথের নাম প্রধান সম্পাদক হিসাবে ছাপা হলেও কার্যকরী সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত ছিলেন স্বয়ং জেমস লঙ। সে জন্যই ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে জেমস লঙের নাম উল্লেখ করেছেন।

সত্যার্ণব-প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে : "এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানাপ্রকার সমাচারপত্র মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে..."পূর্ণচন্দ্রোদয়" এবং "প্রভাকর" প্রত্যহ স্ব ২ শীতাংশু এবং তীব্রাংশু পাত করিয়া পাঠকবর্গের চিত্ত কখন ২ স্নিগ্ধ কখন ২ উগ্র করিয়া থাকেন।... "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বৈদিক তত্ত্বের প্রতিবাদন পূর্বক দিবাকরের সংক্রমণ দিবসে বিরাজমান হয়েন...কিন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে মনের মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শত্রু জয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্ক-বিতর্ক দল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেন না। যাহা মনে আইসে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। যদিও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত সম্পাদকেরা অতিশয় চিত্তরঞ্জক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন তথাপি ধর্মের প্রসঙ্গে তাঁহাদের মাৎসর্য্য দর্শনে খৃষ্টিয় লোকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। অমৃতে যদি যৎকিঞ্চিত বিষ যোগ হয় তবে তাহাও সকলের হেয় হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সুচারু পত্রিকা সকলে মধ্যে ২ খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমাদের চিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে না।

"এ কারণে আমরা সঙ্কল্প করিলাম যে অদ্যাবধি মাসে ২ 'সত্যার্ণব' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসভার একজন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহাদের অভিমত্যানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমার্থ একজনের উপর সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক..."[১]

১। সত্যার্ণব, প্রথম সংখ্যার উপক্রমণিকা।

এই একজন ছিলেন জেমস লঙ। উপরের সম্পাদকীয়ের অংশও তাঁরই রচনা। যদিও মাসিকপত্র হিসাবে প্রকাশের কথা ঘোষিত হয়েছে, তবু মাসিক হিসাবে তা ৩ বৎসরের বেশী চলতে পারে না। চতুর্থ বৎসরের শুরু থেকেই দ্বিমাসিক এবং ১৮৫৫ সনে যখন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় তখন অবধি দ্বিমাসিক হিসাবেই প্রকাশিত হত। দ্বিমাসিক প্রকাশিত হবার আগের সংখ্যায়ও এ বিষয়ে একটি ঘোষণা ছিল। তাতে বলা হয়—যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'সত্যার্ণব' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অনেকটা সাধিত হওয়াতে তদুপরি সম্পাদকীয় কাজকর্ম দেখিবার লোকের অভাব বিবেচনা করিয়া অধ্যক্ষসভা স্থির করিয়াছেন "এখন হইতে ইহা মাসে ২ প্রকাশিত না হইয়া দুই মাসে একবার প্রকাশিত হইবেক। কাগজের কলেবর বা পৃষ্ঠাসংখ্যাও কিছু বর্দ্ধিত হইবেক।"

পত্রিকাটিতে কি ধরণের রচনাদি প্রকাশিত হবে তার কথাও ঘোষিত হয় প্রথম এবং পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায়। এই ঘোষণায় দেখি—(১) ধর্ম্মপুস্তকের ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ, (২) ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধীয় সংবাদ, (৩) জীবন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য ইতিহাস (৪) গৌড়ীয় সমাচারপত্র হইতে উদ্ধৃত প্রস্তাব, (৫) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত ও গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের প্রসঙ্গ, (৬) বৈদান্তিক, পৌরাণিক ও মোসলমান ধর্ম্মের প্রসঙ্গ (৭) গৌড়ীয় সমাজ জীবন প্রসঙ্গ (৮) বিদ্যাবিতরণের প্রসঙ্গ, (৯) প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা, (১০) পূর্ব্বতন বিষয়ের এবং বিবিধস্থলের বর্ণনা (১১) মাসিক সংবাদ ইত্যাদি। (১২) আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গ ও (১৩) স্বাভাবিক পদার্থতত্ত্ব প্রথম সংখ্যায় উপরিক্ত সমস্ত বিষয় ধরা না পড়লেও বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা, সংবাদ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। উপক্রমণিকার শেষে লেখা হয়েছে—"সকল মানুষকেই স্ব ২ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে দেওয়া উচিত, কেননা বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম্ম সাধন করিলে ভ্রান্ত তপস্যা হয়। যদি কেহ শিব কিম্বা কৃষ্ণকে মনে অশ্রদ্ধা করিয়া মৌখিক ধ্যান এবং জপ করত আপনাকে শৈব অথবা বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করে তবে তাহার ধ্যান এবং জপ কেবল প্রতারণা মাত্র...। ...যদি বিশ্বাসে ভ্রম থাকে তবে সে ভ্রম শোধন করা কর্ত্তব্য কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া উচিত নহে। এ কারণ বল দ্বারা ধর্ম্মের শাসন অপরামর্শ।" লঙের এই গদ্য সাবলীল এবং স্পষ্ট। এখানে তাঁর নিজস্ব স্টাইলও বিদ্যমান।

একদিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের যৌক্তিকতা অন্যদিকে সরকারী বহু কাজ সমর্থন করা হয় সত্যার্ণবে। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম এবং ধর্মগুরুদের

সম্পর্কেও আলোচনা প্রকাশিত হয়। দেশীয় সমাজের নানা সমস্যার কথাও এ পত্রে উদ্ঘাটিত হয়েছে। শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে মাতৃভাষায় শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষার যৌক্তিকতা বিষয়ে লেখা হয়। এখানে জেমস লঙ তাঁর নিজস্ব অভিমত চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন—যে দেশে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী, বিদর্ভরাজার কন্যা রুক্মিণী, কালিদাসের ভার্য্যা তিলোত্তমা প্রমুখের ন্যায় বিদুষী নারীর অস্তিত্ব ছিল, যে দেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে যে ঔদাসীন্য তা দুঃখের। স্ত্রীশিক্ষার সুফল বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন—"স্ত্রীশিক্ষার ফল এই যে তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের আচার শোধন হইতে পারে। গৃহকর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে যদি পুস্তক পাঠ অথবা সুচিকা ভিন্ন চিত্র বিচিত্র কার্য্য করিতে পারে তাহাতে হিংসা কলহের সময় পাইবে না।...স্ত্রীশিক্ষার দ্বিতীয় ফল এই যে তাহাতে শিশুশিক্ষার উত্তম উপায় হয়।...স্ত্রীশিক্ষার তৃতীয় ফল এই যে তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজে লজ্জা ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয়।..মূর্খলোক অপেক্ষা পণ্ডিতদের বুদ্ধি কৌশল উত্তম হইবার কারণ কি? মূর্খলোক পশুর ন্যায় কেবল সম্মুখস্থ ব্যাপার অবগত হইতে পারে, বিদ্বান ব্যক্তি পুরাবৃত্ত বিদ্যা দ্বারা অতীত বিষয় বিদিত হইয়া কার্য্যকারণের সম্বন্ধ উত্তমভাবে বুঝিতে পারেন।" অপর একটি রচনায় এ সম্পর্কে লিখেছেন— অঙ্গনাদিগের অসুখ দুই তিন কারণবশতঃ হইতে পারে। প্রথমতঃ যদি তাহারা মানসিক ক্ষীণতা প্রযুক্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া অসার পদার্থের প্রয়াসে আত্মবিড়ম্বনা করে তবে তাহাতে অন্তঃকরণের স্বাচ্ছন্দতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ যদি বিদ্যামৃত পানে বিরত হইয়া অবিদ্যামোহনে মুগ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ পুরুষদের অত্যাচারে চিরদুঃখিনী হইয়া বাস করে।...ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা স্ব স্ব বনিতাগণকে বিদ্যা-শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্দেশের মধ্যেও যাহারা খৃষ্ট-পরায়ণ হইয়াছে তাহারা সকলেই আপন ২ দুহিতৃগণের বিদ্যা শিক্ষাতে অতিশয় তৎপর। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব দুহিতার বিবাহার্থে ব্যস্ত হইয়া আপনারদিগকে কন্যাভারগ্রস্ত মনে করেন। খ্রীস্টিয়ানেরা তাহারদের বিদ্যা-শিক্ষার উপায় করিবার অভিপ্রায়ে আপনারদিগকে কন্যাভারগ্রস্ত মনে করেন।... এতদ্দেশীয় জননীরা যখন স্বীয় কন্যাকে ধর্ম্ম ও বিদ্যার প্রসঙ্গে উপদেশ করিতে পারিবে তখন ভারতবর্ষের কেমন শুভ দিবস হইবে।" স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে শিক্ষিত সমাজে ও তার বাইরে যখন রীতিমত বিতর্ক চলছে তখন জেমস লঙ সত্যার্ণবের পাতায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত যে সাহসী পথে পা বাড়িয়েছিলেন তা উল্লেখের দাবী রাখে।

গত শতকের মধ্যভাগে সমাজ সংস্কার আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করেই যে ব্যাপকতা লাভ করে তা তো জানা কথাই। এই সমাজ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে এ দেশীয় প্রধানেরা উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। লঙ ও অন্যান্য বহু পাদরী এবং ইউরোপীয় ব্যক্তি তাঁদের সাহস জুগিয়েছেন। মনের বল জুগিয়েছেন। লঙ শুধু স্ত্রীশিক্ষা বা মাতৃভাষায় শিক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নন, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও নতুন জাতীয়তাবোধের আমদানীকারকদের একজন। তাই কৃষকদের হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন বিদ্বৎসভা, সমাজ-সংস্কারসভা, এমন কি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উৎসাহকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ পথে টেনে নিয়ে যাবার ব্যাপারে লঙের প্রচেষ্টা ছিল গভীরে। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তদের সঙ্গে লঙের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ট এবং তাঁরাই এই সব সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি অনুশীলনের আগ্রহ এই সব সভার ভেতর দিয়েই যে এ দেশে গতি পেয়েছে তা সকলেরই জানা। জেমস লঙ দেশীয়দের আগ্রহ বাড়াবার জন্য প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন সত্যার্ণবে ও অন্যত্র ঃ বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী ধর্মসংস্কার, সতীদাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজ-কর্মে যখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তাঁরা জেমস লঙ-আদি বিদেশী ভারতবন্ধু এবং পাদরীদেরও পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁদের নিকট থেকে শক্তি, সাহস ও সমর্থন পেয়েছিলেন বলেই প্রধানেরাও দুর্বার গতিতে এগোতে পেরেছিলেন একথা মুক্ত কণ্ঠে যিনি স্বীকার করতে পারবেন না তিনি এখনও সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। সত্যার্ণবে খ্রীষ্টধর্মের গুণাগুণ যেমন প্রকাশ পেত তেমন প্রকাশিত হত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন। প্রকাশিত হত নানাধরণের প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রাদি। তুলনামূলক আলোচনার ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান ধর্মের বিষয়েও আলোচনা থাকত। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক লঙের বাঙলা রচনা অনেকেরই প্রশংসা পায়। তিনি হিন্দু-ধর্মগ্রন্থাদি থেকে অংশ উধৃত করে দেখাতেন স্ত্রীশিক্ষার সুফল। প্রাচীনকে জানার এবং বোঝার ব্যাপারে লঙের অদম্য উৎসাহ ছিল। সত্যার্ণবের ভাষা খ্রীষ্টানী বাঙলাগদ্যের অন্যতম নমুনা। এ ভাষা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। সজনীকান্ত যথার্থই লিখেছেন—"আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্তিকথা মাত্র প্রচার করতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ

করা সহজ হয়। গোটা মানুষ সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে, ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় পর্যবেশিত হয়"।[১] লঙের জীবন কথা অনুধাবন করা গেলে উনিশ শতকের কোন আলোচনা থেকেই তাঁকে বাদ দেয়া যায় না। তাঁর সমস্ত কীর্তি যদি কোনদিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় তবু সমাজ-বিজ্ঞানের কাজের জন্য তিনি আরো বহুদিন স্বমহিমায় বেঁচে থাকবেন।

গত শতকের মধ্যপাদ থেকে বিদেশী লঙ এদেশের সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অস্মদেশীয় বিদ্বানেরা তা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে আরও অনেক সময় নিয়েছেন। কিন্তু লঙের সেদিনকার চিন্তা-ভাবনার সুফল আমরা পেয়েছি। নানাধরণের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে বাঙালী, বাঙলাভাষা ও সাহিত্য যে ভাবে এগিয়ে গেছে উনিশ শতক থেকে, অষ্টাদশ শতকের নীহারিকা অবস্থা থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও পাদরীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তার যে রূপ ও চরিত্র নির্দিষ্ট হয়েছে, তার সঙ্গে যখন দেশীয় সাহিত্যিক, শিল্পী, কলাকুশলী ও জাতীয়তা-বাদীদের প্রচেষ্টা যুক্ত হয়েছে, তখনই বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন ভাবে জাগরিত হতে থাকে। যে ভাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলাল-কেশব বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত সাহিত্য এগিয়ে গেছে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন কৃতবিদ্য সাহিত্য, সমাজ-ঐতিহাসিক, গবেষক এবং পণ্ডিতবৃন্দ। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে উন্মেষপর্বের বিদেশী গদ্য-লিখিয়েরা কোন মৌল রচনা প্রকাশ করেন নি বটে, তবু তাঁরা বনিয়াদ রচনা করে গেছেন। তখন লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক এবং তাঁরাই বাঙলাগদ্যকে ঋজু, বলিষ্ঠ ও সাবলীল করার প্রাণপুরুষ।

জেমস লঙ নামটি সুপরিচিত হলেও তাঁর জীবনকাহিনী আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। তিনি ছিলেন আর্থিক সঙ্গতিতে দুর্বল। যাজকের মাহিনা ও অন্যান্য কাজকর্ম থেকে যে টাকা আয় করতেন তা সবই ব্যয় করতেন এতদ্দেশীয়দের সেবায়, খ্রীষ্টধর্মের সেবায়। ঈশ্বর গুপ্ত একদা খেদ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে—পরমেশ্বর তাঁকে যথেষ্ট বিভব দেন নি, দিলে তিনি দেশীয় সাধারণদের জন্য অনেক কিছু করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই সব ইউরোপীয় সাহিত্যসাধকদের জানতেই হবে। এঁদের

১। সজনীকান্ত দাস: বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

মধ্যে কেরী-আদি কয়েকজনের ইতিবৃত্ত অগ্রজ সাহিত্য-ঐতিহাসিক, সমালোচক ও গদ্যলেখকেরা জানিয়েছেন।[১] লঙ-আদি বহু বৈদেশিক এখনও অনেকটা বিস্মৃত। এই বিদেশীরা ব্যাকরণ, অভিধান, শব্দশিক্ষা, আইন-গ্রন্থ, ক্যাটালগ, সংবাদসার, প্রবাদ-আদি প্রণয়ণে যে অধ্যবসায় ও দুর্গম পথের সন্ধান দিয়েছেন তার অবর্তমানে আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা বাঙালীকে আরও বহুদিন অন্ধকারে হাতড়াতে হত। সত্য বটে মিশনারী, পাদরীরা খ্রীষ্টধর্মপ্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মপ্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করেছে। সাপে বর হয়েছে।

প্রথম দশ বছরের এই পর্যন্ত হিসাব দিয়ে আমরা লঙের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যধারা লক্ষ্য করব। দ্বিতীয় পর্যায় বলতে যে ১৮৫১-৬১ সময় সীমাকে ধরেছি, সে কথা আগেই পরিস্কার করে নিয়েছি।

১৮৫১–৬১

এই সময়টা জেমস লঙের জীবনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৮৫০ সনের মধ্যে তিনি পাকাপাকিভাবে ঠাকুরপুকুর চলে আসেন। ঠাকুরপুকুর চার্চের নতুন জীবন দেন। বাঙ্গালা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখান থেকে 'সত্যার্ণব' পরিচালনা করতে থাকেন। মনে রাখতে হবে যখন জেমস লঙ এ সব কাজ করে যাচ্ছেন তখন রাস্তাঘাট একপ্রকার ছিল না বললেই হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা থেকে ফলতা ও ডায়মণ্ডহারবার কেল্লার যোগাযোগ রক্ষা কল্পে ডায়মণ্ডহারবার রোড গড়ে উঠলেও তা যান চলাচলযোগ্য ছিল না। কখনও নিজস্ব ফিটনে চেপে, কখনও পায়ে হেঁটে জেমস লঙ নানাজনের সঙ্গে যোগাযোগ

রক্ষা করতেন। যোগাযোগ ব্যবস্থারও তখন এত উন্নতি হয় নি। ডাকবিভাগ খুঁড়িয়ে চলছে। ফোন ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। রেলওয়ে ধীরে ধীরে বিস্তারিত হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু! ঠাকুরপুকুর থেকে মীরজাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু লঙ নিয়মিত এ শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। ঠিক এ ধরণের পরিশ্রমসাধ্য কাজ যখন লঙ করছেন তখন আরেকজন নেটিভ পদব্রজে বর্তমান মধ্য কলকাতা থেকে ফোর্ট উইলিয়ম, ফোর্ট উইলিয়ম থেকে দমদম মিলিটারী ক্যাম্প, দমদম ক্যাম্প থেকে সংস্কৃত কলেজ হয়ে প্রত্যেকদিন বাড়ী ফিরতেন। ইনি শ্যামাচরণ শর্ম সরকার। পরে তাঁর সম্পর্কেও কিছু জেনে নিতে হবে। লঙের ঠাকুরপুকুরের দায়িত্ব নেবার আগে থেকেই ঠাকুরপুকুরের সঙ্গে মীরজাপুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৮৩৫ সনে এখান থেকে ৪৫টি ছাত্র পাঠান হয় মীরজাপুরে—গ্রাম্য পাঠশালা থেকে উন্নত শিক্ষালাভের জন্য। লঙের হ্যান্ডবুকে এ ধরণের আরও বহু তথ্য আছে। লঙ এখানে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করার আগেও ধর্মদীক্ষা দিতে মাঝে মাঝে আসতেন। ১৮৪১ সনে রেভারেন্ড লেঙ্ক ও রেভারেন্ড লঙের দ্বারা প্রায় ৬০ জন ধর্মান্তরিত হয়। কাজেই দেখতে পাচ্ছি মীরজাপুরে বসবাসের সময় থেকেই লঙ ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে আসতেন ধর্মীয়কাজে। দেশীয় জনগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে একদিকে যেমন খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন তেমন দেশীয়প্রধান ও সভা-সমিতির সঙ্গে মিশে বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও বাঙালীদের ইতিহাস চেতনার উদ্বোধনে সহায়তা করছিলেন। ১৮৫৭ সনে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রসাদ-মল্লিকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব। ১৮৫৯ সনে এ সংস্থার সভাপতি লঙ। এখানে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করা হত বাঙলায়। সভাপতি হয়ে লঙ ঠিক করলেন বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধাদি পাঠ করা চলবে।

১৮৫৮ সনে প্রকাশিত হয় রাজা রাধাকান্ত দেবের "শব্দকল্পদ্রুম"। এই গ্রন্থের জন্য স্বদেশবাসী ও ইউরোপীয়েরা রাজাকে ১৮৫৯ সনের ২৫শে নভেম্বর একটি মানপত্র দেন। এই মানপত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হাকিম মিরজা আলি, জেমস লঙ প্রভৃতির নাম দেখতে পাই। সাহিত্যসাধকদের কাছে এ গ্রন্থের মূল্য কোনদিন কমবে না। এই সময় লঙকে "Selections from the Records of the Government" তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়, এবং তাঁকে রেকর্ড কমিশনেরও সদস্য মনোনীত করা

হয়। ১৮৫৯ সনে "Selections" No. XXXII প্রকাশিত হয়। প্রকাশক Authority, এ পুস্তকের পরিশিষ্টে "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থে সরকার কর্তৃক ক্রীত পুস্তকের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করা হয়। এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়, তারিখ ও নামেরও কিছু ভুল আছে। তবু এ তালিকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মোটামুটি একটা আভাষ পাওয়া যায়। তারও আগে ১৮৫৫ সনে লঙ প্রকাশ করেন "A Descriptive Catalogue". এ তালিকায় "শিশুবোধক" নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সজনীকান্ত এই গ্রন্থটির সম্পর্কে বলেছেন—"এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কাহার রচনা বা সংকলন জানিতে পারি নাই, তবে ইহা যে দুই শতাব্দীরও অধিককাল বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি রেভারেণ্ড জে. লং সংকলিত বাংলা পুস্তক তালিকা হইতে"।[১] সজনীকান্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ আদি জেমস লঙের এ তালিকার কিছু অশুদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন ঠিকই, তবু আঠার-উনিশ শতকের কোন গবেষকই লঙের এই তালিকাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। রাজনারায়ণ বসু তো এ তালিকাকে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

খ্যাতি-অখ্যাতির নাগরদোলায়ঃ পাদরীর কাজ করতে এসে গ্রাম্য সরল দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান আসে। মীরজাপুর স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজীতে শিক্ষা দেবার সময়ই উৎসাহিত হতে থাকেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে। কারণ, তার দ্বারা সহজে পাঠ্যবিষয় বোঝান যায়। বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্যই তিনি ঠাকুর-পুকুর আসেন। গ্রাম্য পরিবেশে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেশেন। সাদাসিধা, স্পষ্টভাষী গ্রামীণ মানুষদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে তাদের ভালমানুষী দেখে মুগ্ধ হন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, পরিশ্রম করার ইচ্ছা, শিক্ষক ও গুরুজনদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাবার শিষ্টতা, অকৃত্রিম ভাষায় সত্য কথা বলার ব্যাকুলতা, ঝগড়া, মারামারি, দারিদ্র, খেয়াল, নিরাভরণ বাকপটুতা ও ধর্মবিশ্বাস-আদির মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন আলোক।

জেমস লঙের কোন সন্তান ছিল না। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি নিজের সন্তানের মত জ্ঞান করতেন। তাদের কাছে যখন সুসমাচারের বাণী বলতেন তখন তারা কিরূপ মুগ্ধ হয়ে তা শুনত তা উল্লেখ করে বলেছেন—"I have been struck, as in former years, with the fact how much easier

and pleasanter Bible truth enters their minds when communicated through the native language, but, above all, I have been astonished at the power of which Hinduism has over the young mind. The real training is with the mother and in social circle, and until more is done in female education, I despair of seeing much effected to leaven Hindu society with Christain principles." [১] এই মন্তব্যে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে লঙের প্রচেষ্টার মধ্যে একটা মতলব প্রকাশিত। মাতৃভাষায় শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এই উভয় ব্যাপারেই জেমস লঙ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যে যে মতলব তা হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার। এ কথা তিনি বা অন্যান্য পাদরীরা কেউই গোপন রাখেননি।

এই সময় অবধি খ্রীষ্টান পাদরীদের দৌরাত্ম্যে বাঙলার চিন্তাশীল সমাজ কতটা বিরত বোধ করছিলেন তা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। পাদরীদের প্রচারাভিযান এবং দীক্ষাদানকে সংযত করার জন্য তাঁদের নানাবিধ প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছি। ইতিমধ্যে ১৮৫১ সনে গঠিত হয় পতিতোদ্ধার সভা। এই সভা ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে। বেশ কিছু দেশীয় খ্রীষ্টান নিজেদের ভুল বুঝে হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে থাকে। পাদরী সাহেবেরা তখন গোঁড়া শক্ত করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। কোন প্রলোভন দেখিয়ে খ্রীষ্টান করার কাজে তখন থেকে তাঁদের উৎসাহ কমতে থাকে। কারণ, দেশীয় খ্রীষ্টানদের ভিৎ হিন্দু সমাজ ও ধর্মজীবনের মহীরুহের গভীরে যুক্ত। তাঁরা মায়েদের শিক্ষা দিয়ে তাদের মারফৎ ধর্ম প্রচারে উৎসাহিত হলেন।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে হিন্দু প্রধান ও ব্রাহ্ম প্রধানদেরও সমর্থন ছিল। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য আর খ্রীষ্টান পাদরীদের উদ্দেশ্য এক ছিল না। বিদেশীদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজ সম্পর্কে "সোমপ্রকাশ" (৭ই আশ্বিন ১২৭৫) লিখলেন—"কয়েকটি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রমণী এদেশের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েক বৎসর বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন। প্রায় ৮০০শত এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও বালিকা মিস ব্রিটনের যত্নে শিক্ষালাভ করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট প্রতি ছাত্রীকে একটাকা সাহায্য দান করেন। আমেরিকার মিসনিরিরা মাসিক ১২০০ টাকা দিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যয় হয় তাহাতে শিক্ষয়িত্রী ও মিস ব্রিটনকে নিজে অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান করিয়া কালহরণ করিতে হয়। লঙ সাহেবকে নিজের বাটিতে গমন করিলে দেখিবেন মিসনরিদিগের ন্যায় তাঁহারদিগের স্ত্রীগণও অতি সামান্য আহার ও পরিচ্ছদ পাইয়া জগতের হিত

সাধন করিতেছেন।" যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধন করে তাঁরা যে কাজ করে গেছেন তার মূল্য হিসাবে একদিকে যেমন পেয়েছেন জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, তেমন অপরদিকে পেয়েছেন লাঞ্ছনা। হয়েছেন নিন্দিত ও সমালোচিত। ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সমালোচনার মধ্যে যে দিকটির প্রতি পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে ত্যাগ স্বীকারের দিক। কর্তব্যকর্মের প্রতি অবিচলিত ও নিষ্ঠাবান থাকার দিক। মানুষকে ভালবাসার দিক। এইসব কাজ অহেতুক ছিল না ঠিকই, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে থাকেন। কিন্তু তাতে হল কি? তাতে কি আমাদের ক্ষতির চেয়ে লাভ অনেক বেশী হয় নি?

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লঙের আগমনের অনেক আগেই এ দেশ থেকে ছাপা বই প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। গতশতকে ছাপাখানার প্রসারের আগে এদেশে পুঁথি প্রচলিত ছিল। এই পুঁথি থাকত ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধীনে। পুঁথির মালিক অন্যকে তা পাঠ করতে দিতেন না। যাতে অন্য কেউ পুঁথি পাঠ করতে না পারে তার জন্য তাঁরা নানাকৌশল অবলম্বন করতেন। অনেক সময় পাঠককে অভিসম্পাত করা হোত—"যত্নেন লিখিতং বেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্। শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ" (এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি সংখ্যা ৫২০৪) অথবা "অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যঃ মেহনখ। হর্তুমিচ্ছত যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ।" [১] সনাতনীরা ছাপাখানার ওপর ভয়ানক বিরক্ত ছিলেন। তাঁদের অভিমত হিন্দুধর্মকে নষ্ট করার জন্য ছাপাখানার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণ সনাতনীদের এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। শ্রীরামপুর মিশন সাধারণের পাঠপযোগী বহু গ্রন্থ ছাপাতে থাকে। তার আগে যে সব বই প্রকাশিত হয় তা ইউরোপীয় এবং সিভিলিয়ানদের উপকারার্থে রচিত হয়েছিল। ১৮৫০ সনের পর বাঙলা প্রকাশন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। এই সময় থেকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম বাঙলা উপন্যাস "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ", লেখিকা ক্যাথারীন্ ম্যালেনস[২]। কথ্যভাষায় রচিত এ উপন্যাসটির কথা লঙে সাহেবের ক্যাটালগে জানা গেলেও বইটি পাওয়া যেত না। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় জাতীয় গ্রন্থাগারের চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি উদ্ধার করে একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। চলতি

ভাষায় লেখা হলেও চলতি ভাষায় প্রথম গ্রন্থ হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) "আলালের ঘরের দুলাল" ও কালিপ্রসন্নের "হুতোম প্যাঁচার নকশা"। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" তো ইতিহাস সৃষ্টি করে। সে যাই হোক, স্মরণে আছে, ছাপাখানার শুরু থেকেই নানাধরণের পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রকাশিত হতে থাকে এবং শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকম পাঠ্যপুস্তকও বাজার ছেয়ে ফেলে। কিন্তু তখনও কিছু গোঁড়া হিন্দু ছাপা গ্রন্থের বিরোধী। যাঁরা বিরোধী ছিলেন না তাঁরাও বইগুলো সুশৃংখলিতভাবে সংগ্রহ করতেন না। তার ফলে প্রথম যুগের বহু বই এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না। জেমস লঙ তাঁর সময় অবধি কি কি বই ছাপা হয়েছিল তার একটা হিসাব দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এই হিসাব দিতে গিয়ে যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন পরবর্তী গবেষকদের উন্মেষপর্বে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সন্ধান দিতে তার জুড়ি নেই।

নানাধরণের পুস্তক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৩ সন অবধি এখানে পুস্তক বিক্রেতার কোন দোকান ছিল না। লঙের কাছে জানতে পারি এই সময় অবধি বই বিক্রি করত ফেরিওয়ালারা। বই-এর স্তূপ মাথায় করে তারা পথে পথে কিংবা হাটে গঞ্জে ঘুরে বই বিক্রি করত।

এ সব কাজ যখন অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে তখনও ইংরেজীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংস্কার ছিল। কাউন্সিল অব এডুকেশন মুসলমানদের এই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে আবেদন জানান। ১৮৫২ সনে কাউন্সিল আবদুল লতিফকে নিযুক্ত করেন মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। তিনি ১৮৫৩ সনে "Advantages of the English Education to the Mohamedan youth in India" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। তাতে অনেক লেখা আসে। সে লেখা ছেপে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মুসলমান সমাজের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফের চেষ্টায় গঠিত হয় Mohamedan Literary Society, এই সোসাইটির চেষ্টায় বরফ গলতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে হাজী মোহাম্মদ মোহাসীনের দানে হুগলী মাদ্রাসার যে সমৃদ্ধি হয় তা লক্ষ্য করেছি। এই সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জেমস লঙ একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। এই রিপোর্টটি লঙ-সম্পাদিত অ্যাডমের রিপোর্টের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তাতে লঙ বলেছেন—"মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। তিনি দেশীয় বিষয় অবজ্ঞা করেছেন এবং প্রধান

প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে ব্যয়বহুল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করে মুষ্টিমেয় লোকের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। ফলে দেশীয়, মিশনারী ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের সমবেত চেষ্টায় বাইশ বছরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা তিন জনে।" লঙ শিক্ষাকে দেশীয়করণের ব্যাপারে নানা যুক্তি দেখান। তিনি ইংরেজীর বিরোধী ছিলেন না, তবু মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। তাঁর কথা ছিল—ইংরেজী উন্নত ভাষা হলেও জনগণের ভাষা নয়। বিদেশী ভাষায় শত পারদর্শিতা অর্জন করলেও ইংরেজরা কোন বিদেশীকে, বিশেষত তাঁদের অধীনস্থ এ দেশীয়দের, তাঁদের ভাষায় পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চাইবেন না। লঙের এ আবেদন দেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কি ভাবে ভাবিয়ে তোলে তা পরে লক্ষ্য করব।

জেমস লঙ মাতৃভাষার পক্ষে প্রচার করেই বসে রইলেন না। নিজেও আরম্ভ করে দিলেন বাঙলা ভাষার জন্য নানাধরণের কাজ। তিনি ১৮৫১ সনে প্রকাশ করলেন বাঙলা প্রবাদের ওপর একটি ছোট্ট পুস্তিকা। প্রবাদগুলো সংগৃহীত হয়েছিল মেয়েদের মুখ থেকে। যে সময় পাদরী ও ইউরোপীয়দের সন্দেহ করা হোত সে সময় অন্তঃপুরের মহিলাদের মুখের প্রবাদ সংগ্রহ করার মধ্যে বাহাদুরী আছে। দেশীয় সাধারণের সমস্যা এবং ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বোঝার জন্য তিনি শুধু সাধারণ মানুষদের সঙ্গেই মিশতেন না, দেশীয় পত্র-পত্রিকা, কাব্য-নাটকাদিও অধ্যয়ন-অনুশীলন করতেন। এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ-আদি সরকার, পাদরী ও রাজা-মহারাজাদের গোচরে আনতেন। এ জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ লোক নিযুক্ত করার জন্য তিনি বারে বারে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সরকার নীতি-গত ভাবে লঙের পরামর্শ মেনে নিয়ে জানিয়েছেন,—যতদিন পর্যন্ত সরকারী লোক নিযুক্ত করা না যাচ্ছে ততদিন যেন তিনি এ কাজ করে সরকারকে সাহায্য করেন। সরকারের এ অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছেন এবং এই কাজের জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। তবু কেন করতেন এ কাজ?

একদিকে দেশীয় সাধারণের দুর্দশা মোচনের চেষ্টা, অন্যদিকে তাদের নিকট থেকে গুপ্ত সংবাদাদি সংগ্রহ করে তা সরকার, রাজা-মহারাজা, ও পাদরীদের কাছে প্রেরণ করার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা কঠিন। এর মধ্যে এক ধরণের মতলব-বাজী আবিষ্কার করা সম্ভব। হয়তো গুপ্তচরীয় বৃত্তির দায়েও দায়ী করা যেতে পারে জেমস লঙকে। কিন্তু ভাল করে জেমস লঙের জীবনবৃত্তান্ত অনুধাবন করা গেলে দেখা যাবে আসলে মানুষটি ছিলেন পরস্পরবিরোধী চিন্তা ও ভাবধারায়

পন্ট। অদ্ভুত এবং কাজপাগলা। মানুষের কল্যাণ করার ব্যাপারে যখন যে ধরণের কাজ করার দিকে অন্তর থেকে প্রেরণা পেতেন তখন সে কাজে মত্ত হয়ে পড়তেন। স্বদেশীয় মানুষদের কল্যাণ, স্বদেশীয় রাজার শাসন বজায় রাখার দিকে যেমন তাঁর উৎসাহ ছিল, তেমন উৎসাহ ছিল দেশীয় সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে, তাদের জীবনের মান উন্নয়নের ব্যাপারে। এ দুটো কাজ দুই মেরুর—জেমস লঙ দুই মেরুর দুই রশিকে টেনে একই খাতে প্রবাহিত করতে গিয়ে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। সমালোচিত হয়েছেন। তাতে ঘাবড়ান নি। সমালোচনা সহ্য করে সমালোচকের কাছে হাজির হয়েছেন। কোন মান অভিমান দেখিয়ে সমালোচকদের দূরে ঠেলে দেন নি। দেশীয় প্রধানদের মধ্যে যাঁরা একে অপরের সমালোচনা করে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতেন তিনি তাঁদের মধ্যেও সেতুবন্ধনের চেষ্টা করতেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে, দেশীয়দের সঙ্গে, বিভিন্ন মিশনের পাদরীদের সঙ্গে—সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব। বিশফ-হাউসের সর্বত্রই তাঁর গতি ছিল অবাধ। প্রোটেস্টান্ট যাজক হাওয়া সত্ত্বেও ক্যাথলিক পাদরীদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতে তাঁর অসুবিধা হত না। তাঁর সব কাজই ছিল অ্যাভব দি এভারেজ। তাই তাঁকে ভুল বোঝা সহজ ছিল। কিন্তু তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা উচ্চারণ করতে সাহস পেত না অনেকে। নীলকর সাহেবেরা অনেক ভীরু প্রকৃতির দেশীয় ও বিদেশীয়দের সাহস জোগালেন।

সকলেরই জানা আছে যে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-৬১ পর্যন্ত নীল চাষ নিয়ে বাঙলা উত্তাল। তত্ত্ববোধিনী-র অক্ষয়কুমার দত্ত, হিন্দু প্যাট্রিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "সংবাদ প্রভাকর", "ইণ্ডিয়ান ফীল্ড" প্রভৃতি নীলচাষীদের অপরিসীম দঃখদুর্দশার কথা প্রকাশ করতে থাকেন। জনগণের চাপে সরকার ১৮৬০ সনে সীটনকারের সভাপতিত্বে নীল কমিশন গঠন করেন।[১] নীল কমিশন বাঙালীর মনে যে আশার সঞ্চার করেছিল কমিশনের সুপারিশ তেমন আশাপ্রদ না হলেও অথবা কমিশন নীলচাষ ও নীলকরদের জন্য তেমন কিছু নিয়ম বেঁধে না দিলেও, জেলাগুলোকে আরো বেশী মহকুমায় বিভক্ত, সর্বত্র আদালত প্রতিষ্ঠা, এবং পুলিশের সংখ্যা বাড়াবার জন্য সুপারিশ করেন। বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন

রাখারও ব্যবস্থা করেন। এর ফলে নীলকরদের অত্যাচার কমতে থাকে। দেশীয় বিচারকদের সংখ্যা বাড়ান। অনেকেই তাঁদের কাছে হলে সুবিচার পেতে থাকেন। কিছু ইউরোপীয় বিচারকও ন্যায় ও নীতিকে সম্মান করতে গিয়ে নীলকরদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন।[১] এই সময় দীনবন্ধু নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতলীর মিত্র পরিবারের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন নীলদর্পণ নাটকে।

ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে যেসব কথা ইতিমধ্যে বলে নিয়েছি বর্তমান গ্রন্থে তার বেশী আলোচনার দরকার নেই। কারণ, বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে চমৎকার সব আলোচনা প্রকাশ করেছেন।[২]

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ-প্রকাশ এবং গ্রন্থাগার বাড়াবার দরকার হয়। লঙ এ কাজেও মনোনিবেশ করলেন। পুস্তকের অভাব দূর করার জন্য স্কুল বুক সোসাইটি, অনুবাদক সমাজ প্রভৃতি যে সব সংগঠন গঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে ছিল লঙের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তিনি নিজেও গ্রন্থ রচনা করতেন। কিন্তু তাতেও সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো যায় না। আরও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ১৮৫০ সনে ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, আগরপাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ছাপ্রা সোলা, বল্লভপুর, রত্নপুর ও কার্পাসডাঙ্গা—এই দশ জায়গায় দশটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ভার্ণাকুলার লিটারারী রিলিজিয়াস ট্রাক্ট সোসাইটির বদান্যতায়। জেমস লঙ ছিলেন এই সংস্থার সভাপতি। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন ইউরোপীয়রা। দশটি গ্রন্থাগারের মধ্যে কলকাতা, আগরপাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও রত্নপুর গ্রন্থগারে ইংরেজী এবং অন্য গ্রন্থাগারে বাঙলা বই দেওয়া হয়। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্রকে লঙ একটি পত্রের দ্বারা জানান যে উপরে বর্ণিত গ্রন্থাগার সমূহে যে সব বই দেয়া হয়েছে তা ছাড়া তাঁদের সংস্থার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আরও আটশত বাঙলা বই আছে এবং যখনই কোন নতুন বই প্রকাশিত হবে তখন তা খরিদ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।[৩] লঙ যে বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন তাতে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর

নিজস্ব সংগ্রহ থেকে আটশ' বাঙলা বই দান করেছিলেন [১] গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন—"1400 বঙ্গীয় পুস্তক ক্রীত বা দত্ত হইয়াছে, কলিকাতা পুস্তকালয়ে নানাবিধ পুস্তক 400 প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকালয়ের তাৎপর্য এই যে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ এতদ্দেশীয় লোকেরা উত্তম বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করিতে পায় এবং ইউরোপীয় লোকেরাও গৌড়ীয় বিদ্যা ও বাক্য-বিন্যাসের পরিচয় পায়। নতুন পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিবারও উপায় হইয়াছে।"

"উক্ত পুস্তকালয়ে এই গ্রন্থ আছে, যথা—ইংলন্ড, গ্রীক, রোম, ইজিপ্ট, বঙ্গ, ভারতবর্ষ। এই সকল দেশের এবং খ্রীষ্টিয় সভার পুরাবৃত্ত, পদার্থ বিজ্ঞান; জ্যোতিষ, যন্ত্রাধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং পশুপক্ষীর প্রকৃতি ও চেম্বারের নির্মিত জীবন বৃত্তান্ত, রেসলেস এবং নীতিবোধক ইতিহাস।

"লোকে ঐ সকল পুস্তকালয় কেমন উপকারক জ্ঞান করে তদ্বিষয়ে নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতদ্দ্বারা মফঃস্বলের লোকেরা অবসর মত জ্ঞানার্জন করিতে পায়, গ্রন্থাধ্যয়নে তাহারদের অনুরাগ জন্মে এবং তাহারা কলিকাতায় মুদ্রাঙ্কিত অথচ পল্লীগ্রামে অপ্রসিদ্ধ নতুন ২ পুস্তক পাঠ করিতে পায়।"[২]

জ্ঞানার্জনে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা জনসাধারণের কাছে তিনিই প্রথম তুলে ধরেন। এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দের সাহায্য নিয়ে যখন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন তখন দেশীয় প্রধানেরা অবধি এ ব্যাপারে লঙের ন্যায় তৎপর ছিলেন না। আরও নানা ধরণের উদ্যোগ নেন লঙ। তিনিই প্রথম বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা করার জন্যও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখি—

"বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা। (১) পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিবেন তাঁহাকে ৩০০ টাকা এবং যে ব্যক্তির রচনা দ্বিতীয় রূপে গণ্য হইবে তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

(২) ইউরোপ এবং এস্যা খণ্ডস্থ নারীগণের চরিত্র অবস্থা এবং প্রভাবে যে তারতম্য আছে তাহার তুলনা এবং ঐ তারতম্যের সাধারণ কারণ কি, আর সেই সকল কারণের সহিত খ্রীষ্টিয় ধর্মের কিরূপ সংযোগ—এতদ্বিষয়ে বর্ণনা। প্রথম পারিতোষিক ৩০০ টাকা। কেবল বিবিলোকের বদান্যতায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

এই বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে লালদিঘীর পূর্বে ব্রিটিশ লাইব্রেরীর অধিকারীদের নিকট স্ব ২ রচনা পাঠাইবেন। রচনার সহিত মোহর সমেত এক একটি মোড়ক পাঠাইতে হইবেক। মোড়কের উপর রীত্যানুসারে কোন কল্পিত নাম লিখিতে হইবেক।

ইতি

জেমস লঙ

কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জি. টি. মার্শল"[১]

এইচ বি বেল

রামগোপাল ঘোষ

জন গ্রাণ্ট

ডবলু কে

তিনি বাঙলা সংবাদপত্রের পাঠক ও সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত রচনারও উদ্যোগ নেন। "সোমপ্রকাশ"-এ (৫ই জ্যৈষ্ঠ্য ১২৮৭) প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখি—"বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও তৎপাঠে লোকের ইচ্ছা . বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সেই ইতিবৃত্ত বর্ণনে রেবারেণ্ড জে. লং সাহেবের অধিকার। পরাধিকার হরণ করিয়া পাপগ্রস্থ হওয়া আমাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই।"[২] অর্থাৎ বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত রচনার অধিকারী কোন দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি নন—অধিকারী একজন বিদেশী মিশনারী পাদরী, যাঁর নাম রেভারেণ্ড জেমস লঙ।

সকলেই জানেন বেথুন সাহেবের মৃত্যুতে ওদেশবাসী ও এদেশবাসী গভীর শোক প্রকাশ করেন। বিরাট স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫০ সনের ১০ই ডিসেম্বর। এই সভা আহবান করেন মেডিকেল কলেজ এবং কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটারী ডাঃ টি. মউএট। সভাপতি হিসাবে তিনি কলকাতার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিদ্বৎসভা সমূহের একটা পরিচিতি দিয়ে দেখান কিভাবে তৎকালের শিক্ষিত ব্যক্তিরা একেকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের বন্দী রেখে একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে থাকছেন। তিনি আবেদন জানান—এইসব শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি একটি প্রতিষ্ঠানের ছাউনির তলে এসে সমবেত হন, তবে সকলের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নানাধরণের প্রয়োজনীয় ও উন্নতিশীল কাজ করা সম্ভব হবে। এ আবেদনে কাজ হয়। ঠিক হয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে যেখানে ইউরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিতেরা সমবেত ভাবে এ দেশের উন্নতিকল্পে একযোগে কাজ করতে পারেন। এই সভায় জেমস লঙ

১। সংবাদ প্রভাকর ১৮।১।১৮৫১। ২। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রাগুক্ত।

সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের ব্যাপারে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, ডাঃ গুডিব চক্রবর্ত্তী, ডাঃ স্পেঙ্গার প্রভৃতিও তাঁদের বক্তব্য রাখেন। প্রস্তাব নেয়া হয়—"A Society be established for the consideration and discussion of questions connected with literature and science." [১] সংগঠনের নাম কি দেয়া হবে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। বেথুনসাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর নামেই সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন সোসাইটি। অধ্যক্ষ সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন ডাঃ মউএট। [২] সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। প্যারীচাঁদ মিত্রের পর সম্পাদক হন রামচন্দ্র মিত্র। ১৮৬০ সনের আগষ্ট মাসে মউএট সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তখন ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফকে সভাপতি করা হয়। মউএটের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের কারণে সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্রও পদত্যাগ করেন। নতুন সভাপতির আসন গ্রহণ করেই ডাফ ঘোষণা করলেন—"কলিকাতাস্থ বেথুন সোসাইটি অচিরকালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি ও প্যারিসের ইনিষ্টিটিউটের ন্যায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিস্থান হইবে এইরূপ আশা করা যায়।" ডাফ সাহেব সোসাইটির নিয়ম পরিবর্তন করতে চাইলেন। তা নিয়ে মিশনারী ডালের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে ডাফ পদত্যাগ করেন। পরে উড্রো সাহেব ও অন্যদের অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন। তিনি সভাকে ছয়টি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করেন ও প্রত্যেক বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও একজন সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও বিভাগের নাম যথাক্রমে—মিঃ উড্রো-সাধারণ শিক্ষা। অধ্যাপক কাউয়েল—সাহিত্য ও দর্শন। অধ্যাপক স্মিথ—বিজ্ঞান ও শিল্প। ডাঃ চীভারস—স্বাস্থ্য ও সেনিটারী। জেমস লঙ—সমাজ বিজ্ঞান এবং রমাপ্রসাদ রায়—দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা। [৩] যেভাবে সোসাইটি এগিয়ে যেতে থাকে কিছুদিনের মধ্যেই তাতে সাড়া পড়ে যায়। এ সাড়া বেশীদিন প্রাণবন্ত থাকে না। তবে সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা বিভাগ দুটি এগিয়ে যেতে থাকে।

লঙ সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য ও নিবন্ধ রচনা করতে থাকেন। ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকায় ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত তাঁর "Social

Science of India" প্রবন্ধের ওপরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নোটে লঙকে এদেশে সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলনের অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়। শুধু সমাজ-বিজ্ঞান শাখারই ভারপ্রাপ্ত নন, জেমস লঙ বেথুন সোসাইটির অধ্যক্ষসভার সহসভাপতি এবং কমিটি অব পেপরস বা গ্রন্থ সভারও সদস্য ছিলেন। তাছাড়া কিছুদিন তাঁকে সাধারণ শিক্ষা-বিভাগেরও দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এই সভায় ১৮৬৮ সনের ৯ই জানুয়ারী ম্যালেনস ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহের ওপর যে বক্তৃতা দেন তা সমর্থন করার জন্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ও লালবিহারীর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। ম্যালেনস বলেছিলেন,—কুশাসনের জন্য সরকার মহীশূরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। লঙ ম্যালেনসকে সমর্থন করেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন ও লালবিহারী একস্বরে বললেন, অত্যাচার, অনাচারের অছিলায় প্রতিবেশী রাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত নয়।[১] এই বৎসরে অনুষ্ঠিত আরো একটি সভায় লালবিহারীর সঙ্গে লঙের মতবিরোধ দেখা দেয়। লালবিহারী বঙ্গদেশের শ্রমজীবী ও কৃষক প্রভৃতির বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে বললেন—'বাঙলাদেশে 40000000 লোকের বসতি। প্রতি হাজার লোকের নিমিত্ত ১টি বিদ্যালয় আবশ্যক। এ হিসাবে 40000 বিদ্যালয় প্রয়োজন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ১০ টাকা ধরলে মাসিক ব্যয় ৪৮ লক্ষ টাকা। তত্ত্বাবধানের ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা। এবং গৃহসংস্কারের নিমিত্ত ৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সমুদায়ে ৬০ লক্ষ টাকা।' কি ভাবে এই টাকা সংগৃহীত হবে সে সম্পর্কে লালবিহারীর প্রস্তাব ছিল—'লবণ-ট্যাক্স ২২লক্ষ, জমিদারদের নিকট থেকে ৭লক্ষ, সরকার ২১লক্ষ এবং স্কুল ফি থেকে ১০ লক্ষ। মোট ৬০ লক্ষ টাকা।' লঙ এ প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। লালবিহারীর এ প্রস্তাবকে সমালোচনা করে "সোমপ্রকাশ" ১২৭৫ সনের ১২ই ফাল্গুন লিখলেন—"এদেশীয়দের বিদ্যা-সেখান উচিত কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার পর যখন গভর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে প্রথম বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, তখন কি টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তবে এখন কেন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে?" পরের বৎসর ১৮৬৯ সনে লালবিহারী বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তা নিয়েও মতানৈক্য দেখা দেয়। লঙ বললেন, পাদরী লালবিহারী স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি নীরব[২]।

১। অমর দত্ত, প্রাগুক্ত
২। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র

লালবিহারী দে তাঁর সময়ের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী। তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত খৃীষ্টান। আলেকজাণ্ডার ডাফের জেনারেল এসেম্ব্লির ছাত্র। তিনিও কৃষ্ণমোহনের মত স্কটিশ মিশন থেকে বের হয়ে গিয়ে "ফ্রি চার্চ" গঠন করেন[১]। ব্রাহ্ম প্রধানদের সঙ্গে যখন খৃীষ্টিয় যাজকদের বাতবিতণ্ডা চলে তখন লালবিহারী বললেন—"I value Brahmaism for three reasons. I value it as a protest aganist idoltary,...they are not mere speculative monotheists...I value Brahmaism as an instrument of social reform in our country. It has began to emancipate Hindu women from the thraldom of ignorance and tyrant custom, and it is undermining that huge system of caste which presents the greatest barrier to all improvement. And I value Brahmaism as an index of that spirit of religious inquary which has began to manifest itself in some of our educated countrymen. But...it is a very defective system of religion that it is not adapted to the condition of man, that is incapable of giving everlasting happiness to its votaries and that, therefore, as a system of relegion it is of no use."[২] ব্রাহ্মবাদীরা লালবিহারীর এ অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন। এই ধরণের মতবিরোধ ও মতানৈক্য নিয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃীষ্টান আচার্যদের সঙ্গে যে ভেদাভেদ দেখা দিয়েছিল তা ব্যক্তিগত রেষারেষিতে পরিণত হয় নি। আলেকজাণ্ডার ডাফকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল, আবার তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বিভিন্ন আন্দোলনও করা হয়েছিল। কিন্তু নীলদর্পণ মামলার পর জেমস লঙকে নিয়ে ব্যক্তিগত রেষারেষি আরম্ভ হয়ে যায়। এ রেষারেষির ইন্ধন যোগায় নীলকর সাহেব ও তাদের বশম্বদেরা। তাদের প্ররোচনায় কিছু দেশীয় ব্যক্তিও লঙের প্রতি বিরূপ হতে থাকেন। যে সব মিশনারী লঙের জনপ্রিয়তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন তাঁরা এই সুযোগ নিয়ে লঙকে বিপর্যস্ত করার সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। লঙের অবর্তমানে ঠাকুরপুকুর চার্চের রেকর্ড থেকেও তাঁর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা চলতে থাকে। ঠাকুরপুকুর চার্চের লোকেরা কি ভাবে এ কাজ করেছেন ইতিপূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। লঙ এদেশের ও বিলাতের কর্তৃপক্ষকে তাঁর কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে পারলেও বিরোধীদের সামলাতে পারেন না। সমস্ত পরিবেশটাই পাল্টে যায়। স্বস্তির সঙ্গে কাজ করতে ব্যাঘাত

ঘটতে থাকে। ১৮৬৫ সনে লণ্ডন থেকে ফেরার পর থেকেই এ জিনিষটি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে থাকেন। তাই কাজের ধারাটিও পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তখন থেকেই সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন এবং শিক্ষা সংস্কারে অধিকসময় ব্যয় করতে থাকেন।

১৮৬১ সনে বেথুন সোসাইটির সমাজ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসাবে লঙ যে বক্তৃতা দেন তা "500 Questions on the Condition of the Natives of India" নামে সোসাইটির সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। একশ কুড়ি বছর পরেও এ প্রশ্নাবলীর মূল্য যে কমে নি তার প্রমাণ ১৯৬৬ সনে তার পঞ্চম মুদ্রণ। প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, কলিকাতা।

১৮৫১ সন থেকেই স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলতে থাকে। তার সঙ্গে এই দশকে চলতে থাকে বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন। সিপাহী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতিও এই দশকের ঘটনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লঙের জীবনের ধারাও যে পাল্টাতে থাকে তার ইঙ্গিত উপরে দিয়েছি। এ দশকের আগের দশকে লঙের জীবনের ধারা ও গতি-প্রকৃতির সঙ্গে এ দশকের জীবনের ধারা ও গতিপ্রকৃতির কিছু পার্থক্য আছে। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ও চারিত্রেরও পার্থক্য আছে। এ দশকে লঙ ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা। শিক্ষক, সংগঠক, সম্পাদক ও অনুবাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় ভাষায় শিক্ষার প্রচলন করে জনপ্রিয়। ধর্মজীবন, সমাজজীবন, সামাজিক আচার-আচরণ, খাদ্য, পানীয়, পোষাক, নাগরিক ও গ্রাম্য-জীবন, কিম্বদন্তী, প্রবাদ, প্রবচন, প্রাচীন-ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, থেকে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্নাবলী তৈরী করে দেশীয় খৃষ্টান, শাসক ও পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মারফৎ তথ্য সংগ্রহ করে নানা ধরণের গ্রন্থ ও রচনাদি প্রকাশ করতে থাকেন।

১৮৫২ সনে প্রকাশ করেন—"Patabali No. 4, Bengali Instructor, Hay & Co, by J. Long". এ বইর বিবরণীতে পাই—"1852, 200pp. 8 as, gives 42 extracts chiefly from native writers...appended is an introduction to Etymology, being a list of 70 Sanskrit-words and their Bengali derivatives". ১৮৫৪ সনে প্রকাশিত হয় "Patapali No. 3, by J. Long. Hay & Co. 1854, Pp 177, 8 as, extracts chiefly from native works...with a list of Bengali prepositions appended, their primary and secondary meanings."

১৮৫৩ সনে ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির টাকায় যখন "বিবিধার্থ সংগ্রহ"

প্রকাশ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তখন সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য লঙ অনুরুদ্ধ হন। ১৮৫৫ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মিশনারী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত হয় ক্রীশ্চান ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। লঙ দীর্ঘদিন এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। এই সময় তাঁর ওপর কাজের চাপ এত বেড়ে যায় যে তিনি বাধ্য হয়ে ১৮৫৫ সনে সত্যার্ণব বন্ধ করে দেন। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। তা এই—যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'সত্যার্ণব'-এর প্রকাশ ক্রীশ্চান ভার্ণাকুলার-লিটারেচার সোসাইটি সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আরও নানা ধরণের পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়ায় সত্যার্ণবের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়।

১৮৬০ সনের কলকাতার মিশনারী সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা লঙ। এই সম্মেলনে তাঁর "A Hand Book of Bengal Mission" গ্রন্থের জন্য লঙকে অভিনন্দিত করা হয়। আরও একটি প্রবন্ধ সমাদৃত হয় এখানে। প্রবন্ধটির নাম "The Indigenous Plants of Bengal with notes on the peculiarities in their structures, functions, uses in medicine." এই সময়ে তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ—সরকার, রাজামহারাজা মিশনারী ও লণ্ডনের লাইব্রেরীর জন্য দেশীয় পুস্তক সংগ্রহ। পাদরীদের অনুরোধ খ্রীস্টবিরোধী রচনাদি সংগ্রহ প্রভৃতি। ১৮৫৪ সনে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের অনুরোধে তিনি তাঁদের গ্রন্থাগারের জন্য দেশীয় পুস্তক সংগ্রহ করে দেন। অর্থাৎ ১৮৬০ সন অবধি জেমস লঙের গতি সর্বত্র। সকলেই তাঁকে ভালবাসে, পছন্দ করে।

কিন্তু নীলকমিশন গঠিত হবার পর থেকেই লঙের বিরুদ্ধে একদল লোক সোচ্চার হয়। নীলকমিশনে পাদরীদের হয়ে তিনি সাক্ষী দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সাক্ষ্য—"was considered even by the planter's friends as moderate and free from inactive",[১] তবু নীলকরেরা চটে যায়। নীলদর্পণ নাটকের মামলায় সে রাগের ঝাল মেটাতে পারে। এই সময় "Reports of Vernacular Press" প্রকাশ করেন সরকারী খরচায়। তাঁর পরবর্তী সংকলন "Sketch of Vernacular Literature" প্রকাশের জন্যও সরকার টাকা মঞ্জুর করেন। তাছাড়া ভার্ণাকুলার লিটারেচার রিলিজিয়াস ট্রাক্ট সোসাইটি, ক্রীশ্চান ট্রাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি প্রভৃতিও লঙের বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে। লঙের কথা—"দেশীয় লোকেরা বলে—সাহেবদের অন্যায় অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার দেখে আমরা ক্রীশ্চানদের বিচার করি।" তাই অত্যাচারীদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি ইংলণ্ডের

১। লঙের বিবৃতি থেকে সংগৃহীত।

প্রভাবশালী লোকদের কাছে নিয়মিত সংবাদ পাঠাতেন এবং ক্রীশ্চান মিশনের সভায়—"The Ryot—his Teacher and Tortures' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে মিশনারীদের বোঝাতে চেয়েছিলেন নীলকরেরা কি ভাবে মিশনারীদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। ১৮৫৬ সনে ক্রীশ্চান মিশনের সভায়—"Peasant Degradation—an obstacle to Gospel Propagation" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে নীলকরদের সামগ্রিক চরিত্র তুলে ধরেন। তিনি স্বদেশীয়দের রাজত্ব কায়েম রাখার জন্যই চাইতেন নীলকরদের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করতে। বলতেন—'প্রত্যেক মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে দিতে হবে।' তাঁর সমস্ত কাজ সমস্ত উৎসাহ—"spent chiefly among Natives, engaged in Vernacular teaching, incharge of a body of Native Christian, and in the promotion of Christian Vernacular literature"[১]

তাঁর "English Ideas, Indian Adaptation" প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সনে ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকায়। আগের বছর এই পত্রিকায় লেখেন—"The Bank of Bhagirathi, তিনি কলকাতার জীবন, বসতি ইত্যাদি নিয়েও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন—"Calcutta in the olden times—its localities," "Calcutta in the olden times—its people" ইত্যাদি। ১৯৭৪ সনে আমরা এই প্রবন্ধ তিনটিকে একত্রিত করে "Calcutta and its Neighbourhood : History of people and localities from 1690 to 1857", by James Long নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। কলকাতার ওপর লঙের অন্যান্য রচনা—"Peeps into the Social life of Calcutta—a century ago", "Notes of a Tour from Calcutta to Delhi," "Grand Trunk Road, its localities," "Calcutta and Bombay in their Social Aspects" প্রভৃতি। তাছাড়াও এই সময় তিনি লেখেন—"Notes and Querries suggested by a Visit to Orissa," "Central Asia and British India" প্রভৃতি।

এই দশকে লঙের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ—"Granthabali—an alphabetical list of works published in Bengal," "A Return of names and writings of 515 Persons connected with Bengali literature etc.", "Return relating to the Bengali language in 1857 with a list of Native Presses, "A Classified Catalogue of 1400 Bengali Books and Tracts" প্রভৃতি। 'রাজমালা' রচনার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। উল্লেখ করেছি অ্যাডমের রিপোর্ট সম্পাদনা করার কথাও। তাছাড়া "Analysis of Raghu Vamsa", রাজা

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, "মহাম্মদের জীবনী" প্রভৃতি কাজেও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়।[১] জেমস লঙই প্রথম বাঙলা ভাষায় মোহাম্মদের জীবনী রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। লঙের এই গ্রন্থটির কথা হিন্দুরা তো জানেনই না, বহু মুসলমান বিদ্বানও জানেন না। তাঁর "The Unpublished Records of the Government" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সনে, মহাদেবপ্রসাদ সাহার সম্পাদনায় এটি পুনঃ মুদ্রিত হয় ১৯৭৩ সনে। প্রকাশ করেন.কে. এল. মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে।

আমাদের উত্তরাধিকার : আমরা লঙের নিকট থেকে জ্ঞানরাজ্যের বহু কথা উত্তরাধিকার হিসাবে অর্জন করেছি। কিন্তু আমাদের অনেকেই তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। এ কুণ্ঠার রসদও জুগিয়েছেন লঙ নিজে। তাঁর স্ববিরোধ এবং অহং, পুরুষকার এবং নিয়তিবাদের দ্বন্দ্ব। তাঁর সংগ্রামী চেতনা এবং আপোষীনীতি একাকার হয়ে মিলেমিশে অল্প সময়ের ব্যবধানেই একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সেজন্যই তিনি এ দেশবাসীর অন্তর থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেছেন। আর তাঁকে দূরে সরিয়ে দেবার কাজীরাও অনেকটাই কৃতকার্য হতে পেরেছেন।

অক্লান্তকর্মা লঙকে রাজকর্মচারীরা সম্মান করতেন। জনসাধারণের জন্য অল্প খরচায় কিরূপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়, সাধারণভাবে বাঙলা শিক্ষা এবং বাঙলা ভাষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনের উপায় কি, সে সম্পর্কে ভারতসরকার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের মতামত জানতে চান। ছোটলাট সাহেব যে সব দেশী ও বিদেশী ব্যক্তির মতামত জেনে নিজের মতামত জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে লঙ ছিলেন একজন। দেশীয়দের মধ্যে যাঁর মতামত ছোটলাট সাহেব মান্য করতেন তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তবে উভয়ের মত অভিন্ন ছিল না। বিদ্যাসাগর মশায় বলেছিলেন—"বঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিবেন। একশত বালককে লিখন পঠন এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটি মাত্র ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা প্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন।"[২] অন্যদিকে লঙ বললেন—

'সাধারণ্যে শিক্ষা প্রচারই এ দেশের দুরবস্থা দূর করার একমাত্র উপায়। এই শিক্ষা মাতৃভাষায় এবং বুদ্ধিপ্রধান হওয়া আবশ্যক। জ্ঞান শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষা বিশুদ্ধরূপে হওয়া উচিত।' লঙের এই চিন্তার বিশ্লেষণ দেখি তাঁর সত্যার্ণব-এর রচনায়। তিনি লিখেছেন—"অনেকেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষারম্ভকরণান্তর আপনারদের বেশভূষা আচার ব্যবহার ইত্যাদি সকল পরিবর্তন করিয়া বলিয়া থাকেন যে আমরা সভ্যতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। পরে ইংরাজী ভাষাতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইলে ফলবন্তবৃক্ষের ন্যায় বিদ্যার ভারে নতমস্তক না হইয়া ইংরাজী ভাষায় আমারদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এই অহংকারে উন্নত হইয়া ছলনাক্রমে বলিয়া থাকেন যে আমরা বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহা আর কহিতে পারি না। এমদ্ভূত অদ্ভূত মনুষ্যেরা কি লোকেরদিগের হাস্যপরিহাসের কারণ হয়েন না?" [১]

দেশীয় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েলের অধ্যক্ষতায় যে 'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ' গঠিত হয় জেমস লঙ তার অন্যতম সহযোগী। এই সভার অষ্টাদশ মাসিক বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে "সংবাদ প্রভাকর" ১৮৬০ সনের ৯ই মার্চ লিখেছেন—"বোধ হইতেছে ভদ্রলোকের বালক-বালিকাদিগের পাঠোপযোগী সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারই 'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজে'র প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এইরূপ উদ্দেশ্য হয় তবে গুটিকতক উপদেশ লওয়া কর্তব্য. সমাজের প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তকেরই রচনার প্রণালী ও রীতি এক স্বতন্ত্র প্রকার। তাহা পাঠ করিলে বালক বালিকারা সহজে পাঠ করিতে ও বুঝিতে পারে বটে, কিন্তু বালক বালিকাদের সুরীতিশুদ্ধ রচনা পাঠ জন্য বিশেষ ফললাভ হয় না। প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তকে সন্তানকে ক্রোড়ে "লওতঃ" ভাত "খায়তঃ" এরূপ অসমাপিকা ক্রিয়ার ভুরি ভুরি প্রয়োগ আছে! ইহা পাঠ করিলে কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইবে। অতএব...যাহাতে বিশুদ্ধ রচনার উত্তমহ পুস্তক সকল প্রকাশ হয় এরূপ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।" জেমস লঙ এ ধরণের সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সময়ের বাঙলাগদ্য প্রাথমিক যুগের গদ্যের চেয়ে অনেক উন্নত। তিনি বাঙলা ভাষাকে আধুনিক করার চেষ্টায় ছিলেন। এবং কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য তিনি দেশীয়দের উৎসাহিত করছিলেন। এই সময় বাঙলাগদ্যের নিজস্ব স্টাইল এসে গেছে। ভাষাও নিরস নয়, কিন্তু সংস্কৃত ঘেঁষা।

জেমস লঙ পাঠ্যপুস্তকের রচনা ও অনুবাদ পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্র সেন অনুদিত জে. সি. মার্শম্যানের "বাঙ্গালার

১। জেমস লঙ: সত্যার্ণব-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশ।

ইতিহাসকে" "দুরূহতার জন্য নিন্দা করেছেন।"[১] ভাষার সরলতা এবং বিশুদ্ধতার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

বাঙলা সাহিত্যে লঙের দান নতুন করে স্মরণীয়। কারণ, তিনি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা এখনও পাননি। বাঙলাভাষার সঙ্গে লঙের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। তাঁর ধাতুমালা,[২] প্রবাদমালা, সংবাদসার, পাতাবলী প্রভৃতি বাঙলা ভাষার প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণের নিদর্শন।

নানা ধরণের আঘাত পেয়ে শেষ জীবনে নিজের মতামতের কথা কদাচিত প্রকাশ্যে বলতেন। নিজের মনে মনেই সে সব সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতেন। তাঁর মন্ত্রগুপ্তি এমনই নিখুঁত ছিল যে সুপ্রীম কোর্টের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়েও 'নীলদর্পণের' অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নি। ফলে আমাদের যুগে নীলদর্পণের অনুবাদক কে, তা নিয়ে হেঁয়ালী সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্যকে কষ্টিপাথর করে বহু বিদগ্ধ গবেষক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অনুবাদকের আসনে বসিয়েছেন। ১৯৭২ সনে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'Nil Durpan or the Indigo Planting Mirror" গ্রন্থটি প্রকাশকালে আমরা বিষয়টি পুনর্বিচার করে মাইকেলকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। কেন পারি না নানা যুক্তি দিয়ে তা সেখানে বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে নীলদর্পণ মামলা ও অনুবাদক কে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেখানে প্রকৃত অনুবাদকের নামও প্রকাশ করেছি। সুতরাং এখানে এ ব্যাপারে আরো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এখন আমরা লঙের ভারতবাসের শেষ বা তৃতীয় দশক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। এই দশক বলতে ১৮৬২-৭২ সময় সীমার কথা বলছি।

১৮৬২-৭২

বিজয়ী বীরের ন্যায় জেমস লঙ জেল থেকে বের হলেন। সাধারণ জেলে পাঠাবার নির্দেশ থাকলেও তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্সি জেলের তিনতলার একটি আলাদা ঘরে তিনি সস্ত্রীক বন্দী ছিলেন এক মাস। জেলে প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে যত লোক দেখা করতে যেত ততলোক তখন ভারতের বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গেও দেখা করতে যেত না বলে সে সময়ের সংবাদপত্রের হিসাব। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, দেশীয়প্রধান ও সাধারণমানুষ এবং পাদরীরা। জেলের মেয়াদ কমাবার জন্য ৩০,০০০ হাজার লোকের সইযুক্ত যে আবেদনপত্র

প্রস্তুত হয়েছিল লঙের অনুরোধে তা বড়লাট বাহাদুরের কাছে পাঠান হয় না। [১] কারণ, লঙ মনে করতেন তাতে সরকার বিব্রত বোধ করবেন।

কিন্তু তবু লঙের মানসিক যন্ত্রনা বেড়ে যায়। চার্চ মিশনারী সোসাইটির সভ্যদের একটা ভারী অংশ মিশনের কাজ থেকে লঙকে বিতাড়িত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। স্মরণে আছে, শুরু থেকেই একদল সভ্য লঙের বিরোধী। কারণ, লঙ নিজের বুদ্ধি ও চিন্তার দ্বারা চালিত হতেন। লঙের কারাদণ্ড তাঁদের হাত শক্ত করে। তাঁরা প্রচার করতে থাকেন লঙ রাজনীতি করছেন। সুতরাং তিনি তাঁদের কাজের সহায়ক না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মিশন হাউসে নালিশ যেতে থাকে। লঙ জেলে বসেই এ সব জানতে পারেন। লঙের বিরুদ্ধে সোরগোল শুরু হয়েছিল মামলা দায়ের হবার সঙ্গে-সঙ্গেই। একদিকে নীলকর ও তাদের স্তাবকবৃন্দ, অন্যদিকে পাদরী ও স্বদেশীয়দের একাংশের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে তিনি নেমে পড়লেন। জেল থেকেই তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে লঙ লণ্ডনে চিঠি দেন। লণ্ডনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তাঁর বিরোধীদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। লঙ মুক্তি পাবার পর মরিয়া হয়ে নিজের সমর্থনে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেন। এ কাজে অনেক সময় দিতে হওয়ায় তাঁর ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়েও কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। কিন্তু লঙ মনোবল হারান না, বা ভেঙ্গেও পড়েন না।

স্বদেশীয়দের সঙ্গে মতানৈক্যে যে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন এতদ্দেশীয়-দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাতে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা। জেল থেকে বের হয়েই লক্ষ্য করলেন সরকারী আমলাদের, যাঁরা কয়েকমাস আগেও তাঁকে সমীহ করে চলতেন, হৃদ্য ব্যবহারে তাঁকে আহলাদিত করতেন, তাঁরাও তাঁকে এড়িয়ে চলতে চান। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা আবহাওয়া। এই পরিবর্তন তাঁকে অশান্ত করে তোলে। মামলার রায়দানের পর তিনি আদালতকে উপলক্ষ্য করে যে বিবৃতি দেন তা আসলে তাঁর বিরোধী ও পাদরীদের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। বিরোধীরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং লঙকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। [২] তিনি কলকাতার বিশপ ডঃ জর্জ কটনকে চিঠি দিয়ে বললেন, পাদরী জেমস লঙকে মিশনারী কাজ থেকে বিতাড়িত করার যে চক্রান্ত চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করুন। লঙকে বিতাড়িত করলে দেশীয় সাধারণের মধ্যে তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হবে। তাতে আইন শাসন ও শৃঙ্খলা পর্যন্ত বিঘ্নিত হতে পারে। এই চিঠি

পেয়ে ডঃ কটন লঙকে পূর্ণ সমর্থন করতে থাকেন। আর তাঁকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয় না। লঙ জেলে বসে বিলাতে যে চিঠি লেখেন তাতে জানান,—তিনি যে সব কাজ করেছেন তা পাদরী ডাফ ও পাদরী ওয়াইলাইর সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছেন। ডঃ কটনের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে মিশনারী কাজের ব্যাপারে লঙের অবস্থা খুব একটা হেরফের না হলেও বিলাতের কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ব্যাপারটা সবিস্তারে জানাবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। মুক্তি পেয়েই তিনি বিলাত রওনা হলেন। এ যাত্রায় তিনি তিন বৎসর লণ্ডনে ছিলেন।

অন্য জীবন ঃ ১৮৬২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে লঙ লণ্ডনের পথে যাত্রা করলেন। প্রত্যেকবারের মত এবারেও সঙ্গে গেলেন তাঁর স্ত্রী।

এই বৎসর ২৩শে এপ্রিল স্যার জে. পি. গ্রাণ্ট স্বাস্থ্যের কারণে লেফটানেণ্ট গভর্ণরের চাকরি থেকে অবসর নেন। নীল-দর্পণ প্রসঙ্গ নিয়ে তখনও নীলকরেরা ভারতসরকার, ভারতের বড়লাট ও ভারত-সচিবকে ব্যস্ত রাখে। তারা স্যার গ্রাণ্ট, সীটনকার, ইডেন, প্রভৃতিকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে লেগে থাকে। তাই তখনও ভারতসরকার এবং বাঙলাসরকারের মধ্যে চিঠিপত্র চালাচালি চলতে থাকে। ১৮৬১ সনের ১২ই আগষ্ট সীটনকার তাঁর কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে চাকরি থেকে ইস্তাফা দেন। সীটনকারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে লর্ড ক্যানিং লিখলেন—"So able and distinguished a public servant as Mr. Seton Karr has shown himself to be, on his ceasing to sit in the Legislative Council, be placed in some suitable situation where the public may have benefit of his service"[১] সীটনকারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে তাঁকে বদলী করা হয়। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ও পরে বিদেশ বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পান। এ ছাড়াও এলগিন-গ্রাণ্ট পত্রালাপ চলতে থাকে। বড়লাট ছোটলাট সাহেবকে যে পত্র লিখলেন তা তৎকালীন সংবাদপত্র ফাঁস করে দেয়। তাতে স্যার গ্রাণ্ট বিব্রত বোধ করেন। এবং অনেকটা চড়া সুরে নিজের সমর্থনে বড়লাটের কাছে যে পত্র লেখেন তাও সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য অনুমতি চান। কারণ, তা "withdrew all imputation of blame, but Lord Elgin, who had become Governor General, decided on 3rd May not to publish more papers, as Lord Canning, two members of his Council and J. P. Grant had all meanwhile retired".[২] গ্রাণ্ট স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করলেও আসল

১। C. E. Buckland, op. cit. ২। Ibid.

কারণ ছিল নীল-ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি। গ্রান্টের পর লেফটানেন্ট গভর্ণর হলেন সিসিল বীডন। তিনি ১৮৫৬ সনে কলকাতা এসেছিলেন।

নীলদর্পণ মামলার পর চারদিকে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছিল বীডনের সময় তা অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। লঙের বিরুদ্ধে মিশনারীদের প্রচারও বন্ধ হয়। তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে বিলাতের কর্তাদেরও সমর্থন আদায় করতে পারেন। নতুন উদ্দীপনা ও চেতনা নিয়ে ১৮৬৫ সনে লঙ কলকাতায় এসে দেশীয় সাধারণ ও খৃষ্টানদের সেবায় মনোনিবেশ করলেন।

ছোটলাট হয়েই বীডন সাহেব কোম্পানীর একচেটিয়া লবণের ব্যবসা প্রত্যাহার করে নেন। তাতে সুনাম কিনলেও বর্ধমান জ্বরের প্রাদুর্ভাবে হিমসিম খেতে থাকেন। তারপর সুরু হয় প্রচণ্ড প্লাবন। জেমস লঙ ১৮৬৫ সনে লণ্ডন থেকে ফিরে দেখলেন বর্ধমান জ্বর সারা বাঙলায় যে মহামারি ডেকে এনেছিল তা কিছুটা দমিত হয়েছে। ১৮৬৪ সনের প্লাবনে হুগলী, শ্রীরামপুর, নদীয়া, কৃষ্ণনগর, রামপুর, বোয়ালিয়া, পাবনা ও বগুড়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। জেলও ধ্বসে পড়েছিল। হাওড়ায় ২000 মানুষ ও ১২০০ গবাদিপশু, বোয়ালিয়ায় ২0,0১০ মানুষ এবং ৪0,000 গবাদিপশু, ২৪পরগণায় ১২,000 মানুষ এবং শতকরা আশিটি গবাদিপশু মারা গেছে। কিছুলোক গাছের ওপর উঠে প্রাণ-বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের কোন সঙ্গতি ছিল না। শুধু তাই নয়—"By far the greater harm done by the cyclone was the damage caused to the Shipping in the river. On the 5th October there were 195 Vessels within the limit of Calcutta Port. (There was no bridge between Calcutta and Howrah in 1864). Ten vessels were sunk in the river and 145 driven on the shore...The avenues in Fort William and Botanic Garden were destroyed. The Eden Garden were turned into wilderness". এই সরকারী রিপোর্টের চেয়েও বাস্তব ক্ষয়ক্ষতি ছিল অনেক ব্যাপক।

বর্ধমান জ্বরের প্রকোপ কমতে না কমতেই রাক্ষসী প্লাবন জনসাধারণকে গভীর দুর্দশার মধ্যে টেনে নিল। দুর্যোগ থেকে উদ্ধার পাবার আগে পুনরায় বর্ধমান জ্বরে জনসাধারণ দিশেহারা। সরকারী রিপোর্টে দেখি—"The epidemic fever disappeared entirely after cyclone of 1864, and there was no return of it in 1865 to attract attention [১] কিন্তু ১৮৬৬

১। Ibid.

ও ৬৭ সনেও এ জ্বরের প্রকোপে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। ১৮৬৫ সনে ফিরে আসার পর ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ সনের বর্ধমান জ্বরের আগ্রাসী ক্ষুধা লক্ষ্য করতে থাকেন লঙ এবং সম্ভাব্য ত্রাণকার্যে নিজেকে বিযুক্ত করেন। বিপদের সময় তাঁকে কাছে পেয়ে দেশীয় খ্রীষ্টানেরা বিশেষ আনন্দিত হয়। এই সময় থেকে তিনি সমাজ সংস্কার ও সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারেই অধিক সময় ব্যয় করতে থাকেন। রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। তবুও এ কথা তো ঠিকই—জীবন মানেই রাজনীতি। রাজনীতিকে একদম পরিহার করে সে যুগেও বসবাস করা অসম্ভব ছিল। জেমস লঙকে তাই মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত লণ্ডন যাবার সময় রেভারেণ্ড ফ্রীয়ারের কাছ থেকে লঙ একটি সুপারিশপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ উডের কাছে। এই পত্রে লঙকে পরিচিত করিয়ে ফ্রীয়ার লিখেছিলেন—"Though sincere and honest Long was a rather narrow-minded partisan who had seen little of the world and that entirely from an ultra-Irish Protestant point of view. He could do much harm 'if he dropped into the midst of May meetings with strong feelings' and much information on a class of Indian grievances which are stock subject for Exeter House platform" সুতরাং তাঁর পরামর্শ—"to forestall Long's exploitation as 'a stalking house for partisan people' by encouraging the missionary to expound his views in vernacular education and by continuing him to leave politics to secular people.[১] এ চিঠির বিষয়বস্তু না জেনেই লঙ এ সুপারিশপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে লণ্ডনের নানাজনকে নানাভাবে বোঝালেন এবং তাতে কৃতকার্যও হলেন। তবু এ চিঠিতে যা প্রকাশিত—লঙ একপেশে ও সংকীর্ণ এবং পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর ধারনা সীমাবদ্ধ—তাঁর কার্যপদ্ধতি ও রচনাদি পাঠ করে তা মনে করার কারণ নেই। বরং আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে দেখি জাগ্রত চেতনা ও বিশ্ববোধ। ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। আসলে দেশীয় সমাজে লঙের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা বেশ কিছু পাদরী ও ইউরোপীয়দের ভয় ও ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। সে জন্যই অনেকে তাঁর চরিত্র হননে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সে যাই হোক, লঙ যখন বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইতস্তত ছোটাছুটি করছিলেন তখন বিলাতের নির্দেশে এদেশের সরকার দেশীয় ভাষায় শিক্ষার

১। B. B. Kling, op. cit.

প্রতি অধিক মনোনিবেশ করলেন। আর এ জন্য লঙ এদেশে ও বিদেশে বসে লেখালেখি করছিলেন। জনমত গঠন করছিলেন। একদিকে থেকে সরকারী এ সিদ্ধান্তে লঙের জয় হয়। সরকার ১৮৬২ সনে বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষক তৈরী করার জন্য এই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। লঙের পরামর্শমত জে. পি. গ্রান্টের আমলে এ বিষয়ে প্রস্তাব নেয়া হয়। কিন্তু তা কার্যকর হয় স্যার বীডনের আমলে—যখন লঙ নীলদর্পণ মামলার কারাভোগের পর লন্ডন গিয়ে ছিলেন—তখন।

যখন এদেশে নর্মাল স্কুল খোলা হল তখন লঙ লন্ডনে অ্যাবওরিজিন প্রোটেকসন সোসাইটি, পীস সোসাইটি, সমাজবিজ্ঞান পরিষদ, রিফর্ম এসোসিয়েশন, ফোকলোর সোসাইটি থেকে বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশন, এবং ভারতের শিক্ষা, শাসন ও ধর্ম-ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত আমলাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাঁর বক্তব্য বোঝাতে থাকেন। শুধু এই সব সংগঠন বা সরকারী আমলাদের সঙ্গেই নয়, যোগাযোগ করেন—ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে। ব্যাপ্টিস্ট মিশনের সম্পাদক ই. বি. আন্ডারহিলের সঙ্গে, মিশন হাউসের রেভারেন্ড ডব্লু আর্থারের সঙ্গে। এবং অধ্যাপক ফ্রবস, স্যার কীন্নার্ড, লর্ড ব্লান্ডফোর্ড, জে. মুইর, রেভারেন্ড এইচ. পেন, লর্ড স্টানলে, চার্চ মিশনের এস. এস. পেটো, রেভারেন্ড সালে, স্যার জে. ডব্লু কে, স্যার আরস্কাইন পেরী, লর্ড অকল্যান্ড, এইচ. ডি. সিমুর, স্যার বুলার, ডাঃ লুসিংটন, স্যার এইচ. এম. পার্কার, স্যার জে. রাসেল, স্যার লরেন্স পীল, স্যার আর ডব্লু ক্রফোর্ড, জে. সি. মার্শম্যান প্রভৃতির সঙ্গে।

মার্শম্যান অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতবাসীর জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন, তবু দেশীয় সংবাদপত্র তাঁকে সরকারের দালাল বিবেচনা করে নানাধরণের অপপ্রচার আরম্ভ করে। পূর্বেই বলেছি এ দেশীয়দের নিন্দা ও কুৎসায় তিক্তবিরক্ত হয়ে তিনি ১৮৫২ সনে চিরতরে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যান, আর এদেশে আসেন না। কিন্তু লন্ডনে বসেও তিনি ভারতবাসীর কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। লঙের পরিস্থিতি অন্যরকম। লঙকে নিন্দা ও কুৎসায় তিক্তবিরক্ত করেছে তাঁরই স্বদেশবাসী। এদেশীয়দের কাছে তিনি সম্মানিত। তাতে কি হবে! মানসিক যন্ত্রনার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। কারণ, উভয়েই ভারতবাসীর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

লন্ডনে লঙ নীলকরদের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, দেশীয়দের কথা সম্যকরূপে বোঝার জন্য কর্তাদের দেশীয়পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকাদির অধ্যয়ন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার

কথাও সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে থাকেন। এদেশে তিনি যেসব কাজের সুপারিশ করেছেন সরকারীভাবে তা যাতে গৃহীত হয় তার জন্যও চেষ্টা করতে থাকেন। ইতিপূর্বে গ্রাণ্ট ও সীটনকারদের মত উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে রাজী করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁরা রাজী হলেই তো হবে না। তারজন্য বিলাতের স্যাংশন চাই। ভারতসরকারের নির্দেশ চাই। লঙের এ চেষ্টাও সফল হয়। তাই দেখি কিছুদিন পরেই ভারতসরকার বাঙলাসরকারকে নির্দেশ দেন—দেশীয় সংবাদ ও সাময়িকপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকাদি "be carefully examined, that all matters of political importance contain in them might at once be brought to the notice of the Government and materials be at the sametime be collected for an annual report on the native press"[১] ভারতসরকার বাঙলাসরকারকে যখন এ নির্দেশ দিলেন তখন লঙ বিলাতে বসে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে সচেতন করাচ্ছিলেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্যার বীডন রেভারেণ্ড জে. রবিনসনকেদেশীয়সংবাদ-পত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় সরকারের কাছে বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করতে। রবিনসন বাঙলা পত্র-পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দেশীয় ইংরেজী পত্র-পত্রিকা দেখতেন সরকারের সচিবেরা। রবিনসন প্রত্যেক সপ্তাহে রিপোর্ট দিতেন। বৎসর শেষে পেশ করতেন বাৎসরিক রিপোর্ট। বাঙলা সরকার সে রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার পাঠাতেন লণ্ডনের ভারতসচিব ও ভারত সরকারের কাছে। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হত সরকারী পর্যায়ে।

ইতিমধ্যে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন ভারতসরকারের কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত চলিত সাহিত্যের তালিকা চেয়ে পাঠান। ভারতসচিব নির্দেশ দেন—"a catalogue of the works already published in India should be prepared and an Annual Return of all new books and pamphlets be furnished"[২] জেমস লঙ নিজে থেকেই এ কাজ করে যাচ্ছিলেন এবার সরকারী নির্দেশে তাঁর কাজের মূল্য স্বীকৃতি পায়। সরকার রবিনসনকে বললেন—জেমস লঙের প্রদর্শিত পথে রিটার্ণ প্রস্তুত করতে। এ কাজের জন্য মহাকরণে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। লঙ ইতিমধ্যে আরও যে সব কাজ করে আমাদের অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন তার মধ্যে একটি অশ্লীল

পুস্তক নিবারণ আইন। সমকালেও এ ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন চলছে। সে আন্দোলনের নাম হয়েছে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। জেমস লঙ এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং সরকারের সাহায্য নিয়ে একটি আইনও বিধিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। [১] এ সম্পর্কে পরেও আমরা আলোচনা করার সুযোগ পাব। তাছাড়া লঙের চেষ্টায় ১৮৬৭ সনে পাশ হয় "ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট।" এই আইনের বলে বিনামূল্যে প্রত্যেক মুদ্রককে তিনখানা করে পুস্তক সরকারকে দিতে হয়। সরকার প্রাপ্ত বইর ভিত্তিতে বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরী করেন—কোন ভাষায় কত বই, কি কি বিষয়ের ওপর কি কি বই প্রকাশিত হয়েছে, তার হিসাব রাখেন। তাছাড়া, রচিত গ্রন্থাদি সরকারের স্বার্থ-বিরোধী কী না, তাও পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পান।

সরকার যখন এ সব করে যাচ্ছিলেন তখন লঙ বিলাতে। এ দিকে মিশনারীরা পুনরায় চড়ক পুজো বন্ধ করার ব্যাপারে সরব হয়ে পড়েন। ১৮৬৫ সনের ১৫ই মার্চ তাঁরা বীডন সাহেবকে জানালেন—"The practice of hook-swinging and other self torture such as banphora and the like in public of the Charak festivel, which has been either voluntarily discontinued or authoritatively suppressed in most parts of India, still prevails in many districts of the Lower Provinces of Bengal...the Government regards the ptactice with abhorrence, and to warn all...if they preserve, they will make themselves liable to legal punishment." [২] সরকার ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরোধী হলেও মানবতার খাতিরে বানফোঁড়া বন্ধের জন্য নরম-গরম নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন আমলাদের।

প্রায় তিন বছর বিলাত কাটিয়ে কলকাতা ফিরে লঙ নানা ধরণের সংস্কার ও পরিবর্তন দেখতে পান। আসার আগে তিনি কিছুদিনের জন্য রাশিয়া গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার রাশিয়ায়ঃ পূর্বেই বলেছি লঙের বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। তবু বিলাতের কর্তৃপক্ষ চাইলেন লঙ কিছুদিন ভারতবর্ষের বাইরে থাকুন। ফলে প্রায় তিন বছর তাঁকে ইউরোপ থাকতে হয়। এই সময় তিনি কিছুদিনের জন্য রাশিয়া যান। লঙ জানতেন ইতিমধ্যেই কলকাতা ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের এশিয়াটিক সোসাইটি দ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাছাড়া, রাশিয়ার চার্চ এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় তৎপর হয়েছেন। তিনি যখন

লণ্ডনে তখন ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উভয়দেশের পাদরী ও সভ্যদের একটা সভা হয়। লঙ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সভায় যে বক্তৃতা দেন তাতে তাঁর শৈশবকালের রাশিয়ার স্মৃতিমন্থন করেন। লঙের বক্তৃতায় রাশিয়ার পাদরীরা খুশী হয়ে লঙকে আরেকবার রাশিয়া যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিশেষত ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার যে যোগ ছিল তাতে রাশিয়ার পত্র-পত্রিকা ভারতের কৃষক আন্দোলন এবং নীল-বিদ্রোহের ব্যাপারে তাদের জনগণকে অবহিত করায়। সে কারণে লঙের নামটিও সেখানে সুপরিচিত হয়। [1] লঙ এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সনে পাঁচ-ছয় মাসের জন্য দ্বিতীয়বার রাশিয়া যান।

লঙ নিজেই রাশিয়া যেতে উৎসাহী ছিলেন। আমন্ত্রণ পেয়ে সে উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। লঙের উৎসাহের কারণ, এই সময় জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করলে তার প্রত্যক্ষ ফল কি হয়েছে তা জানা ও বোঝা। চার্চের নিমন্ত্রণ পাওয়াতে একদিকে সুসমাচারের বাণী প্রচার ও অন্যদিকে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত ফলাফল জানার সুযোগ আসে। তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের নিকট থেকেও একটি নিমন্ত্রণ পত্র পান। কালবিলম্ব না করে রাশিয়ার পথে পা বাড়ালেন। আইরিশ মানবতাবাদী মন, ভারতবর্ষে পাদরীর অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষকের চোখ নিয়ে তিনি ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার কৃষক ও সাধারণ মানুষ এবং সরকারী আইন কানুন ও প্রয়োগের ব্যাপার লক্ষ্য করতে থাকেন পরিণত বয়সে।

ভারতবাসীদের মধ্যে কাজ করার সময় লঙ কেন রাশিয়ার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন তা বোঝার জন্য এক মুহূর্তের জন্য রাশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকাতে হবে। ভূমির দিক থেকে এ দেশটি বৃহৎ, ইউরোপ থেকে প্যাসিফিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়নের উপর। জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের সমন্বয় ও মিশ্রণে। বিভিন্ন স্থানের জনগণের বিভিন্ন ভাষা। সরকার স্বীকৃত ভাষা একুশটি।

পনের শতকে রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপের সংস্পর্শে আসে। পূর্ব ইউরোপের এই শ্লাভ্ দেশটি কৃষিপ্রধান। চারদিকে নদী। বহিরাগতেরা নদীপথে এদেশে আসত বাণিজ্য করতে। ১৩২৮ সনে প্রথম ইভান ভ্লাডিমিরের রাজধানী দখল করেন। তিনি মস্কোতে তাঁর রাজধানী ও রাশিয়ার চার্চ স্থানান্তরিত করেন। ভয়ানক অত্যাচারী রাজা ছিলেন প্রথম ইভান। সাধারণের কাছে তিনি পরিচিত

১। লঙের Rusia, Central Asia and British India গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

ছিলেন ইভান কলিতা (টাকার থলি) হিসাবে। তৃতীয় ইভান রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন। চতুর্থ ইভানকে হটিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে তিনি ইভান দি টেরিবেল বা সর্বশক্তিমান জার।

জার শব্দটি লাতিন শব্দ সিজার (সম্রাট)-এর সমগোত্রীয়। তিনি প্রথম জাতীয় পরিষদ বা ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লি গঠন করেন। এই পরিষদে রাজার মনোনীত ধনীরা ছাড়া পাদরী, জমিদার এবং ব্যবসায়ীদেরও স্থান ছিল। পোল্যান্ড ও সুইডেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে যে অর্থের প্রয়োজন হয় পরিষদ তা মেটাতে পারে না। তখন তিনি ঈশ্বরের প্রেরীত সর্বশক্তিমান শাসক হিসাবে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে থাকেন। ১৮৫৪ সনে তাঁর পুত্র থিওডার দ্বিতীয় জার। তিনি পিতার ন্যায় শক্ত শাসক ছিলেন না। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে রাজন্যসম্প্রদায় গদী দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই আরম্ভ করে দেন। বরিস গডুনোভ জয়ী হন। তিনি রাজা হয়ে ইভানের ন্যায় রাজ্য বাড়িয়ে চললেন। ইভানের চেয়ে কম নিষ্ঠুর হওয়ায় বরিস কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৫৯৮ সনে তিনি মারা যান। ১৬০১ সনে সারা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ১৬০৪ সনে ইভান দি টেরিবেলের যে পুত্র মৃত বলে প্রচারিত হয়েছিল তিনি জনসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করে বললেন—'আমি মারা যাই নি। আমার রাজ্য ফেরৎ চাই।' রাজ্য ফেরৎ পাবার জন্য জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পোল্যান্ড এবং রাশিয়ার শ্রমিকদের সাহায্যে ১৬০৫ সনে মস্কো জয় করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। ১৬১৩ সন পর্যন্ত চলে বিশৃঙ্খলা। এর মধ্যে জাতীয় পরিষদ মাইকেল রোমানভকে জার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। রোমানভের বংশের লোকেরাই ১৯১৭ সনের কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ায় রাজত্ব করেনে। [১]

রোমানভরা সাম্রাজ্য বাড়িয়ে চললেন। প্রজাপালনের দিকে দৃষ্টি দেন না। এই বংশের প্রথম পিটার ১৬৮২-১৭২৫ পর্যন্ত জার। তিনি রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করলেন। বহু কুসংস্কার বন্ধ করলেন এবং জনগণকে বাধ্য করালেন পশ্চিম ইউরোপের আদবকায়দা, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি গ্রহণ করতে। নারীর অধিকারও মানলেন। তাদের একা একা চলাফেরা করার সুযোগ দিলেন। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সমতা রেখে পঞ্জিকা সংস্কার

করলেন। ১৬৯৭ সনে ব্ল্যাক সি দখল করে পশ্চিমের অনুকরণে সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরের পত্তন করলেন। এখানে ইউরোপীয় কায়দায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। শিশু বয়সে জেমস লঙ এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করতে প্রথমবার রাশিয়া আসেন। এই শহরের বর্তমান নাম লেনিনগ্রাদ।

পিটার দেশবাসীকে সরকারের কাজে লাগালেন। ধনী ও বর্ধিষ্ণুদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করলেন এবং চার্চকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনলেন। কিন্তু দাসপ্রথা তুলে দিলেন না। দরিদ্র জনসাধারণের ওপর থেকে অত্যাচার উৎপীড়নও কমালেন না। পিটারের পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় ক্যাথারীন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করলেন। পশ্চিমের বিদ্বান ও গুণীদের আহ্বান করে আনতে থাকেন তাঁর কোর্টে। তাঁর আমলেও রাজ্যের সীমানা বেড়ে চলে। প্রজাসাধারণের দারিদ্র্যমোচনের উদ্দেশ্যে তিনি নানা ধরণের আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু স্বার্থান্ধশ্রেণী ও আমলাদের কারসাজীতে প্রায় কোন আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ১৭৭৩ এবং ১৭৭৪ সনে রাশিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ হয়। তা তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি নিজে নানাবিধ কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে আইন ঠিকমত প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না তা তলিয়ে দেখতে পারতেন না। ইতিমধ্যে ১৭৮৯ সনের ফরাসী-বিপ্লব নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্রমেই ফরাসী শক্তি প্রবলপরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। ১৮০০ শতকের মধ্যে ইউরোপের অধিকাংশ স্থান ফরাসীদের দখলে চলে যায়। ১৮১২ সনে ১ম আলেকজাণ্ডার যখন রাশিয়ার জার তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রাশিয়া আক্রমণ করেন। ফিরে যাবার সময় তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে। অধিকাংশ সৈন্য শৈতপ্রবাহে মারা যায়। ১৮২৪ সনে ইউরোপীয় সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে আলেকজাণ্ডার প্যারিস আক্রমণ করেন। নেপোলিয়ন পালিয়ে যান। রাশিয়ার বিজয়ের কয়েক বছরের মধ্যে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে ১৮২০ সনের মধ্যেই, রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। কিন্তু তাতে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা ঘোচে না। জার শাসনের শুরু থেকেই তারা যে ভাবে অত্যাচারিত উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল তা বজায় থাকে। সাধারণ মানুষদের জন্য কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে জারেরা প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮২৫ সনে প্রথম নিকোলাস জার। তাঁর সময় সৈন্যবাহিনীর একটা ছোট অংশ বিদ্রোহ করে। নিকোলাস এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বাড়ান। সেণ্ট পিটার্সবার্গের স্কুল, কলেজ সমূহকে পশ্চিমা ঢঙে গড়ে তোলেন। সারা ইউরোপ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে

থাকে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে। ১৮৩০ সনের মধ্যে রাশিয়ার পশ্চিমানুকরণ সমাপ্ত হয়। তারপরেই ১৮৩২ সনে জেমস লঙ সেণ্ট পিটার্সবার্গে আসেন ছাত্র হিসাবে। এই সময় জার প্রথম আলেকজান্ডার। দ্বিতীয়বার লঙ রাশিয়া আসেন ১৮৬৫ সনে। তখন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার।

জার তাঁর সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজান। কোর্ট কাছারী ও শিক্ষার সংস্কার করেন এবং স্বায়ত্বশাসন কায়েম করেন। এ সব কাজ করতে দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়। ইতিমধ্যে প্রজাসাধারণ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে এবং জারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। আইন পাশ হলেও ঘুষ না পেলে সরকারী কর্মচারীরা কোনপ্রকার সংস্কারে উৎসাহ দেখায় না। চলতে থাকে চরম বিপর্যয় অবস্থা। আঠার শতকের আরম্ভ থেকেই রাশিয়ায় বিপ্লবী সংগঠন গঠিত হতে থাকে। বিপ্লবীদের দমন করার জন্য জারেরা একদিকে নিষ্ঠুর অত্যাচার অন্যদিকে প্রজাসাধারণদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকেন। তাতে কিছু কাজ হয় না। রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন লঙকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ, রাশিয়ার অস্থিরতায় এশিয়া ও ইউরোপের ক্ষতি হবে বলে তিনি মনে করতেন। উন্নত পশ্চিমী সভ্যতা ও খ্রীষ্টান ধর্ম অভিন্ন মনে করায় তাঁর ধারণা হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়ার মিলিত প্রচেষ্টায় এশিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রসার সহজ হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন—জমিতে কৃষকের রায়তী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে; তাতে কৃষক বিদ্রোহের সমাধি রচিত হবে। যে সামাজিক শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাশিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই একই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শোষণ ভারতবর্ষের কৃষককে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। কৃষকরা যাতে সংগ্রামের সামিল না হয় সে জন্যই তিনি ভারতবর্ষের কৃষকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ বা দাবী জানাতে থাকেন। অন্যথায় এখানেও প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিবে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা সম্পর্কে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার অবহিত ছিলেন তাই তিনি নানা ধরণের সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিলেন। জেমস লঙ জারের এই সংস্কারকে স্বাগত জানান। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন এর দ্বারা বড় রকমের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়ানো যাবে। কিন্তু জারেরা অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন ও শোষণের দ্বারা প্রজাসাধারণকে এতই তিক্তবিরক্ত করে রেখেছিলেন যে তারা জারের শাসনকে আর সহ্য করত রাজী ছিল না। রাশিয়ার কৃষকদের মনের অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করে লঙ হতাশ হন। তিনি এদেশের কৃষকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এদেশে বিপ্লবের রণধ্বনির প্রতি

সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে থাকেন। ১৮৬৫ সনেই লঙ কৃষক বিপ্লবের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন রাশিয়ায়। প্রভুত্ব বজায় রাখতে ১৯০৫ সনে বাঁধে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ। তারপর ১৯১৪ সনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সমগ্র রাশিয়া তখন বিপ্লবের বারুদ। ১৯১৭ সনে এই বারুদে আগুন লাগে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ধাক্কায় গোটা রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি পাল্টে যায়। ট্রটস্কী ও লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রাদেশিক রাজ্য দখল করে। ১৯১৮ সনে জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তাঁর পরিবারবর্গকে মেরে ফেলা হয়। ১৯২২ সনের মধ্যে সোভিয়েতে কম্যুনিস্ট সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এসব অনেক পরের ঘটনা এবং আমাদের ধারাবিবরণীর বিষয় বহির্গত ব্যাপার। তবু রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল ও অমিলের নানা দিক লক্ষ্য করতে গিয়ে এক মুহূর্তে এ সব স্মরণ করে নিলাম।

জেমস লঙ তাঁর সময়ে রাশিয়া ও ভারতবর্ষের বহু সমস্যা এক বলে মনে করতেন। ভাষা সমস্যা, কৃষক সমস্যা, সামন্ততান্ত্রিক শাসন, ভূমি সমস্যা, ধর্ম সমস্যা প্রভৃতি ব্যাপারে উভয় দেশের ঐক্যভাব লক্ষ্য করে সমস্যা সমাধানের জন্য একই নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। সে জন্যই তিনি ভূমিদাসপ্রথা রদ ও ভূমিহীনদের জন্য ভূমিদানের ব্যাপারে কৃষক সম্প্রদায়ের মনোভাব কি ছিল তা জানতে ও বুঝতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় রাশিয়ার কৃষকদের যে মনোভাবের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন সেই মনোভাব ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করার ইচ্ছায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পরিণত চিন্তার পাহাড় নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার রাশিয়া এলেন।

এই সময় ইংলণ্ডের বহু পাদরী, বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী রাশিয়ায়। ভারতবর্ষে নেটিভদের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাজ করে লঙের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেরূপ কোন অভিজ্ঞতা ওদেশে অবস্থিত ইংলণ্ডের কোন পাদরীর হয়েছে কি না, তা ব্যক্তিগতভাবে জানার ব্যাপারেও তাঁর লোভ ছিল। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে রাশিয়া আসার জন্য তিনি সৈন্যবাহিনীর অফিসার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষায়তনের শিক্ষক, শিক্ষা-অধিকর্তা, ধর্মযাজকদের সঙ্গে যেমন দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করতে পেরেছিলেন তেমন তাঁর স্বভাবধর্ম তাঁকে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। তিনি কৃষকদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে যে আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন তা মানবপ্রেম। এই মানবপ্রেমের সঙ্গে পরবর্তী কম্যুনিষ্ট বা মার্ক্সীয় দর্শনের কোন মিল নেই। মিল না থাকলেও দারিদ্রের সেবা, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম ;

অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, শোষণ ও মানবতাহীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে প্রেরণা, সে প্রেরণার সঙ্গে পরবর্তী যুগের সর্বহারাদের সংগ্রামের একটা মিল অবশ্যই খুঁজে বের করা সম্ভব।

জেমস লঙ কৃষকদের ভূমি দান করার জন্য, ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য, ও ভূমিদাসপ্রথা রদ করার জন্য দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিকাকে প্রসংশা করেছিলেন। তিনি বলেছেন—"শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে আলোচনার জন্য এক সন্ধ্যায় মিলিত হয়েছিলাম। ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার জনশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের আলোচনা হয়।" ওদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য অনেকেই ছিলেন আতঙ্কিত! লঙও এদেশের শিক্ষাকে উচ্চতরশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। "ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের সঙ্গে-সঙ্গে রাশিয়ায় কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হতে আরম্ভ করেছে। কৃষকদের শিক্ষা তথা জ্ঞানার্জনের স্পৃহা প্রমাণ করে যে প্রত্যেক দেশের সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত নৈতিক ও ধর্মীয় মঙ্গল"।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে জেমস লঙ ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতবর্ষের কৃষক, দেশীয় খ্রীষ্টান, দেশীয় সাহিত্য, মাতৃভাষার মারফৎ শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করার সময় তিনি বারে বারে রাশিয়ার সার্ফদের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন,—"কবে ভারতবর্ষের কৃষকদের এ সুযোগ আসবে?" সার্ফদের মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি "Russia, Central Asia & British India" শীর্ষক পুস্তিকায় বলেছেন—"রাশিয়ার সার্ফদের মুক্তি, এশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিৎ কাঁপিয়ে দিয়েছে।" তিনি বলেছেন—"সেণ্ট পিটার্সবার্গের বহু লোক নীলদর্পণ মামলার বিবরণ জানেন। অনেকেই এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন"। তাঁর "Village Communities in India and Russia" প্রবন্ধে রাশিয়া ও ভারতের কৃষকদের তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেছেন। "Russian Proverbs illustrating Social Condition of the Peasants and Women in Russia"-তেও তুলনামূলক আলোচনা দেখতে পাই।

তিনি বলেছেন, "সুদীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া ও ভারতবর্ষ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার কুফলে জর্জরিত।" এর অবসান কি তিনি চেয়েছিলেন? হাঁ।

নেটিভদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম: ভারতবর্ষের সরকারও কিছু কিছু সংস্কারের সামিল হতে থাকেন। যে সব সংস্কারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বাঙলার জন্য ছোটলাট নিয়োগের মধ্যে

তিনি শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ দেখতে পান। এই বিকেন্দ্রীকরণ আরও সুদূরপ্রসারী করার দিকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। কারণ, "মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত সমাবেশ যেমন সুস্থস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, তেমন কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনও গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যকে নষ্ট করে।" একথা আজকাল অনেকেই বুঝতে পারছেন। তাই দিকে দিকে বিকেন্দ্রীকরণের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে। জেমস লঙ বললেন, "গ্রামকে সর্বনিম্ন ইউনিট হিসাবে গণ্য করে সংস্কার কাম্য। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসক রায়তদের মূক জন্তুর মত দেখতে অভ্যস্ত। মুসলমান যুগে এদেশের গ্রাম্যসমাজ এত বিপর্যস্ত হয় নি। ইংরেজ শাসনে গ্রাম অবহেলিত হতে আরম্ভ করে। অথচ ইউরোপের সরকার সমূহ রায়তদের জমিস্বত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়ম, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে আইনের সাহায্যে রায়তী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত দুইশতক রাশিয়া স্বেচ্ছাচারী শাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সে অবস্থারও পরিবর্তন হতে চলেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে?" নতুন জমিদারদের অব্যবস্থায় জমি খণ্ডিত হয়েছে। "খণ্ড খণ্ড জমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের এবং শ্রমিকদের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে। কারিগরী বিজ্ঞানের উন্নতিতে জনগণের মধ্যে আলস্য বৃদ্ধি পাবে।" এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, লঙের মতে—"হিন্দু যৌথ পরিবার। রাশিয়ায় অবশ্য গ্রাম্য মানুষদের যৌথ মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত চাষ ও মুনাফার সুযোগ আছে। এখানে পরিবারের প্রধানেরা গ্রাম প্রধানকে তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত প্রধান শাস্তিদান ও জরিমানা ধার্য করার অধিকারী। প্রয়োজনে শারীরিক শাস্তিও দিতে পারেন। একটি গ্রাম্য বিচারালয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। স্ত্রীর প্রতি অশোভন আচরণের জন্য একজন কৃষককে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। রাশিয়ার এই গ্রাম্য বিচারালয় অনেকটা হিন্দুদের ব্রাহ্মণ শাসিত পঞ্চায়েতের মত শাস্তির আদেশ কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে।" তিনি আরো লিখেছেন—"মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য ২৫ বছর ধরে ইংলণ্ড আফগানিস্থানকে দখলে রাখার চেষ্টা করেছে। ফলে ইংলণ্ডের ত্রিশহাজার সৈন্য নিহত হয়েছে, পনের মিলিয়ন স্টার্লিং বিনষ্ট হয়েছে, উপজাতীয়দের মধ্যে ইংলণ্ডের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে এবং ভারতের জোয়ানেরা অনুভব করেছে যে ইংরেজ আর অপরাজেয় নয়।"[১]

শুধু ইংরেজ কেন, আফগানিস্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশ্বের নানা শক্তি এখন অবধি সমান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দেশটি পাহাড়-পর্বত অধ্যুষিত এবং

লঙের ইংরেজী রচনা ও বিবৃতি থেকে গৃহীত।

ইরাণ, রাশিয়া, পাকিস্তান ও চীন পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষের প্রতিবেশী। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুকুশ পর্বত রাজ্যটিকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করেছে। পাহাড় এলাকায় যাযাবরদের বাস। সারাদেশের কুত্রাপি রেলপথ নেই। একমাত্র পরিবহন বাস ও মোটরগাড়ী। রাস্তা চমৎকার। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ সনে আফগানিস্থান জয় করে খাইবারপাশ দিয়ে ভারতবর্ষের অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। বৃহৎ শক্তিগুলো সুদীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে চলেছে এ স্থানটিকে নিজ নিজ কবজায় রাখতে। তা নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহও লেগে আছে। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ সরকার আফগান যুদ্ধ নিয়ে বার বার বিব্রত হয়েছে। লঙ সে কথাই উল্লেখ করেছেন এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ করে অন্যভাবে শান্তি স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে ইউরোপের বণিক-সভ্যতার বিকাশে ইউরোপে চার্চের বিকাশ অনিবার্য ছিল। প্রোটেস্টাণ্ট দেশসমূহে বণিক-সভ্যতার প্রসার হয়েছে একভাবে। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভৃতি কলোনী সমূহে বণিক-সভ্যতার প্রসার হয়েছে অন্যভাবে। এখানে বণিক সভ্যতার বিকাশে চার্চের স্থান গৌণ। অনেকস্থলে চার্চ ও মিশনারী পাদরীরা বণিক বিরোধী। তাঁরা বণিকদের অত্যাচার, উৎপীড়নের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বণিকদের সংযত করতেও চেষ্টা করেছেন। তাতে অনেকক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজও হয়েছে।

পাদরী ও অন্যান্য মানবতাবাদী ইউরোপীয়রা কৃষক ও শ্রমিকদের কিছু পাইয়ে দেবার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। কারণ, কিছু পেলে দেশীয়দের বিপ্লবী চেতনা ঝিমিয়ে পড়বে। আর বিপ্লব বা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। এই চিন্তা থেকেই লঙ জার আলেকজাণ্ডারের নীতিকে সমর্থন করেন। কিন্তু তাতে রাশিয়ার বিপ্লব যে থমকে থাকে নি তা সকলেরই জানা। বাস্তবমুখী হতে গিয়েও লঙের মত পাদরী সাহেবেরা এমন একস্থানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় চেতনা ও বোধ নিয়ে এগোতে গিয়ে বাস্তবকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অনুধাবন করতে চান নি অথবা সক্ষম হন নি।

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আছে বণিকতন্ত্রের বিরোধ। নীতির দিক থেকে বণিক সভ্যতা সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা থেকে উন্নত। পাদরী লঙ ইউরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট মানবতা ও বণিক সভ্যতার মূল্যবোধকে এক মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে যখন কাজে নামলেন তখন দেখলেন ভারতের বণিকেরা উন্নত বণিক সভ্যতার বদলে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি বজায় রাখতে উৎসাহী। তাঁর ভাবনা ও বাস্তবের সঙ্গে যে অমিল দেখা দিল তা থেকেই বিরোধের সুর বেজে উঠল।

সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ফ্রি-ট্রেডারদের সঙ্গে উন্নত বণিকসভ্যতার আদর্শে বিশ্বাসীদের মতানৈক্য বেড়ে চলল।

আমেরিকার দাসপ্রথা ঃ মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যখন ভূমিদাসপ্রথা রদ করেন। তার কিছু আগে আমেরিকার দাসপ্রথা অবলুপ্ত হয়। আমেরিকা বলতে বুঝি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দুটি দেশ। বহু বৎসর আগে দেশ দুটি পৃথক ছিল। উত্তর আমেরিকা আবিস্কৃত হলে ইউরোপীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য আসে। নতুন দেশকে গ্রাস করার জন্য চারদিকের লোক ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। প্রথমে আসে স্পেনের অধিবাসী, ১৫৬৫ সনে। ১৬০০ শতকে গড়ে ওঠে ইংলণ্ডের কলোনী। ফরাসীরা কানাডা ও মিসিসিপি দাবী করে বসে। ডাচেরা হাডসন নদীর উপকুলস্থ জমি দখল করে নেয়। ফরাসী ও স্পেনীয়রা মূলত বাণিজ্য ব্যাপারে উৎসাহী। জমি দখলে রাখার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়ে ইংরেজরা। ১৭৩৩ সনের মধ্যে তারা তেরটি কলোনী প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে সাদা মানুষেরা কালো আদমীদের জমিজমা কেড়ে নেয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করে। সাদা-কালোর সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৭০০ শতকের মধ্যে আমেরিকার পূর্বাঞ্চল হচ্ছে ইংরেজ শহর। এই শহরের অধিকাংশ বাসিন্দার চামড়া সাদা। ইংরেজরা বিনাপয়সায় বা সস্তায় সাদা মানুষদের জমি দিতে থাকে। ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, আইরিশ, স্কচ, জার্মান ও সুইডিস প্রভৃতি ভূমিসন্তানদের দূরে ঠেলে দেয়। এ দেশের সমৃদ্ধির কথা ছড়িয়ে পড়লে আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের গরীবলোকেরাও এখানে চলে আসতে উৎসাহ দেখাতে থাকে। কিন্তু তারা পথযাত্রার খরচা সংগ্রহ করতে পারে না। তাই বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের বিক্রী করে ও দাসত্ব স্বীকার করে এখানে চলে-আসতে থাকে। প্রভুরা তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে—পরিবর্তে তারা প্রভুদের হুকুম অনুযায়ী চলতে রাজী হয়। দাসদের সকলেই স্ব-ইচ্ছায় এ কাজ করে না। বহু লোককে বাধ্য করা হয় দাস জীবনযাপন করতে। এমন একটা সময় উপস্থিত হয় যখন দাসপ্রথা একটা অমানবিক ঘৃণ্য প্রথায় পর্যবেশিত হয়।

দাসপ্রথা বিধিবদ্ধ হবার আগে নবাস্কৃত অঞ্চলটি তিনভাগে বিভক্ত হয়—নিউইংলণ্ড, মধ্যকলোনী ও দক্ষিণকলোনী। প্রত্যেকটি অঞ্চল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, আদবকায়দা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে থাকে। সকলেরই আয়ের পথ কৃষিকাজ। প্রভুরা বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করে। দাসেরা দূরে অপরিচ্ছন্ন কুটিরে দলবদ্ধভাবে

বসবাস করে। তাদের অধিকাংশ সময় ব্যায়িত হয় মাঠের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে। কিছু দাস প্রভুদের গৃহভৃত্য। শুধু দাস আর প্রভুদের দিয়ে রাজ্য চলে না। তখন কামার, কুমার, ছুতার, কাঠুরিয়া, মিস্ত্রী, চর্মকার, তাঁতি শ্রেণীয়দেরও দরকার হয় সামাজিক ভাবে বসবাস করতে। এই শ্রেণীয় লোকদেরও নানাস্থান থেকে জড়ো করা হতে থাকে। প্রভুরা অসম্ভব বিত্তশালী। তাদের আসবাব, পোষাক-পরিচ্ছদাদি আসত খাস বিলাত থেকে। নিউ ইংলণ্ডের জমি তত উর্বর ছিল না। সেখানকার অধিবাসীরা স্থানীয় উৎপাদনের ওপরই নির্ভর করত, বিলাতী দ্রব্যের প্রতি তত আগ্রহ দেখাত না। উত্তরাঞ্চলের মুনাফা আসত সমুদ্র থেকে। মধ্যকলোনীর লোকেরা সকলকে রুটির জোগান দিত। এখানকার ব্যবসায়ীরা আসত বোস্টন, নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া থেকে। তাদের জীবন-যাপন প্রণালী ছিল সম্রাটের মত। শিক্ষার ব্যাপারে এ স্থান উন্নত ছিল। নিউইংলণ্ডে আমেরিকার প্রথম পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলে শুধু ছেলেরা পড়ত। ছেলেমেয়ে একত্রে dame স্কুলে পড়তে পারত। দক্ষিণের ছেলেরা ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদের কাছেও লেখাপড়া শিখত। এখান থেকে কিছু ছেলে নিউ ইংলণ্ডের স্কুলেও যেত পড়াশুনা করতে। সকলকেই চার্চে যেতে হত। প্রার্থনা ও কম্যুনিটি জীবন-যাপনের ব্যাপারে চার্চের ব্যবহার হতে থাকে। এই চার্চের প্রাঙ্গণে আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলোর অবকাশ ছিল। ইতিমধ্যে নিউইংলণ্ডের চার্চ আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলো প্রভৃতি বন্ধ করে দেয়। চার্চে নীরবতা পালন অবশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। স্থানীয় লোকদের এই অসন্তোষের মধ্যে আরম্ভ হয় যুদ্ধ—স্পেন, ফরাসী ও ইংরেজদের সঙ্গে। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রত্যেকের পক্ষে থেকেই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৭৬৩ সনের মধ্যে ফরাসীরা পর্যুদস্ত। ইংরেজরা প্রায় সমস্ত ফরাসী অঞ্চল দখল করে নেয়। যুদ্ধের খরচ সামাল দিতে ইংরেজ কলোনী-বাসীদের ওপর প্রচুর করের বোঝা চাপায়। তা নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। প্রভুরা এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য হেন কাজ নেই যা করে না। তখন সাধারণমানুষ রাজার আদেশ অমান্য করতে আরম্ভ করে। ১৭৬৫ সনের মধ্যে এই আন্দোলন তীব্র হয়। লেক্সিংটন ও কনকার্ড যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হয়। ১৭৮১ সনে যুদ্ধে বিজয়ী হবার পর ১৭৮৩ সনে গ্রেটব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নেয়। ১৮১২ সনে আবার যুদ্ধ হয়। পুনরায় যুদ্ধ হয় ১৮৪৬-৪৮ সনে। এই মেক্সিকান যুদ্ধের পর আমেরিকা যুক্তরাজ্যে স্থিতিশীলতা আসে।

তবু দাসপ্রথা অবলুপ্ত হয় না। দাসপ্রথা অবলুপ্ত করার জন্য আন্দোলন তখন দুর্বার হয়। ১৮৬০ সনে আব্রাহাম লিংকন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সভাপতি। এই সময় সিভিল ওয়ার আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সনে যুদ্ধের অবসানে তিনি আমেরিকায় দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটান।[১]

জেমস লঙ সুপ্রীম কোর্টে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে আমেরিকার দাসপ্রথার অবলুপ্তি এবং রাশিয়ার সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্তির কথা ছিল। তিনি বলেছিলেন, দেশে দেশে যখন ভূমিদাসদের অন্যায় উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করা হচ্ছে তখন ভারতবর্ষের কৃষকেরা কেন নীলকরাদির শোষণে ক্লিষ্ট হবে? কিন্তু তাঁর এই মানবতাবাদী আবেদনের পিছনে অনেকে রাজনীতির গন্ধ পেয়েছিল।

জেমস লঙ সার্বিক পরিবর্তনে রাজী ছিলেন না। তিনি পুরাতন পন্থাকে অটুট রেখে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ সংস্কারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের একটা ভূমিকা থাকে। তারা সামাজিক নঙ্গরের কাজ করে। এবং কিছুদিনের জন্য বিপ্লবকেও ঠেকা দিতে পারে। নানাকারণে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সাধারণত বিপ্লব তখনই অনুষ্ঠিত হয় যখন সাধারণ মানুষ শাসকদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় বিপ্লবের পর হয় প্রতিবিপ্লব। আমেরিকায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ, উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ কলোনী সমূহ ইংলণ্ডের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। ফরাসী-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজপরিবারের অপশাসনের বিরুদ্ধে। সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে জেমস লঙ এসব জানতেন। ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা ইংরেজ শাসনে প্রায় আমেরিকার নিগ্রো এবং রাশিয়ার সার্ফদের মতই ছিল। এটা মনে করে তিনি কৃষকদের হয়ে বণিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তবু ধর্মীয় ব্যাপার থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। কারণ, তাঁর মানসিক গড়নই ছিল ধর্মীয় বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা। তিনি রাশিয়ায় serf emancipation বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় ভারতবর্ষের কৃষকদের সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন তা শুনে সেখানকার অনেকেই তাঁকে বলেছে—"বাঙলা দেশের কৃষকদের অবস্থা অনেকটাই রাশিয়ার ভূমিদাসদের ন্যায় দুঃখজনক"। তিনি রাশিয়া ও বাঙলার কৃষকদের ওপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বেঙ্গল স্যোসাল সাইন্স এসোসিয়েশনে। এই আলোচনায় তিনি বলেছিলেন—'ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার

সামাজিক সমস্যার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এ সাদৃশ্য হল গ্রামীণ জীবন ও সমাজের সাদৃশ্য।" প্রশাসনের ব্যাপারে দ্বিতীয় জার আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে কর্ণওয়ালিশের পার্থক্য তুলে ধরে তিনি বললেন, "লর্ড কর্ণওয়ালিশ জার আলেকজাণ্ডারের মত উপর থেকে নীচে নামার নীতি গ্রহণ করেন নি। বিগত দুই-শতাব্দী রাশিয়া স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে ছিল, এখন তার অবসান হতে চলেছে। স্বেচ্ছাচারী রাজার রাজত্বে বাস করেও রাশিয়ার কোন কোন অংশে গ্রাম স্বায়ত্বশাসন সংস্থা নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে। হিন্দু যৌথ-পরিবারের মত রাশিয়ার ঐ সব গ্রামে সম্পত্তির সমবণ্টন হয়। অবশ্য যৌথ গ্রামীণ মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত চাষ ও ব্যক্তিগত মুনাফারও সুযোগ রয়েছে।" তিনি বললেন,—"ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সমবণ্টনের কুফল অনুভূত হয়েছে, বাঙলাদেশে এ প্রথার চরম কুফল একটি আমগাছের ষোলজন শরিক।"[১]

ভারতবর্ষের শেষের দিনগুলি ঃ লঙের জীবনযাত্রায় যে কর্মনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তা সেবাধর্মে অনেকটা সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা সত্ত্বেও শেষ অবধি তাঁর বহু কাজ নিষ্কাম সেবাধর্মে রূপ নিয়েছিল। সমাজ-বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হলেও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারেও লঙ সংস্কারক। ঠিক স্রষ্টা নন। তিনি সৃষ্টিশীল কোন সাহিত্য রচনা করেন নি। রচনা করেছেন গদ্যসাহিত্য—প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র। এবং প্রস্তুত করেছেন এমন সব গ্রন্থাদি যা পরবর্তীকালের সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক গবেষক ও সাহিত্যরসিকদের প্রেরণা জুগিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে।

এই সময় তিনি রচনা করেছেন প্রবাদমালা। লিখেছেন—"Scripture Truth in Oriental Dress", "Central Asia and British India", Selections from Unpublished Records of Government 1748-67", Peeps into Social Life of Calcutta, a century ago", "Calcutta and Bombay in their Social Aspects", "The Social Condition of the Mohammadans of Bengal", "Village Communities in Russia and India", "A Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets forwarded by Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867, to which is added a list of Vernacular works sent from Agra Presidency and a list of Vernacular works published in 1865 in the North Western Provinces". কাজ করতে করতে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর

১ জেমস লঙের ইংরেজী রচনা থেকে সংগৃহীত।

আমলের সামাজিক আন্দোলন প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি এই আন্দোলন নিম্নবর্ণ-মুখী করতে চেষ্টা করলেন। লক্ষ্য করলেন—জাতিভেদের মত সর্বনাশা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা আলোচনা কম। জাতিভেদের অসঙ্গতির অবসান যে একান্ত প্রয়োজন এবং গণশক্তির অভ্যুত্থানেই যে জাতির মঙ্গল একথা কেউ বলছেন না। হিন্দুধর্মীয় আন্দোলন করতে এসে সর্বপ্রথম জাতিভেদের দুঃসহ পরিণামের কথা ঘোষণা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রভৃতি বিবেকানন্দের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। স্বামীজী দেখিয়েছেন কর্মগত জাতিভেদ যখন জন্মগত জাতিভেদে রূপ নেয় তখন সমগ্র সমাজে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা দেখা দিতে থাকে। স্বামী-বিবেকানন্দের আগে স্থির দৃঢ়তার সঙ্গে একথা আর কেউ তুলে ধরেন নি। যদিও সমাজ কল্যাণ, প্রত্যয় ও সংস্কারের অন্যান্য দিকে যেমন, সতী, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বহুভাবে বহু আন্দোলনের সামিল হয়েছেন।

রামমোহন থেকে সমাজ আন্দোলনের যে ধারা তা বহুমুখী—একদিকে ভারতীয় চেতনা অন্যদিকে ইউরোপীয় সাধনা, এ দুয়ের প্রভাবে যে মনন গড়ে ওঠে সেখানে বাঙালী চেতনা জাগাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ও লঙ যে সব কাজ করেছেন তারই প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে জানার ও বোঝার জন্য ডাক দিলেন। পরবর্তী কালে কেউ কেউ বঙ্কিমের এই আহ্বানের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সঠিক পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশ অনুযায়ী বঙ্কিমের বিচার করলে যে-কেউ দেখতে পাবেন বঙ্কিমের মানসিকতায় সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে জানার ব্যাপারে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের দানের কথাও ভুললে চলবে না। সংস্থাটি গঠিত হবার কয়েকমাস আগে লঙ বিলাত থেকে ফিরে আসেন। ১৮৬৬ সনে গঠিত হলেও প্রারম্ভিক সভার দ্বার উদ্ঘাটন হয় ১৮৬৭ সনে। তখন শিক্ষা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন লঙ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এখানে "On the Origin of Hindu Festival" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। আলোচনায় অংশ নেন জেমস লঙ, মিঃ উড্র প্রভৃতি। তার আগে এ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁর বিষয় ছিল "The Festivals of the Hindus". এখানেও আলোচনায় অংশ নেন জেমস লঙ ও অন্যান্য। ১৮৭০ সনে বঙ্কিম পুনরায় এখানে বক্তৃতা দেন—"A Popular Literature of Bengal" এই শিরোনামে।

স্মরণীয়, ১৮৬৬ সনে মিস কার্পেন্টার এদেশে এসেছিলেন নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের সূচনা করবার ইচ্ছা নিয়ে। নর্মাল স্কুলের ব্যাপারে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন। ডি. পি. আই. অ্যাটকিনসন সাহেব বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখলেন—"প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, মিস কার্পেণ্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন, তিনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হইতে ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক"[১] বেথুন বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিস কার্পেণ্টারের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার জন্য বেথুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ই নতুন একটা সমাজ-বিজ্ঞান সংস্থা গড়ার আয়োজন আরম্ভ হয়। উদ্যোগ নেন জেমস লঙ। অনুপ্রেরণা জোগান মিস কার্পেণ্টার এবং সাহায্য করেন দেশীয় প্রধানরা। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, রেভারেণ্ড লালবিহারী প্রভৃতিও এই সংস্থার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন। কৃষ্ণমোহন ১৮৭০ সনে "On the Tarnsliteration of Indian names of Persons and Places" এবং ১৮৭৮ সনে "The Origin and Development of Caste" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের আগে জেমস লঙের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছিল যে ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব সেখানেও কৃষ্ণমোহন সাহিত্য ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অর্থাৎ যেখানে জেমস লঙ সেখানে এঁরা আছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে লঙের বিরোধ ও মতানৈক্য হয়েছে। কিন্তু তাতে একসঙ্গে দেশগঠনের কাজ করতে কোন অসুবিধা হয় নি। এটাই হচ্ছে গতশতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত চিন্তারও অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইতিপূর্বে ১৮৪৩ সনে জর্জ টমসনকে সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্রকে সম্পাদক করে যে "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" গঠিত হয় তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানেও লঙের যোগ। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বহু অনুষ্ঠানেও লঙের উপস্থিতি দেখতে পাই। ১৮৬১ সনে যে "পশুক্লেশ নিবারণ সভা" গঠিত হয় সেখানেও লঙ উৎসাহী সদস্য। ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয় উইলিয়ম কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টি-কালচারাল সোসাইটির অনুবাদক সমিতির দ্বারা। এ গ্রন্থ সম্পাদনার ভার ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের ওপর। প্যারীচাঁদ মিত্র লঙের সহায়তায় এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তিনি সমাজ বিজ্ঞান পরিষদে ১৮৭৮ সনে যে বিষয়ে বক্তৃতা দেন তা ছিল—"Social Life of the Aryans". বঙ্কিমচন্দ্র পপুলার লিটারেচারের

১। বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা।

বক্তৃতায় বলেছিলেন—"আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে উৎসাহী নহেন, যে তীব্রবুদ্ধি, তেজস্বী বাঙালী যুবক ঠিক ইংরেজের মত ইংরেজী ভাষা কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনকৃতি মাত্র।" (পাঁচকড়ি অনূদিত, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)। এ সব কাজের সঙ্গে আরও নানাদিকে নানা ধরণের কাজে লঙের যোগ। শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারকল্পে ১৮৫৪ সনে বিভিন্ন দেশীয়প্রধান ওলঙের চেষ্টায় যে Industrial School of Art প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে, ১৮৬৩-৬৪ সনে তা সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। লণ্ডন থেকে ফিরে লঙ তা জানতে পারেন। তাছাড়া, ১৮৫৭ সনের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রথা ১৮৫৯ সনে স্যার হ্যালিডে তুলে দিয়েছিলেন। স্যার গ্রান্টস ১৮৬০-৬১ সনে তা চালু করেছিলেন এবং গ্রে এ ব্যবস্থাকে ব্যাপক করলেন। গ্রের সিদ্ধান্তও লঙ জানতে পারেন লণ্ডন থেকে ফিরে। তৎকালীন সমাজ জীবনে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৮৬১ সনে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করার যে প্রস্তাব লঙ এদেশে থাকতে পেশ করেছিলেন তা গঠিত হয় ১৮৬২ সনে লঙের অবর্তমানে। ফিরে এসে এ সব পরিবর্তন দেখে একদিকে তৃপ্তি পান অন্যদিকে নিজের ঘরের ভ্যাপসা হাওয়ায় নিজেই অস্থির হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে মারা যান চার্চ মিশন সোসাইটির সম্পাদক ডঃ জি. ই. এল. কটন। তিনি নীলদর্পণ মামলায় লঙের জামিনদার হয়েছিলেন এবং লঙের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কটনের মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর পর ১৮৬৬-৬৭ সনে হয় উড়িষ্যায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে ভারতসরকার ও বাঙলাসরকারের মধ্যে চিঠি চালাচালি চলতে থাকে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে ছোটলাট বীডন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা সমালোচিত হতে থাকেন। তাঁকে সমর্থন করেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। লালবিহারীর সমর্থন পেয়ে বীডন তাঁর ওপর খুশি হয়েছিলেন। এই খুশির পুরস্কার হিসাবে তিনি লালবিহারীকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে নিয়ে আসেন। প্রথমে প্রধান-শিক্ষক, তারপর অধ্যাপক। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের পর বিহার ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনতাকে সাহায্য করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা চলতে থাকে। গঠিত হয় ফ্যামিন কমিশন।[১] লঙ এই সময় সরকারী উদ্যমের বা রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রেখে নানা ধরণের কাজ করতে থাকেন। দেশীয় সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তার জন্য অনেকেই লঙকে ভয়

১। C. B. Buckland op. cit.

করতে থাকেন। লঙের জনপ্রিয়তা এবং মুক্তবুদ্ধি শোষক সম্প্রদায়ের ভয়ের কারণ হয়েছিল। লঙকে অস্বীকার করতে না পেরে তাঁকে দূরে দূরে রাখার চেষ্টা চলতে থাকে। সরকার, স্বদেশীয় এবং এদেশীয় প্রভুভক্তদের নিকট থেকে এ ধরণের অস্বস্তিকর ব্যবহার পেতে থাকার দরুন এই সময়ে তিনি বিরত বোধ করতে থাকেন। ফলে নিজে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। কর্তাদের কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে খুব বেশী মাথা ঘামাতেন না। তথাপি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করে পারেন না।

১৮৬৭ সনে আবার যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন সমুদ্রপথে তাঁর স্ত্রী মারা যান। ১৮৬৮ সনে একা কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সময় বিহারের চম্পারণে নীল আন্দোলন আরম্ভ হয়। সরকার এবার নীলকরদের বিরুদ্ধে কঠোর হলেন। নীলকরদের পরিস্কার জানিয়ে দিলেন—কৃষকদের শোষণ করা চলবে না। বর্দ্ধিত হারে বেতন ও আইনমাফিক কাজ দিতে হবে। অন্যথায় ফ্যাক্টরী বন্ধ করতে হবে।[১] লঙ সরকারের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে লঙের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। এ দেশে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় লণ্ডনে ফিরে যাবার কথা ভাবলেন। যাবার আগে কাশ্মীর, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে গেলেন। সর্বত্রই পেলেন অভূতপূর্ব সম্বর্দ্ধনা ও ভালবাসা।

লঙ চলে যাবার কথা জানতে পেরে ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব তাঁকে একটি মানপত্র দিয়ে বলে..."It is difficult, Sir, to estimate the amount of good you have conferred on this country by lending your powerful aid towards the improvement of our Vernacular literature. Your intimate knowledge of Bengali language, your lifelong labours to raise its status, your admirable and exhaustive collection of proverbs spoken by ryots and women of Bengal, embodying their wisdom and practical good sense, have brought before the European world a knowledge of our inner life which the most elaborate work of India would fail to convey"[২] এর উত্তরে লঙ বললেন—"A change is coming over Bengal; the Bengali language is happily dropping the old Sanskrit style and assuming a national ideomatic form."

বাঙলাগদ্যের ষ্টাইল কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সে বিষয়েও কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করেন। তিনি প্রাচীন গদ্য ও তাঁর সময়ের কিছু বাঙলাগদ্যের উদাহরণ তুলে দেখান—প্রথমযুগে যতিচিহ্ন ঠিকমত দেয়া হত না। বাঙলাগদ্যে ইংরেজীর মত যতিচিহ্নের ব্যবহার রেভারেন্ড ইউস্টেস, কেরী, ইয়েটসপ্রভৃতির পরামর্শে ১৮১৮ থেকে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত নীতিকথা ২য় ভাগ পুস্তকে প্রবর্তন করেন। তারপর থেকে আলাল ও হুতোমের আগমনে বাঙলাভাষা নতুন জীবন পেতে বসেছে। ঠাকুরপুকুরের গ্রামবাসীরাও তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। উত্তরে বলেন, "অস্বাভাবিক পরিশ্রম ও মনের পীড়ণ তাঁকে শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলেছে। চিকিৎসকের পরামর্শ—বিশ্রাম নিন। এ দেশে থেকে বিশ্রাম নেয়া সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে তাই স্বদেশে যেতে চাইছি। সুস্থ হলে আবার ফিরে আসতে চেষ্টা করব। তবে আমি যেখানে থাকি সেখানে বসেই এতদ্দেশীয়দের কথা ভাববো। তাঁদের সুখদুঃখের অংশী হবো।" কলকাতাবাসী জেমস লঙের সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকেন। কয়েক স্থানে সম্বর্দ্ধনাও দেয়া হয়। সর্বত্রই বললেন, 'যখন যেথায় যেভাবে থাকি যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন এদেশবাসীর কথা ভুলবো না।' কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে একটা বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়াভাবে তা দেয়া যায় না। সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখলেন "...How we wished we had an opportunity to organise a mass demonstration to show our respect and gratefulness to him and bid him 'good bye'. But this opportunity is not available for his decesion to leave the soil of the country is sudden. Rev. Long has taught us a lesson to sustain faith in Englishmen. Whenever we shall have occasion to see our rice fields overflowing with crops, our cultivators with their family members enjoying hearty meals, happy and contended, we will gratefully remember this Englishman Rev. James Long." এই পত্রিকা আরেকটি প্রবন্ধে লিখলেন—"For long thrity years Rev. James Long had not a moment at his disposal when he did not think of our welfare. He loved us just like brothers, he took interest in our progress in the way our parents do. We do not know how to adequately acknowledge our debts to him."

যদিও অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, সময়াভাবে লঙকে নাগরিকদের সম্বর্দ্ধনা দেয়া যায় না, তবু এ কথা কতটা ঠিক তা বিবেচনার বিষয়। লঙ এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার কথা অন্তত এক-দেড়মাস আগেই ঘোষণা করেছিলেন। একদিকে

স্বাস্থ্যের অবনতি, অন্যদিকে ঠাকুরপুকুর ও যাজকদের সঙ্গে মতানৈক্য তাঁকে অশান্ত করে তুলেছিল। কিন্তু সাধারণমানুষ সর্বদাই তাঁর অনুগত ছিল। চার্চ অব এপিফানি ১৯৭৮ খ্রীষ্টমাস স্মরণিকায় প্রকাশিত—"The villagers with fifty signatories on 12.3.1872 express their gratitude for the aid Rev. James Long had given with heart, word and deed for the welfare of Bengal forsaking his own country kindred and friends'. In Bengal, what physical and mental pain and shame you had to endure, a thousand tongues could not fully tell; you accepted even imprisonment in order to rescue defenceless ryots from cruel hands of their oppressors. Even at time of severe suffering the welfare of Bengal was not for a moment banished from your thoughts. To bring about the prosperity and happiness of the Church at Thakurpukur and the adjoining districts, how much suffering both of mind and body have you not endured, and what great expense have you not incurred? On this account we affirm with one voice that your name must never perish from this place". জনগনের ইচ্ছা আর কর্তাদের ইচ্ছা কখনো অভিন্ন নয়। জনগণ চাইলেও চার্চের কর্তাব্যক্তিরা লঙকে তাঁর স্বমর্যাদায় ঠাকুরপুকুর চার্চেও থাকতে দেন নি। যে কারণে ঠাকুরপুকুর চার্চে মর্যাদা দেয়া হয় না সেই কারণেই নাগরিকদের তরফ থেকেও সম্বর্ধনা জানানো হয় না, এটা যদি কেউ অনুমান করে তবে তা কি খুব অসঙ্গত হবে? গ্রামবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে লঙ বলেছিলেন—"I feel pain at leaving places which will ever be to memory dear, associated with days, the happiest of my life, spent, amid village scenes and village people but everything passes away, it is only Christ our great High Priest who ever liveth. I have ever aimed there not to do anything for the natives which they could do for themselves, and in every practicable case to give them the lead. I rejoice to see advance made towards having a Native Church independent of European money, with Native Pastor—a Christian-Mandal, or Grampurahit at its head."

১৮৭২ সনের ২১ শে মার্চ জেমস লঙ এদেশ ছেড়ে চলে যান। তিনি যখন গিয়ে জাহাজে উঠলেন তখন বিরাট জনসমুদ্র জাহাজঘাটে উপস্থিত। এতদ্দেশীয়দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। দর্শনার্থীরাও কাঁদতে থাকেন। তবু বাক্‌রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে

আমারও কষ্ট হচ্ছে। আমার দেহ চলে গেলেও মনটা এখানেই পড়ে থাকবে। যতদিন বাঁচবো এ দেশবাসীকে ভুলবো না। তাঁদের নিষ্ঠা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ভোলা যায় না। চিরদিন এ দেশ ও এ দেশবাসীকে স্মরণে রাখবো"।

লঙ এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার ১০৬ বছর পরে ১৯৭৮ সনে বেহালার অধিবাসীরা তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। তাঁরা আরো কিছু করতে নাকি ইচ্ছুক। বেটার লেট দ্যান নেভার।

এখন লঙের লণ্ডন বাসের ওপর কিছু আলোচনা করে আমরা চলে যাব পরবর্তী অধ্যায়ে।

১৮৭২—৮৭

লণ্ডনের চিকিৎসকদের চিকিৎসায় অনেকটা সুস্থ হলে লঙ পুনরায় চলে যান রাশিয়ায়। অসুস্থ অবস্থায়ও চুপ করে বসেছিলেন না। গ্রন্থ, প্রবন্ধাদি রচনা করে যাচ্ছিলেন। পুরাতন রচনাদি সংস্কার করে নতুন বই প্রকাশ করছিলেন। তাছাড়া আবার রাশিয়া গিয়ে প্রায় পনেরমাস কাটান। রাশিয়া থেকে ফিরে রাশিয়া ও ভারতবর্ষের ওপর তুলনামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন।

গ্রন্থাদি রচনা ও রাশিয়া ভ্রমণ ছাড়া রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, সোস্যাল সাইন্স এসোসিয়েশন, ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স, ফোকোলার সোসাইটি, অ্যাবওরিজিনস প্রোটেকশন সোসাইটি, ইণ্ডিয়া রিফর্ম এসোসিয়েশন প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ, নানা সভা-সমিতিতে যোগদান ও প্রাচ্যদেশ সম্পর্কিত বিবিধ কাজ করতে থাকেন। তাঁর এইসব কাজের জন্য তিনি প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত হিসাবেও সুখ্যাতি পান। প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে প্রাচ্যের ধর্ম, প্রাচ্যের সমাজ—ব্যবস্থা, প্রাচ্যের প্রবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রবাদ-আদির তুলনামূলক আলোচনায় ভুয়সী প্রসংশা অর্জন করেন। যে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Bengal Peasant Boys, The Eastern Questions in its Anglo-Indian Aspects, Oriental Proverbs in their Relation to Folklore, History, Sociology with Suggestions for their Collections Interpretations etc., Eastern Proverbs and Emblems Illustrating Old Truth, Proverbs : English and Celtic with their Eastern Relations (এটি লণ্ডন ফোকলোর সোসাইটিতে পঠিত হয় এবং *Folklore Record*, Vol. III, No. 1-এ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি এত আলোড়ন সৃষ্টি করে যে সোসাইটির তরফ থেকে লঙকে সভাপতি করে একটি প্রবাদ কমিটি গঠিত হয়. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রবাদ সঠিক ভাবে সংগ্রহ, শ্রেণীকরণ ও তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে)।

ভারতবাসী অর্থাৎ বাঙালীদের মধ্যেই তিনি কাজ করেছেন। বাঙালীদের কথাই বেশী করে বলেছেন। অবশ্য এই বাঙালী বলতে তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা নেটিভ। তবে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ভারত অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরেছেন। বাঙলা ছাড়া উড়িষ্যা, বিহার, দিল্লী, আগ্রা, বোম্বে, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে গিয়েও ধর্ম প্রচার করেছেন।

লণ্ডনে শেষজীবন: ১৮৭২ সন থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত যে সব ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালী লণ্ডনে যেতেন তাঁরা সুযোগ পেলেই লঙের সঙ্গে দেখা করতেন। অনেক সময় অনেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য লঙ নিজেও আসতেন। ভারতবাসী বিশেষত বাঙালীদের দেখলে তিনি খুবই খুশি হতেন। তাঁদের সঙ্গে বাঙলায় কথা বলে তাঁর বাঙলা জ্ঞানকে ঝালাই করে নিতেন। বাঙলা ও বাঙালীদের বিষয়, ঠাকুরপুকুর চার্চ ও বাঙলা পাঠশালার বিষয়েও খোঁজ খবর নিতেন। খোঁজ নিতেন বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ ও অন্যান্য বহু বিষয় সম্পর্কে। চিঠিপত্রও লিখতেন পুরাতন বন্ধুদের কাছে নিয়মিত। কিন্তু সে সব চিঠির কোন নমুনা আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ সনে লণ্ডন ও ইউরোপের কয়েকটি স্থানে গিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের কিউরেটার হিসাবে গ্লাসগো ইণ্টারনেশনাল এক্সিবিশন, আমসটারডাম ইণ্টারনেশনাল এক্সিবিশন, কলোনিয়াল অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এক্সিবিশন প্রভৃতিতে অংশ নিতে। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে ভারতীয় স্টল ছিল। লঙ প্রতিদিন লণ্ডনের এক্সিবিশনে আসতেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কিত প্রদর্শিত সব কিছু খুঁটে খুঁটে বুঝে নিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন—"Long was never tired of the theme and everytime he came, he had some new points ready on which he sought to be enlightened, and which was evidently in his mind during the week." [১] লণ্ডনে সাতদিন ধরে যে কলোনিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান এক্সিবিশন হয় সেখানে লঙের উপস্থিতির বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ এ কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন লঙ ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি, বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতি, শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয়েও আলাপ করেন। নানা ব্যাপার জানতে চান। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন—"লঙের সঙ্গে আলাপ করে বিস্মিত হয়েছি, তিনি লণ্ডনে বসেই বহু ভারতবাসীর অপেক্ষা ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক বেশী এবং আপ-টু-ডেট খবর রাখতেন।"

লঙ ১৮৭৩ সনে প্যারিসে, ১৮৭৪ সনে লন্ডনে এবং ১৮৭৬ পিটার্সবার্গের আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এখানে একটি বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। লঙের বহু রচনা একাধিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বহু রচনার একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। একই রচনা একাধিকবার প্রকাশ করার সময় কোন কোন স্থানে হুবহু পুরাতন রচনা, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সংস্কার করা হয়েছে। যেমন তাঁর প্রশ্নাবলী। এটি বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর রচিত সব প্রশ্নও "500 Questions..."-এর মধ্যে যুক্ত হয় না। আবার "500 Questions"-এর বহু প্রশ্ন খণ্ডে খণ্ড অন্যত্রও প্রকাশিত হয়। ক্যাটালগ সম্পর্কেও একই কথা। লঙ কিস্তিতে কিস্তিতে বা খণ্ডে খণ্ডে ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। পরবর্তী A Descriptive Catalogue হচ্ছে একখণ্ডে ক্যাটালগের একত্র সংস্করণ। তাঁর বিবিধ গ্রন্থ বর্তমানকালে যে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে—যেমন প্রবাদমালা, রাজমালা, প্রভৃতি—সে কথা আগেই বলেছি।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রাচ্য ধর্মের ওপর জনপ্রিয় এবং সহজবোধ্য বক্তৃতা বন্দোবস্ত করার জন্য চার্চ মিশন সোসাইটিকে দু'হাজার পাউন্ড দান করেন। এই অর্থ দিয়ে 'জেমস লঙ বক্তৃতা'র ব্যবস্থা করা হয়।[১] এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় তাঁরই অনুমত্যানুসারে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের অধিবাসীরা যে "The Long Pastorat Fund" গঠন করেছিলেন সে কথাও আগে উল্লেখ করেছি। মৃত্যুর পরও লঙ এ সবের দ্বারা এতদ্দেশীয়দের মধ্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হায়! লঙের মৃত্যু সংবাদ এদেশে পৌঁছাবার কিছুদিন পর অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ একটি নিবন্ধে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন—"The writer of this note was quite young lad when the late Rev. J. Long was sent to imprisonment by Mordernt Wells for having translated Nil-Darpan. There was great deal of commotion in the country and the writer took it into his head to pay a visit to Mr. Long in prison. Mr. Long was put in the only third stories room and his wife had been permitted to live with him.... There was a great demonstration on the day of his release."[২] এ দেশীয় মনের গতিপ্রকৃতি জানার

জন্যই তিনি নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন ইউরোপীয় বন্ধুদের অনুরোধে। এজন্যই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি "বেঙ্গল হরকরায়" "The Spirit of the Native Press" নাম দিয়ে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

ইংলণ্ডের প্রভাবশালী বহু লোক লঙের এ কাজের সমর্থক ছিলেন। তবু লঙ সাজা পেলেন। লঙের শাস্তি এতদ্দেশীয়রা নিজেদের শাস্তি হিসাবে গ্রহণ করে। লণ্ডনেও এর প্রতিক্রিয়া হয়। লণ্ডন রিভিয়ু লঙের বিচারের সমালোচনা করে বলে "—ইংলণ্ডের কোন বিচারালয়ে এ ধরণের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার দেখা যায় নি।" দি ডেইলি নিউজ লেখে—"এই বিচারে শিশুসুলভ প্রতিহিংসার প্রতিফলন ঘটেছে।" লণ্ডনের অ্যাবরিজিন প্রোটেকশন সমিতি লঙকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে থাকে। তবুও কোন স্মরণ সভার হয় না এদেশে। কারণ, নীলদর্পণ মামলার পর থেকেই তিনি ভীষণভাবে সমালোচিত হতে থাকেন। উপরতলার লোকেদের কাছে অনেকটা গৃহীত হলেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে বণিক ও ইংরেজ আশ্রিতদের মধ্যে আর তাঁর তেমন দাম থাকে না। একটা সন্দেহ, একটা অবিশ্বাস থেকে যায়। তাঁর জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করতে না পেরে মুখে ভাল ভাল কথা বললেও অন্তর থেকে তাঁকে এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা কিছু ইউরোপীয়দের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। তা এদেশীয় মধ্যবিত্তদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। তাছাড়া ততদিনে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারটা পাকাপাকি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ফলে লঙের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে অনেকেরই আর কোন উৎসাহ থাকে না। অ্যাংলিসিণ্টস্‌দের প্রভাবের পর থেকেই লঙ এবং ওরিএন্টালিষ্টস্‌রা দূরে সরে যেতে থাকেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের নিকট থেকে।

ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের অনেকেই লঙ, ডেভিড হেয়ার, জর্জ টমসন, উইলিয়ম জোন্স, উইলিয়ম কেরীদের ন্যায় ভারতবন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এমন কি বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, কি তারও পরে এইসব ভারতবন্ধু বিদেশীদের কথা উল্লেখ করে আরো অনেকে তাঁদের প্রসংশা করছেন। কিন্তু কাউকে নিয়েই তেমন কোন সাংগঠনিক কাজ চোখে পড়ে না। কেরী, জোন্স ডাফ, ডেভিড হেয়ার তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেঁচে আছেন। লঙের প্রতিষ্ঠান ঠাকুরপুকুর চার্চ ও বাঙ্গালা পাঠশালা লঙকে বাঁচিয়ে রাখার কোন চেষ্টা তো করেই নি, পরন্তু, তাঁকে মুছে ফেলার জন্য কি বিস্ময়কর চেষ্টা করেছে তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাই লঙ ও অন্যান্য অনেকে প্রায় হারিয়েই গেছেন। সমকালের বাঙালীদের কেউ কেউ এ সব লক্ষ্য করে লঙ-আদি অনেকের কথা জানতে উৎসাহী হয়েছেন বলেই এ ধরণের পুস্তকেরও প্রকাশ সম্ভব হয়ে চলেছে।

লঙ ভাষার ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করে, সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে পরিণত করে ও অশ্লীল সাহিত্য রহিত করার ব্যবস্থা করে সৎসাহিত্য, সৎজীবন ও মুক্তবুদ্ধি আমদানী করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা অনেকেরই প্রশংসা পায়। তবুও কেন তিনি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন উপরে তার ইঙ্গিত দিয়েছি।

আসলে রায়তদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য লঙের যে চেষ্টা তা এখনও আমাদের অনেকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। অথচ এ দিকে পাদরী লঙের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল। তিনি সাংস্কৃতিক জীবনকে, সাহিত্যকে অর্থনীতি নির্ভর বলে মনে করতেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তাভাবনাকে তিনি পলিটিক্যাল থিওরীর দ্বারা আবদ্ধ করেন নি বটে, তবে তাঁর কাজের ধারা, গতিপ্রকৃতি, আকৃতি এবং পরিপ্রেক্ষিত সঠিকভাবে অনুধাবন করলে তাঁকে এ দেশে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অন্যতম একজন পুরোধা বলে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না। তিনি এ দেশে যে কৃষক-আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত তার সাক্ষী দিবে তাঁর কার্যাবলী। তিনি কারা বিভাগের সংস্কার ও কয়েদীদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও আন্দোলন করেছিলেন। এ সব কাজের মধ্যে ম্যাচিওরড রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা লক্ষণীয়। অবশ্য লঙ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলেন না। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুশীলন, অধ্যয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু এ সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনকে একেবারে উপেক্ষা করে বোধহয় এগোনো যায় না। দলীয় রাজনীতি না করেও রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহ বা রাজনৈতিক সচেতনতা মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। লঙ এই সব শিক্ষিত এবং নির্দলীয় রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের আদর্শ।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত তিনি নিজেই ছিলেন একটি সংস্থা। বিদ্যাসাগর তাঁর সময়ের সমস্ত রকম প্রগতিশীল সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। লঙ বিদ্যাসাগর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদেশী সমাজ বিজ্ঞানী। তবে তাঁর সংস্কার কাজের পরিধি বিদ্যাসাগরের মত বহুধাবিস্তৃত ছিল না। তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে এগিয়েছিলেন বলে অনেক জায়গায় আটকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাতৃভাষা বনাম ইংরেজী ভাষার দ্বন্দ্বে লঙ ছিলেন মাতৃভাষার স্বপক্ষে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহমর্মী। কিন্তু রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ছিলেন

ইংরেজী ভাষার স্বপক্ষে। এ ক্ষেত্রে তিনি রাধাকান্ত ও বিদ্যাসাগর প্রমুখদের বিপরীত মত পোষণ করতেন। মিশনারী পাদরী হিসাবে অনেক সময় তিনি হিন্দু এবং মুসলাম ধর্মের উপরও সুবিচার করতে পারেন নি। যার ফলে একদিকে হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে এবং অপরদিকে ইংরেজীপ্রিয় দেশীয়দের বহু ভাবনা ও চিন্তার সঙ্গে ঐক্যভাব পোষণ করেন নি। কিন্তু তাতেও তার জনপ্রিয়তা কমে নি। আলেকজাণ্ডার ডাফকে নিয়ে দেশীয় সমাজে যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল জেমস লঙকে নিয়ে দেশীয় সমাজে সেরূপ কোন তিক্ততা দেখা দেয় নি। পরবর্তীকালে লঙকে নিয়ে যে অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য দায়ী ছিল তৎকালের রাজনীতি এবং একদল লোকের মাত্রাহীন স্বার্থচিন্তা। সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে যতদিন এ দেশে ছিলেন ততদিন তিনি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন থেকে জয়কৃষ্ণ, রাধাকান্ত, প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে একমনে কাজ করে যেতে পেরেছেন। এ কাজে সর্বদাই সকলের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করতেন এমন নয়। তবু সকলকে মানিয়ে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার মত মন ও গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।

পরিণত বয়সে লঙ ইহধাম ত্যাগ করেন লণ্ডনে। নানা ধরনের কাজ করে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু মৃত্যুর পর কোন প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশিত হয়নি। আশা করি বর্তমান গ্রন্থ সে অভাব দূর করবে।

৩ জেমস লঙ ও বাঙালীর উত্তরাধিকার

মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা জেমস লঙকে বাঙলা ও বাঙালীর কাছে যেমন প্রিয় করেছে তেমন তাঁর নানা প্রকার অদ্ভুত কাজের জন্য তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। দেশীয় সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল আস্তিক্যানুভূতি তাঁকে জ্ঞানবাদী করলেও তাঁর জ্ঞানবাদ বিশুষ্ক ছিল না। রসালো-জ্ঞানবাদ, চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিসত্তার অভিনবত্ব তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তাঁর রচনা সমূহকে বৈদগ্ধপূর্ণ করে তুলেছে। তবু সাহিত্যিক মূল্যমানের দ্বারা তাঁর প্রতিভার বিচার সম্ভব নয়। কারণ, তিনি মৌল সাহিত্য রচনা করেন নি। রচনা করেছেন প্রবন্ধ, পাঠ্যপুস্তকাদি এবং সংকলন করেছেন নানা বিষয়ক গ্রন্থ। স্রষ্টা নন, মিস্ত্রীর অনুভূতি নিয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে, সমাজ বিজ্ঞানাদি অনুশীলনের প্রেরণায় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতড়ণের দ্বারা অখ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য। শুধু জেমস লঙই নন আরও বহু মিশনারী পাদরী এবং ইউরোপীয় বন্ধুরা যখন এ কাজ করে চলেছেন তখন বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে আস্তিক্যবোধের সমন্বয়রেখা উদিত হতে থাকে। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ অন্যদিকে রামকৃষ্ণসমাজ, একদিকে কৃষ্ণচরিত্র ও বঙ্কিমগোষ্ঠী, অন্যদিকে নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী ও তাঁর সমভাবাপন্নগোষ্ঠী, একদিকে দেবেন্দ্র-কেশবের ভক্তিবাদ, অন্যদিকে কৃষ্ণকমলাদি কোঁৎপন্থীদের দৃষ্টবাদ এবং হিতবাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের জনগণের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য আকুতি, একদিকে দেশীয়দের ভিক্টোরিয়ানুগত্য, অন্যদিকে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মারফৎ বিপ্লবচিন্তা, একদিকে লঙ ইত্যাদি ইউরোপীয়দের শাসিতদের মঙ্গল-সাধনের জন্য স্বদেশীয় শাসকদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা, অন্যদিকে লোভী বণিকদের শোষণের মাত্রা বাড়াবার জন্য শাসকদের প্রচেষ্টা প্রভৃতি দেশীয় সমাজকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করতে থাকে।

শোষিত মানুষদের সেবা, রাণীর প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা বা ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলময়তার উপর অখণ্ড বিশ্বাসের যে বাহুল্য জেমস লঙের মধ্যে দেখি সেই একই বিশ্বাস ও আস্থা দেখতে পাই দেশীয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও। বঙ্কিমের মত ব্যক্তিও ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ চান নি। তাঁর সন্তানদলের সঙ্গেও

ইংরেজ শাসকদের বিরোধ ছিল না। দেশীয় সাধারণের প্রতি প্রভুশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই ছিল তাদের বিদ্রোহ। একই উদ্দেশ্য নিয়ে জেমস লঙও কলম ধরেছিলেন। আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

সমাজ শাসিত ব্যক্তিমানসের স্বাধীন সৃষ্টি নিকেতনে সাহিত্য গড়ে ওঠে। তারজন্য প্রস্তুতি দরকার। "কথা কহিতে হইলে কথা শোনা দরকার। শিশু চোখ কান নাক মুখ দিয়া অবিরত কথা শোনে, বহিঃপ্রকৃতি হইতে নিজের সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কথা আহরণ করিয়া লয়। দীর্ঘদিন প্রস্তুতির কাজ চলে, পরে সে সুবোধ্য কথা বলিবার অধিকারী হয়। গোড়ার দিকে অস্পষ্ট কথা, আধ-আধ কথা, ইঙ্গিত ক্রন্দন চিৎকারের সঙ্গে কথা সে অনেক বলে...শিল্পী সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শিশুর কথাবলার তুলনা" দিয়ে সজনীকান্ত দেখিয়েছেন বাঙলা গদ্যসাহিত্যের আত্মপ্রকাশের পিছনে কিরূপ প্রস্তুতি ছিল। বিদেশীদের সাহায্য পুরোপুরি গ্রহণ করে দেশীয়রা যখন সাহিত্যাকাশে উদয় হলেন তখন—"বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার ছানা পাকাইয়া গোল্লা প্রস্তুত করিলেন বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহা রসে ফেলিয়া রসগোল্লা করিয়া ছাড়িলেন; প্রথমদল পাঠ্যপুস্তককেই ভিয়ানের সূত্রপাত করিয়া বিদায় লইলেন। দ্বিতীয়দল তাহারই ক্রমপরিণতিতে অপাঠ্য পুস্তকে রসের সঞ্চার করিলেন। মাঝখানে ভাষা ভাব ও বিষয় বস্তুর জোগান দিয়া মনস্বী রাজেন্দ্রলাল, আলালী প্যারীচাঁদ, ও হুতোমী কালীপ্রসন্ন যোগাযোগ বজায় রাখিলেন।"[১] এইসব মনীষীদের সপ্রতিভ করতে, সমগ্র বাঙালী তথা গ্রাম ও নগরবাসী বাঙালীদের স্ব-ভাব নিয়ে দাঁড়াবার জন্য যাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানী করে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য বাঙালীকে ডাক দিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লঙ এবং আরও বহু বিদেশী।

লঙ যে নেটিভদের উন্নতিকল্পে কাজ করেছেন সে নেটিভ বাঙালী। যে ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ নিয়ে তিনি কাজ করে গেছেন তা দেশীয়, বঙ্গীয় বা গৌড়ীয়। রামমোহন-ডিরোজিও-ইয়ংবেঙ্গলীদের ভারতীয় চেতনা এবং দেশীয় শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজী জানার ও ইংরেজী বলার প্রবল আগ্রহাতিশয্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষা, দেশীয় পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, ইংরেজী ও বাঙলায় গ্রন্থাদি রচনা এবং নানা ধরণের সংগঠন গড়া ও গড়তে সাহায্য করার মধ্যে তিনি নেটিভদের উৎসাহিত করতে থাকেন।

১। সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি, প্রাগুক্ত।

বাঙালীকে আত্মস্থ হতে ডাক দিয়েছিলেন লঙ। তাঁর গদ্যের নমুনা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্রাদি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে মহাম্মদের জীবনী থেকে কিছু উধৃতি তুলে তাঁর রচনার সঙ্গে আরেকবার পরিচিত হতে পারি। যিশু ও মহাম্মদের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"(১) যিশুখ্রীষ্ট য়িহুদি দেশে থাকিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাম্মদ দূরদেশে গমন করিয়া নানা জাতীয় ও নানা ধর্মাবলম্বী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, (২) মহাম্মদ সেনাপতি হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিশুখ্রীষ্ট শান্তির রাজা ছিলেন, (৩) মহাম্মদ অতি ...ছিলেন, কিন্তু যিশুখ্রীষ্ট ধার্মিক, নির্মল ও অহিংসক এবং পাপীগণ হইতে পৃথক ছিলেন। মহাম্মদ তাঁহার শিষ্যগণকে পরের রক্তপাত করিতে আহবান করিয়াছিলেন কিন্তু যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে অনুতাপ, নম্রতা ও স্নেহ প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। (৫) মহাম্মদ মনুষ্যনাশক হয়েন, যিশুখ্রীষ্ট মনুষ্যত্রাতা ছিলেন।"* ইত্যাদি।

এ সময় অবধি দেশীয় শিক্ষিতদের একটা বড় অংশ দেশীয় জীবন সম্পর্কে সংশয় ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোলে যাঁরা আমূল পরিবর্তনের চেষ্টায় নামলেন তাঁরা যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রবাহ আমদানী করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বাজাত্যবোধ আমদানী করতে পারেন নি। রাজনারায়ণ বসু যুক্তিবাদীদের সঙ্গে স্বজাতির গৌরববুদ্ধির চেষ্টায় এগিয়ে এলেন। বঙ্কিম নিয়ে এলেন বাঙালীর স্ব-বোধ। বঙ্কিমকে খাঁটি বাঙালী করে গড়ে তুললেন ঈশ্বর গুপ্ত। বঙ্কিম লিখেছেন—"মহাত্মা রামমোহনের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী।[২]" বঙ্কিমের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয়ের বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একমুহূর্তে অনুভব করিতে পারিলাম।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"[৩] প্রশ্ন হতে পারে বঙ্কিমের আবির্ভাব বা বাঙলাগদ্যের নবজন্মের ইতিহাসে লঙের ভূমিকা কি এবং কোথায়? এ প্রশ্নের

উত্তর দেবার আগে প্রথমেই বলে নেই বঙ্কিম যে যুগে বাঙালী চেতনাকে জাগাবার চেষ্টায় কলম ধরলেন সে যুগে বা তার কিছু আগে যে সব বিদেশী এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর মধ্যে একজন জেমস লঙ। তিনি বাঙালীকে বাঙালী হিসাবে বাঁচার জন্য, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বোঝার জন্য ও বাঙালীকে বাঙালীত্ব ব্যাপারে সপ্রতিভ হবার জন্য যে উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করুন না কেন, তাঁর কার্যাবলী বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠাকে যে ত্বরান্বিত করেছিল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের গদ্যের সঙ্গে পরবর্তী গদ্যের যে ফারাক তা তাঁর আমল থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর নিজের বাঙলাও উন্মেষপর্বের বাঙলা থেকে স্বতন্ত্র। জনগণের সুবোধ্য ভাষায় রচিত কথ্যভাষার সাহিত্যের প্রতি জনগণের যে টান সে টানের কথা তৎকালীন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কর্ণে জেমস লঙ-আদি বহু ভারতবন্ধু এবং স্বদেশী সৎসাহিত্য রসিকরাই তুলে ধরতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেক ভাললোক ছিলেন। অনেকের মধ্যে ছিল আর্টিফীসয়াল গুডনেস, যার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের মতলব সিদ্ধ করতেন। অনেকসময় নিঃস্বার্থ কাজ করতে এসেও অনেকে স্বার্থসিদ্ধির কলে পরিণত হন। কুচক্রীরা "Whatever good work they do is only a cloak to hide their real motive of gaining powers, political or otherwise...A wicked man trying to do good to others is likely to do harm than good by the very manner in which he will function...A bad man may have fleckerings of goodness now and then, but there is every possibility that his evil propensities will prevail in the end."[১] অন্যদিকে যিনি সত্যিকারের ভাললোক তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেও শেষে সে উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে এমন সব ভাল কাজ করতে পারেন যে কাজের দ্বারা পরবর্তী যুগের মানুষ উপকৃত হয়। এবং "Whatever he does becomes the source of much good because he is goodness itself"[২] লঙের মধ্যে সত্যিকার ভালমানুষের গুণ বর্তমান থাকায় তিনি তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছাড়া এমন অনেক কাজ করে যেতে পেরেছেন যার দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি।

তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবন নিয়ে যখন কাজ করছেন

যখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার যখন "বাংলা ভাষায় কতরকম রীতিতে লেখা যাইতে পারে তাহারই পরীক্ষা চালাইয়া ছিলেন,"[১] তখন কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ, কথোপকথন অথবা প্রবোধচন্দ্রিকায় কথোপকথন বা কথকতায় যে গদ্য ব্যবহৃত হচ্ছিল অথবা হানা ক্যাথারীণ ম্যালেনস্-এর "ফুলমণি ও করুণার বিবরণে" যে গদ্যের ব্যবহার দেখি সে গদ্যকে অনেক প্রাণবন্ত করে সর্বপ্রথম কথ্যভাষাকে সর্ববিধ রচনার বাহন হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে সব মিশনারী গদ্য লিখিয়েদের সমর্থন ছিল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জেমস লঙ। টেকচাঁদের চেয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে এ আন্দোলন চালালেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর সঙ্গেও জেমস লঙের যোগ অভিন্ন। টেকচাঁদের 'আলালের' ছ'বছর আগে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির জনৈক পাদরীর মেয়ে ও মিশন স্কুল সমূহের পরিদর্শক জে. ম্যালেনস-এর স্ত্রী হানা বিরচিত 'ফুলমণি' কথ্যভাষার উপন্যাস। 'আলালে'র এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয় কথ্য ভাষার উপন্যাস "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান"।[২] এই উপন্যাসে লেখকের নাম থাকে না। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য অজানা নামটি আবিষ্কার করে জানিয়েছেন—"চন্দ্রমুখী Govinda Samanta-গ্রন্থ রচয়িতা রেভারেন্ড লালবিহারী দের মৌলিক উপাখ্যান।" এই সব দ্বারা বুঝতে পারি যে পাদরী সাহেবরা কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হোক এটা তাঁরা চাইতেন। এই সময় অবধি "বাঙ্গালা রচনাকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজী পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।"[৩] এই অবস্থায় সাহসে ভর করে যাঁরা কথ্যভাষায় সৃষ্টিধর্মি সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এলেন তাঁরা কিছুলোকের সমর্থন নিশ্চয়ই আশা করতেন। মার্শম্যান, জেমস লঙ আদি বিদেশী সাহিত্যসাধকদের দল তাঁদের সাহস জুগিয়েছেন। সমর্থন করেছেন। বঙ্গ-সাহিত্যপ্রেমী পাদরী সাহেবদের সমর্থন পেয়ে যে সব ভোরের পাখি নতুন গান জুড়ে দিলেন তাঁদেরও প্রস্তুতির একটা ব্যাপার ছিল। প্রস্তুতিপর্বে রেভারেন্ড জেমস লঙ নানাভাবে তাঁদিকে উৎসাহিত করেছিলেন।

আর তা করেছিলেন তাঁদের ভালমানুষীর জন্যই। ভালমানুষীর জন্যই লঙ দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তার হোক ও কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনা হোক এটা চাইতেন। কারণ, সে সাহিত্য সহজে জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত লঙ এ সত্য জানতেন।

তিনি দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য যে শিক্ষকদের দরকার হত তাদের শিক্ষিত করার জন্য বিনাপারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতেন। সৎসাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে, কলকাতার বাজার অশ্লীল পুস্তকে ছেয়ে গেলে, সে বিষয়ে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অশ্লীল পুস্তক নিবারণ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। এ সবই দেশীয় সাহিত্য প্রেমের পরিচয়। তাঁর সংকলিত ও রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এবং বলেছি, ১৮৫১ সন থেকে তিনি যে প্রবাদমালা সংগ্রহ করতে থাকেন ১৮৮০ পর্যন্ত তার সে কাজ বন্ধ হয় না। ১৮৫৩ সন থেকে সংবাদসার এবং ১৮৫৫ সন থেকে ডেস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ তৈরীর কাজও বন্ধ হয় না। তিন খণ্ডে প্রকাশিত "Selections from the Bengali Periodical Press being extract from native newspapers or periodicals on history, biography, anecdotes, moral tales etc. বা সংবাদসার পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ও বিনয় ঘোষকে "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র" সংকলনে উৎসাহিত করে বলে আমরা মনে করি এবং তার প্রবাদমালা ডঃ সুশীলকুমার দে-কে 'বাংলা-প্রবাদ' ও ডঃ সুকুমার সেনকে 'Women's Dialect' রচনায় ও উৎসাহ জোগায়। ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ কিন্তু একশত্রিশ বছর ধরে এখনও গবেষকদের অন্যতম অবলম্বন। এর মারফৎ আমরা একটা বিরাট দিগন্তে উপনীত হতে পারি। ভূমিকায় লঙ বলেছেন—"While we have 'Sir H. Elliot's Index to the Muhammadan Historians of India" "Adelung's Guide to Sanskrit Works", edited by Professor Wilson, "Sprenger's Catalogue of the Lucknow Oriental Libraries" published at the expense of the Government of India, and Garcin De Tassi's "History of Hindusthani Literature" published by the Oriental Translation Fund,...we have hither to had no list of Bengali works to shew what has been done, what is doing, what ought to be done...

The learned native by observing the comparative poverty and richness of the literature of his native, tongue, will see

sphere of usefulness that lies before him, in translation and original composition".[১] এই মন্তব্যের মধ্যে যে আন্তরিকতা সেই আন্তরিকতাই লক্ষ্য করি লেখক ও সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করার দিকে। ক্যাটালগটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে Arithmetics, Dictionaries, Ethics and Moral Tales, Geography, Geometry, Grammar, History and Geography, Medicine, Mensuration, Mental Philosophy, Natural History, Natural Philosophy, Political Economy, School System, Spelling, Lessons ও Readers এই শিরোনামে শ্রেণীবিভক্ত করে বিভিন্ন বই-এর নাম, লেখক, দাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রকাশকাল সহ কিছু বিবরণ উপস্থিত করেছেন। একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় বা Literary and Miscellaneous খণ্ডে Law, Periodicals,-Almanaes Periodicals Encyclopaedias, Periodicals Magazine, Periodical-Newspapers, Poetry and the Drama, Popular Songs, Tales ও Miscellaneous স্থান পেয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আছে Theological—Theology—Christian : Serampore and Early Printed Tracts, Later Tracts and out-of-print, Tract Society's Tracts, Musalman—Bengali Literature, Puranic Works, Sivite Works, Vaishnav, Vedantic Works. এই তালিকা, লঙের ভাষায় "is an extract from a longer one." যে বিস্তৃত ও ব্যাপক পরিধির মধ্যে ফেলে লঙ বাঙলা সাহিত্যকে লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

॥ ৩ ॥

জেমস লঙের আগে বাঙলার পঞ্জিকা নিয়ে এমন বিস্তৃত আলোচনা কেউ করেন নি সে কথা আগেও বলেছি। তিনি ১৮১৮ সনের রামহরির পঞ্জিকা, ১৮২৪ সনের কলকাতা নতুন পঞ্জিকা, ১৮২৫ সনের বিশ্বনাথ দেবের পঞ্জিকা, ১৮৩৫ সনের গোবর্ধন শর্মার পঞ্জিকা, ১৮৩৬ সনের মেদিনীর পঞ্জিকা ও মাধব মোহন দাসের পঞ্জিকা, ১৮৪০ সনের পঞ্জিকা, ১৮৪৬-৫২ সনের ট্রাক্ট সোসাইটির বাৎসরিক পঞ্জিকা, ১৮৪৭-৫০ সনের খ্রীষ্টিয় পঞ্জিকা এবং কোনের পঞ্জিকা, কাশীপুর পঞ্জিকা, গোপালচন্দ্রের পঞ্জিকা, শ্রীরামপুর পঞ্জিকা, রামকেশরের পঞ্জিকা, সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পঞ্জিকা, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির পঞ্জিকা প্রভৃতির ব্যাপারে বহু তথ্য জানিয়েছেন। সর্বশ্রেণীর বাঙালীর কাছে এখনও

পঞ্জিকা অপরিহার্য। এই পঞ্জিকা নিয়ে একটা আলোচনা হতে পারে, পঞ্জিকার বিষয় রচনাদি প্রকাশিত হতে পারে, তা লঙের আগে কেউই লক্ষ্য করেন নি। জেমস লঙের কাছেই জানতে পারি প্রথম বাঙলা পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনে। ধর্মকর্ম ও সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠান পালনের জন্য, দিনক্ষণাদি নির্দিষ্ট করার জন্য, পঞ্জিকা অপরিহার্য। কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর সরকারেরও পঞ্জিকার দরকার হত হিন্দু ও মুসলমান পর্বের দিন জানতে এবং সে অনুসারে সরকারী কার্যালয় বন্ধ রাখতে। কোম্পানীর সরকার একটি নোটিশ দিয়ে ১১৯৪ বঙ্গাব্দে যে সব ছুটির দিন ঘোষণা করেন তা—"রথযাত্রা ১ দিন, পুর্ণযাত্রা ১ দিন, রাখীপুর্ণিমা ১ দিন, জন্মাষ্টমী ২ দিন, দুর্গাষ্টমী ২ দিন, মহালয়া ১ দিন, দুর্গাপুজা ৫ দিন, দেওয়ালী ৩ দিন, উত্থান একাদশী ২ দিন, তিলওয়া সংক্রান্তি ১ দিন, বসন্তপঞ্চমী ১ দিন, শিবরাত্রি ২ দিন, হোলি ৫ দিন, বারুণী ১ দিন, চড়কপুজা ১ দিন ও রামনবমী ১ দিন।" এগুলো ছাড়া অফশনাল ছুটি অর্থাৎ প্রয়োজনে ছুটির দিন—"অক্ষয়-তৃতীয়া ১ দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ২ দিন, জৈষ্ঠ মাসে দশমী-একাদশী ২ দিন, স্নানযাত্রা ১ দিন, শয়ন একাদশী ১ দিন, অরন্ধন ১ দিন, গণেশ পুজা ১ দিন, অনন্তব্রত ১ দিন, বুধনবমী ১ দিন, নবরাত্রি ১ দিন, লক্ষ্মীপুজা ১ দিন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১ দিন, অন্নকূটযাত্রা ১ দিন, কার্তিকপুজা, ১ দিন, জগদ্ধাত্রীপুজা ১ দিন, রাসযাত্রা ১ দিন, অগ্রাহয়ণ নবমী ১ দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২ দিন, মৌনী সপ্তমী ১ দিন, ভীমাষ্টমী ১ দিন ও বাসন্তীপুজা ৪ দিন"।[১] তাছাড়া, গ্রহণাদির দিনও ছুটি থাকত। "বাঙালী জীবনে বিবাহ" গ্রন্থে বাঙালী জীবনে পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত প্রথম দিককার পঞ্জিকায় "বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী তারিখ দেওয়া থাকলেও মুসলমানি তারিখের উল্লেখ থাকে না। উল্লেখ থাকে না বারবেলা, কালবেলা, মৃতে কি পরিমাণ দোষপ্রাপ্তি, রাশি ইত্যাদিও"।[২] লঙের হিসাব অনুযায়ী বাঙলা পঞ্জিকার প্রচার সংখ্যা যখন একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কপি তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার সংখ্যা মাত্র সাতশ কপি।[৩]

নানাদিকে লঙের দৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকে। ১৮৫৬ সনে প্রকাশ করেন ধাতুমালা। এ বিষয়ে তিনি ক্যাটালগে উল্লেখ করেছেন—"Sanskrit roots and Bengali derivations, **Dhatu mala**. Roz & Co. In the

Press. Designed to make natives better acquainted in a short time and in a rational way with their own language, by giving them the Etymology of the language from Sanskrit in the same way as boys in England learn the Latin etymology of English words." এইভাবে লঙ তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞানকে একের পর এক উজোর করে দিতে থাকেন নেটিভ তথা বাঙালীদের উপকারার্থে। তাঁর ধাতুমালা বা শব্দবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রশ্নাবলী* তৎকালে বহুল জনপ্রিয় হয়েছিল।

বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা, বাঙলার সমাজ জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজ তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর নিজে সংগঠন গড়েন এবং সংগঠন গড়তে অন্যদেরও উৎসাহিত করেন। এইসব সংগঠনের মারফৎও তাঁর কাজ এগিয়ে নিতে পারেন। ১৮৫২ সনে লঙের প্রথম গ্রন্থাবলী বা তালিকা প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে। ১৮৫৩ সনে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজেস্ট্রেট লঙকে অনুরোধ করেন। বাঙলা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করতে। ১৮৫৪ সনের ২৬শে জুন প্রস্তুত তালিকাটি সমর্পণ করার সময় লিখেছিলেন—"In statistical researches in this country, one can only attain an approximate accuracy, considering the agents we have to employ and little interest felt in statistical research by native community generally."[১] এ অবস্থার এখনও খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা মনে করার কারণ নেই। অনেক অসুবিধার মধ্যেই লঙকে ক্যাটালগ তৈরী করতে হয়েছিল। তবু পরবর্তী গবেষকদের কেউ কেউ কোথায় লঙের ভুলভ্রান্তি আছে তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়েছেন। সময়ের ব্যবধান জনিত অসুবিধা তাঁদের অনেকেরই সহানুভূতি লাভ করে নি। সাহিত্যসাধক চরিতমালার সিরিজের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিতকার দেবজ্যোতি দাশ লিখেছেন—"ব্রজেন্দ্রনাথ লঙ-এর গ্রন্থপঞ্জীর ত্রুটিগুলি আবিস্কার করিয়া প্রত্যেক সাহিত্যসাধকের গ্রন্থের যথাসাধ্য নির্ভুল ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করায় লঙ-এর কৃত পঞ্জীর অপরিহার্যতার অবসান হইল।" আমরা তা মনে করি না।

এই ক্যাটালগের মারফৎ এবং অন্যত্র লঙ আরও একটা দিকের প্রতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বাঙলা সাহিত্যের একটি

নতুন শাখা মুসলমানী বাঙলার কথা প্রথম উচ্চারণ করেন। পরবর্তীকালে মুসলমানী বাঙলার বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন থেকে কাজী আবদুল মান্নান, এনামুল হক, আনিসুজ্জামান প্রভৃতি অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার চিন্তা ও ইন্ধন যে জুগিয়েছেন জেমস লঙ তাতে সন্দেহ নেই। এটা কি কম কথা!

মুসলমানী বাঙলা সম্পর্কে লঙের কথা—"The Musalmans have always been noted for the tenacity with which they have clung to their own ideas and language, and for the obstinacy with which they have resisted foreign influence...the Musalmans are adverse to learn the Vernaculars; hence, as the Urdu has been formed by a mixture of Persian and Hindi, so the Musalmans have formed in Bengali, a kind of lingua franca, a mixture of Bengali and Urdu, called boatman's language. This must eventually give way to the overwhelming influence of the Bengali, ..."[১] লঙ কলকাতার বটতলা, কালিঙ্গবাজার, কলুটোলা ছাড়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানের পুঁথি এবং খোন্দকার সামসুদ্দীন সিদ্দিকী, মুন্সী আজিমদ্দীন, মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন, আয়েনআলী শিকদার, সেক আজিমদ্দি প্রভৃতির রচিত পুস্তিকার গদ্য লক্ষ্য করে মুসলমানী বাঙলা এই নামকরণটি করেন। এই বাঙলায় অন্তত একচল্লিশটি মিশ্ররীতির প্রচলন আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেছেন বাঙালী মুসলমানেরা উর্দু ও বাঙলাকে মিশিয়ে একরকম মাঝিমাল্লাদের ভাষা সৃষ্টি করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তও একদা প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষার প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—ওগুলো হচ্ছে মেছোদের ভাষা। সংস্কৃতকে মাতা হিসাবে গ্রহণ করে যাঁরা বাঙলা গদ্যসাহিত্য রচনায় এগিয়ে এলেন তাঁরা কথ্য ভাষাকেও মার্জিত করে চললেন।

১৮৫২ ও ১৮৫৪ সনে জেমস লঙ যে পাতাবলী অথবা বেঙ্গলী ইনষ্ট্রাক্টর প্রকাশ করেন সেখানে দেশীয় ভাষার বহু উধৃতি স্থান পায়। ১৭৭ ও ২০০ পৃষ্ঠার বই দুটির প্রত্যেকটির দাম ছিল আট আনা। ক্রোড়পত্রে বাঙলা সর্বনামের তালিকা, তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ এবং সত্তরটি সংস্কৃত শব্দের বাঙলা অর্থযুক্ত শব্দ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদসারে ১৮১৮—১৮৫৩ সন পর্যন্ত বিভিন্ন বাঙলা সাময়িক পত্র থেকে উধৃতি আছে। বিষয়—ইংরেজ ও বাঙালীদের পূর্বেকার অবস্থা, আকবরের গল্প, বেগম সুমরুর গল্প,

১। A Descriptive Catalogue, op. cit.

উইলিয়ম জোনস, আলফ্রেড আডিসন, বর্মাবাসী, প্রাকৃতিক ধর্মাদর্শ, বৃষ্টি, বন্যেরা বনে, কলেরা, ভিক্টোরিয়া, উড়িষ্যার খণ্ড অধিবাসী, আসাম দর্শন, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ, ভোজবাজী, প্রবাদ ও প্রবচন, তাজমহল, মমি, সূর্যের দূরত্ব প্রভৃতি। দৃষ্টান্তরত্নে ৩৬৫টি ধর্মতত্ত্বীয় বাণী স্থান পেয়েছে। এসব নিশ্চয়ই দেশীয়দের অনুপ্রাণিত করেছে নিজেদের জানতে।

॥ ৪ ॥

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার নতুন প্রেস আইন চালু করে কয়েকটি পত্রিকা বন্ধ করে দেন এবং কড়া সেন্সর প্রথা প্রবর্তন করেন। লঙ এ নীতির বিরোধিতা করে বললেন— "The opinion of the native press may often be regarded as the safety valve which gives warning to danger."[১] সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তিনি দাবী করেছিলেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর রাজমালার বিশ্লেষণে তা প্রকাশিত। নানাবিধ আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন ঐতিহাসিকেরা কি ভাবে সত্যঘটনার সঙ্গে কিম্বদন্তী, মৌলিক কাহিনী প্রভৃতিকেও উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হন। তিনি প্রশ্ন করেছেন—নানাগল্প-কাহিনী যদি রোমের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তবে রাম কাহিনীকে কেন ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না? ইতিহাসের সঙ্গে বিভিন্ন রামকাহিনী যুক্ত করার ব্যাপার নিয়ে যে মতানৈক্য তখন দেখা দিয়েছিল এবং তিনি তার যে জবাব দিয়েছেন সেই পথ ধরেই বর্তমান ভারতেও রামকাহিনী নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা চলেছে তা তো সকলেরই জানা। দেশীয়দের যখন এভাবে অনুপ্রাণিত করছিলেন তখনো কিন্তু তিনি নিজের বিশ্বাসের কথা চাপা রাখেন নি। স্বদেশীয়দেরও তাঁর বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লর্ড বেণ্টিকের ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে দেশীয়দের দ্বারা ভারত শাসিত হোক এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই প্রশাসনের সমালোচনা হোক তা-ও চাইতেন। কারণ, "এ দেশের জনগণের মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা নগণ্য। তাদের পায়ের তলায় আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত থাকতে পারে। দুর্যোগের কালো মেঘ এ দেশের আকাশ-বাতাসকে সমাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে, প্রহরী যদি তার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে সেটা কি

অপরাধ? প্রত্যেক মিশনারী হচ্ছে শান্তির অতন্দ্র প্রহরী। ভারতের মঙ্গলের জন্য ব্রিটিশ শাসনের সার্থকতা।"[১] এ দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এগিয়েছিলেন।

মুসলমান সমাজের মধ্যে তখন যে হতাশা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। বলেছেন, এই হতাশা "ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হবে।" ধূর্ত ইংরেজ এই হতাশাকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ রোপিত হতে পারত না যদি হিন্দুদের সুরসুরি না দিয়ে তখনই মুসলমানদের হতাশা বিদূরিত করার চেষ্টা করা হত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

শুধু হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই নয় শ্রমজীবী মানুষদের সমস্যা উপলব্ধি করার দিকেও লঙের আগ্রহ ছিল। মানবিক কারণে এই শ্রেণীর জনগণের উন্নতিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। তাই বাঙলাদেশের শ্রমজীবীদের জন্য লণ্ডনের ন্যায় ওয়ার্কিং মেনস কলেজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন এবং শাসকদের স্বপ্ন এক ছিল না।

লঙের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসন এদেশে মুক্তি আনবে। সে বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে তৎকালের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের কণ্ঠেও। তিনি বলতেন, ব্রিটিশ শাসককে দরিদ্রের দুঃখ দারিদ্র দূর করতে হবে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন-সর্বহারাদের মধ্যে যে ব্যবধান তাও দূর করতে হবে। তা না হলে তার পরিণাম হবে সাংঘাতিক। তিনি দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ কাজে অগ্রণী হতে বললেন। কারণ, "শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু অশিক্ষিতরা তাদের উপেক্ষা করবে না—অজ্ঞতার শৃঙ্খলে তারা শিক্ষিতদের শৃঙ্খলিত করবেই।"[২] রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তা থেকেই লিখলেন—"যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে ফেলিবে যে নীচে"। বিবেকানন্দ বললেন,—"নরকের কঙ্কাল তোরা শূন্যে বিলীন হয়ে যা, নতুন ভারত বের হোক দরিদ্রের কুটির থেকে"। রামকৃষ্ণ বললেন, "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" করতে। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের বাণীকে বিশ্লেষণ করলেন: "মানুষ যদি সংসারের সকল ব্যক্তিকে শিব জ্ঞানে মান্য করতে পারে, তবে নিজেকে বড় ভেবে তাদের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করার অবসর পাবে না। আপনাকে চিদানন্দময় মনে করতে পারবে।"[৩]

মনে রাখতে হবে ১৮৪০-৭২ বাঙলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাদর্শের অবক্ষয় সুস্পষ্ট। সর্বত্রই আরম্ভ হয় মানুষের বিজয়। এই বিজয়ের সূত্র ধরে রামকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন,—"সব ধর্মই এক সনাতন ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশ। এক সনাতন ধর্মই চিরকাল রয়েছে ও থাকবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশমান। অতএব আমাদের সব ধর্মকে সম্মান করতে হবে। যতদূর সম্ভব সবগুলিকেই গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। তোমার পথ ঠিক নয়, একথা বলা ভুল। বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারি।"[১] ধর্মীয় জগতে যে ঔদার্য রামকৃষ্ণের মধ্যে দেখি, সাহিত্য, জীবন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ঔদার্য ও বিরাটত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি বাঙলায় সমস্ত রকম প্রগতিশীল আন্দোলনের জনক।

॥ ৫ ॥

বাঙলার প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনায় জেমস লঙেরও একটা স্থান আছে। ব্যাপারটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বুঝতে হলে একটু পিছনের দিকে তাকাবার দরকার আছে। পিছনের দিক বলতে আমরা ইউরোপীয় বণিকদের প্রথমাবস্থার কথা বলছি, যখন তারা দেশীয় বণিক ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের কাছে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে সমস্ত বাধা সমস্ত প্রতিরোধ অতিক্রম করতে পেরেছিল। নিজেরা তো বটেই অন্যদেরও বোঝাতে পেরেছিল টাকার শক্তিই প্রকৃত সামাজিক শক্তি। তাই তারা দুহাতে টাকা লুঠবার দিকে মনোযোগ দিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাসে জানিয়েছেন যে নবাবের মসনদে একবার মীরজাফর, তারপর মীরকাশেম, আবার মীরজাফরকে বসাবার দালালী হিসাবে ৮ বছরে আদায় করেছিল ২,১৬৯,৬৬৫ পাউণ্ড। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারি দিয়ে আয় করে ১১০ কোটি টাকা। ঐ টাকাই পরবর্তীকালে অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের পরে বণিকদের মূলধন হিসাবে খাটানো হয় ভারতবর্ষে। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানী যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তাতে সমগ্র কৃষক সমাজ সর্বস্বান্ত হয়। কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে। কৃষকের উপর শোষণের চাপ যখন ব্যাপক তখন জনসাধারণের জীবনধারণের মানদণ্ডের উপরও আঘাত আসতে থাকে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য। বাঙলায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৭৩০

সন থেকে। ১৭৫৭ অবধি এই মূল্যমান মোটামুটি সীমার মধ্যে থাকলেও জনতার যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে তাকে মূলধন করেই জগৎশেঠ-মীর-জাফরেরা বণিকদের ডেকে আনতে পারে। নবাব ও বণিক শাসনে মূল্যবৃদ্ধি হতে হতে ভারতবর্ষ যখন রাণীর শাসনে চলে আসে, অর্থাৎ ১৮৫৮ সনে, তখন মূল্যস্তর ১৭৩০ এর তুলনায় ১৮০ গুণ বেশী। ১৮৪১-৫০ দশকের মূল্যস্তর থেকে ১৮৫১-৬০ দশকের মূল্যস্তর ছিল ৩৯ ভাগ বেশী, এবং ডঃ রাধাকমল মুখার্জীর হিসাব অনুযায়ী ১৮৬১-৭০ দশকের মূল্যস্তর পূর্বদশকের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের জীবনধারণের ব্যয়ও বেড়ে চললো, অথচ কৃষকেরা এরজন্য লাভবান হতে পারল না। কারণ, দাদন প্রথা। দাদন দিয়ে বলপূর্বক নীলচাষ করাবার ফলে খাদ্যশস্য চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। বিঘা প্রতি ২টাকা দাদন নিতে বাধ্য করা হত। এই দাদন কখনও পরিশোধ হত না, পুত্র-পৌত্রাদির ওপর বর্তাত। দাদনি জমিতে কুঠিয়ালদের যথেচ্ছ প্রবেশ, কৃষকদের গরুবাছুর আটকানো, ঘরবাড়ী জ্বালানো, কৃষকবধূদের অপহরণ ও লাঞ্ছনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারসঙ্গে চলে মূল্যবৃদ্ধি। বিনিময় প্রথার বদলে এসে যায় টাকার প্রাদুর্ভাব। সামাজিক অগ্রগতির সূচনা-স্বরূপ কৃষি ও শিল্পের বাজার তৈরী হয় ঠিকই, কিন্তু সে বাজারের মালিক হয়ে বসে বণিকেরা। বণিকদের শোষণে সাধারণ মানুষদের যেটুকু নিরাপত্তা ছিল তারও অবসান হয়। পণ্য থেকে আরম্ভ করে সব কিছুরই মূল্য নির্ধারিত হতে আরম্ভ করে টাকা দিয়ে। কিন্তু সে টাকা চলে যেতে থাকে বিদেশী-বণিকদের মালখানায়। বিদেশী বণিকদের দ্বারা ভারতীয় বণিকেরাও নাজেহাল হতে থাকে। ভারতীয় বণিকদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ বণিকেরা রীতিমত দস্যুবৃত্তি দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে। ১৮১৪ সনের এক আইন অনুসারে তিন-চতুর্থাংশ ইংরেজ নাবিক ছাড়া কোন জাহাজ ইংলণ্ড যেতে পারে না। নানা কলাকৌশল করে বিদেশী বণিকেরা এ দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য ধ্বংস করে। অত্যাচার বিধিনিষেধ, আইন প্রভৃতির দ্বারা প্রথমে কৃষি ও পরে বাণিজ্য কোম্পানীর করতলগত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের তৈরী মাল বেচবার বাজারে পরিণত হয়। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সনের ভেতর ভারতে ইংলণ্ডের বস্ত্র-আমদানী বেড়ে গেল শতকরা ৬২ ভাগ। ফলে ভারতের কারিগরেরা শিল্পচ্যুত হয়ে কৃষির ওপর নির্ভর করতে থাকে। কিন্তু সেখানেও তখন চলেছে বণিকদের সর্দারী। অবস্থা অসহ্য হলে ১৮৩১ সনে ১১৭ জন ভারতবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত

এক স্মারকলিপি প্রিভি-কাউন্সিলের নিকট পাঠানো হয় প্রতিকারের আবেদন জানিয়ে। তাতে কোন ফল হয় না। এই সময় অবধি কিছু কিছু ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে যেত। ১৮৪৬ সন থেকে তাও বন্ধ হয়। এই বৎসর একগজ কাপড়ও বিদেশে রপ্তাণি হয় না, অথচ ২১৩,৮৪০,০০০ গজ বিলাতী কাপড় এদেশে আমদানী করা হয়। জনতার অসন্তোষ—সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের মারফৎ প্রকাশিত হতে থাকে।[১] শিক্ষিত বাঙালী এবং কিছু পাদরী ও ইউরোপীয়বন্ধু নীল বিদ্রোহে কৃষকদের সমর্থন করলেও সিপাহী বিদ্রোহকে নিন্দা করেছেন। অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহকেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি।

বণিকশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধিতে পণ্য বিনিময়ের যে বিস্তৃতি ঘটে তাঁর ফলে একদল আধা-বণিক আধা-কুশীদজীবী মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটে। তারা ইংরেজী শেখা ও ইংরেজবনার ব্যাপারে অত্যুৎসাহ দেখাতে থাকেন। পূর্বে যেখানে, অ্যাডমের রিপোর্ট অনুসারে, একদিকে সংস্কৃত টোল, অন্যদিকে মুসলমানদের মাদ্রাসা, এই দুইর পাশাপাশি অসংখ্য হিন্দু পাঠশালা আর মুসলমানদের মক্তব ছিল এবং যেখানে দেশীয়দের প্রধানত অর্থকরী শিক্ষা দেয়া হত, সেখানে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি আমদানী করার দিকে ঝোঁক গেলে দেশীয় শিক্ষা বন্ধ হয়। দেশীয় পাঠশালায় শেখান হত—পড়া, লেখা, চিঠিপত্র রচনা, প্রাথমিক গণিত, চাষবাস ও ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ। পড়ার আগে লেখা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করানো হত। টোলের শিক্ষা ছিল অন্য জাতের। তারসঙ্গে মহাজনী হিসাব-নিকাশ শিক্ষার যোগ ছিল না। মাদ্রাসা ও মক্তবে তা শেখান হত। মক্তবে হিন্দুরাও পড়ত। এখানে প্রাথমিক ব্যাকরণ, চিঠিপত্র লেখা, লোককথা ও লোকগীতি, এবং কোথাও কোথাও ছন্দ, অলঙ্কার, চিকিৎসা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয়ে ছাপা বইর চলন ছিল না। হাতে লেখা পুঁথি ব্যবহৃত হত। ইংরেজ আমলের পূর্বে এ দেশে এরূপ শিক্ষা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এ শিক্ষা ছিল মোগলযুগের উত্তরাধিকার। মোগলসাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগলদের শিক্ষানীতি নিম্নমান হয়ে চলে। আরম্ভ হয়ে যায় জমিদারীপ্রথার বিবর্তন। ইংরেজ জমিদারী প্রথা চিরস্থায়ী করে জমিদারদের মিত্র বনে যায়। জমিদার আর ইংরেজদের মুৎসুদ্দীগিরি করে উচ্চশ্রেণীয়রাও তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলে।

তাদের ছেলেরা ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজদের অনুকরণ করার ব্যাপারে কিরূপ আত্মহারা হয়ে পড়েছিল তা আগেই বলেছি। এই পথে আসে পাশ্চাত্যানুকরণের জোয়ার। জোয়ারের মুখে দাঁড়িয়ে জেমস লঙ বললেন—দেশীয় সাধারণের মধ্যে দেশীয় ভাষার মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও নানা ধরনের চাপের কাছে যখন সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করলেন, তখন দেশীয় শিক্ষিত প্রধানেরা তাঁদের শ্রেণীধর্ম অনুসারে উচ্চবর্ণের শিক্ষা সংস্কারকেই অগ্রাধিকার দিলেন। উচ্চগোষ্ঠীর মুসলমানেরা বাদশাহী ঐতিহ্যের উত্তরসাধকরূপে ইংরেজী শিক্ষাকে যে অবজ্ঞা করতে থাকেন তা স্মরণে আছে। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করতে আবদুল লতিফের চেষ্টার কথা বলেছি, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর চেয়েও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন সৈয়দ আহমদ। ইংরেজদের নতুন শিক্ষানীতি শহর ও গ্রামের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করে। বড়লোক ও গরীবদের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য প্রথম অ্যাডম ও পরবর্তীকালে কেরী, মার্শম্যান, লঙ, কৃষ্ণমোহন ও প্যারীচাঁদ কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনের যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা কার্যকরী হয় না। কারণ, কারিগরী শিক্ষাদানে কর্তাদের উৎসাহ ছিল না। তাঁদের উৎসাহ, মেকলের ভাষায়—"is to educate school masters to the next generation" কারণ,"...a single self of a good European library was worth the whole of the native literature of India and Arabia...What Greek and Latin were to the contemporaries of More and Ascham, our tongue is to the people of India" এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ লর্ড বেণ্টিক ঘোষণা করলেন—ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান অধ্যয়নের নিমিত্ত সমস্ত সরকারী অনুদান ব্যয়িত হবে। জাতীয় আন্দোলনের সময় দেশনেতারা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে চলিত এই শিক্ষাকে 'ছিন্নমস্তা' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কারণ, এই শিক্ষা মধ্যবিত্তশ্রেণীর একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। দেশনেতা ও এ দেশীয়-দের বর্তমান শিক্ষার গলদের প্রতি যাঁরা সচেতন করান তাঁরা কেরী-অ্যাডম ও লঙের মত কিছু পাদরী এবং জোনস, ম্যাকাঞ্জি, উইলকিনস, প্রিন্সেপদের মত কিছু ভারতপথিক বা ওরিয়েণ্টালিস্টস। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৮৩৫ সনের মেকলে মিনিট অনুসারে ১৮৫৪ সনে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ১২।১৪ বছর নতুন শিক্ষানীতি লক্ষ্য করে জেমস লঙ ১৮৬৮ সনে লিখলেন—"বাঙলায়, যেখানে দেশীয় সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা কার্যত জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন,...সেখানে দেশের শান্তিই হচ্ছে

বিঘ্নিত। ...এই উপেক্ষার ফলাফল হবে বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ স্যার জে. সাটলওয়ার্থ যা এত চমৎকার ভাবে বলেছেন, তাই; বিলাস আর দৈন্যের মধ্যে পার্থক্য দীর্ঘস্থায়ী করে। একদিকে অগাধ ধনসঞ্চয় আর অন্যদিকে অপুরস্কৃত প্রাণান্তকর শ্রম। একদিকে উচ্চ সংস্কৃতির মাপ অন্যদিকে বর্বরতা, একদিকে রাজনৈতিক অধিকারভোগ অন্যদিকে অজ্ঞানতা ও দারিদ্রের দোহাই দিয়ে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা—এ সবই সমাজতন্ত্রের পথ সুনিশ্চিত করে দেয়।"[১] জেমস লঙ দেশীয় সাধারণদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি কি ভাবে তাঁর সীমাবদ্ধ সামর্থ অনুসারে দেশীয় সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করতে থাকেন তা আমরা লক্ষ্য করেছি। ভারতের কৃষক ও সাধারণদের যে ভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তার মধ্যে লঙ রাশিয়ার ভূমিদাসপ্রথা ও আমেরিকার দাসপ্রথারও মিল দেখতে পেয়ে শাসকদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। ত্রিশ-বত্রিশ বছর এদেশে থেকে ও শেষ জীবনের চৌদ্দ-পনের বছর লণ্ডনে বসবাস করে যে চিন্তা ও ভাবনা দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন তা হচ্ছে জনসাধারণের মুক্তি—তাদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার অনাচার শোষণ ও হিংসা পরিহার করার চেষ্টা।

বিভিন্ন ধরণের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব অবসানের পর নতুন দ্বন্দ্ব—মাতৃভাষা বনাম ইংরেজী। দেবেন্দ্রনাথ, লঙ প্রভৃতি মাতৃভাষার সমর্থক। ঈশ্বরচন্দ্র, মেকলে আদি ইংরেজীর সমর্থক। দেশীয় প্রধানদের মধ্যে নানা মত। তাঁদের কোন কোন মতের সঙ্গে লঙের অনৈক্য, কোন কোন মতের সঙ্গে ঐক্য। কিন্তু ঐক্য-অনৈক্যর উদ্দেশ্য এক নয়। লঙ জমিতে রায়তদের স্বত্বদানের জন্য নীলচাষীদের সমর্থন করতে থাকেন। অন্যেরা অন্য কারণে নীল চাষীদের সমর্থন করেন।

ইয়ং-বেঙ্গলীরাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমালোচনা করতে থাকেন। এর দ্বারা রায়তদের দুর্দশা কি ভাবে বেড়ে যায় তাও তাঁরা তুলে ধরেন। রায়তদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে অনেক আগেই সিলেক্ট কমিটিতে রামমোহন যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, লঙ দেশীয়দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে কথা আরও জোর গলায় বলতে থাকেন। নানা সামাজিক তথ্য তুলে ধরে নিজ বক্তব্যকে সমর্থন করতে থাকেন। লঙ সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বের প্রতি দেশীয়দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই এ দিকে নজর দিতে থাকেন। লঙের সমস্ত কাজ ছাপিয়ে নীলদর্পণ প্রকাশই এখন আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃত প্রান্তরে লঙকে দেখতে না

১। জেমস লঙ সম্পাদিত অ্যাডামের রিপোর্টের ভূমিকার অংশ গিরিন চক্রবর্তী অনূদিত।

পেয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে এক লহমা দেখে তাঁর সম্পর্কে মতামত গঠন করি।

নীলবিদ্রোহ ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমরা যে সব কথা বলেছি তার সঙ্গে বি. বি. ক্লিঙের "The Blue Mutiny"-গ্রন্থের পর আর কিছু বলার নেই। ক্লিঙের দৌলতে আমরা জানি—"Since prehistoric times Indigo had been grown and processed in India, and during Roman Empire and Middle Ages small quantities had been exported to Europe...by the beginning of the nineteenth century the East India Company had brought to life a major plantation industry in Lower Bengal...Until 1829 European Indigo Planters were forbidden by the Government to lease or purchase lands outside their immediate factory grounds. Instead of cultivating indigo on his own land with hired labour the planter was forced to advance money to nearby peasants to induce them to plant the crop.... The amount of indigo produced in Bengal.was determined not by the needs of European cloth makers but in response to the demands of the remittance trade... After 1802 the Company discontinued its advances and from 1807 until 1830 bought indigo for remittance purpose on the open market in Calcutta. These purchases artificially raised the price of indigo, stimulated over-production, and perplexed the private traders... In almost every year from 1839 to 1847 the price of indigo declined (Economist, London 15/2/1845)... Before 1847 almost every factory had been purchased with borrowed capital; after 1847 a large number of the concerns that failed, especially in Nadia and Jessore, were bought cheaply and paid off rapidly, leaving the planters relatively independent. Indians and Europeans hired to supervise production increased the burden of extortion on the peasants while the owners demanded greater economies and authorised less liberal advances to the cultivators. In effect, the fall of the Union Bank led to a more oppressive system of indigo planting in lower Bengal...Between 1848 to 1858 production averaged 23 percent less than it had in previous decades (W. M. Reid **The Culture and Manufacture of Indigo,** Cal. 1887)... For thirty years, from 1826 to 1856, indigo was surpassed as an export only by opium, whose trade was a Government monopoly. In the late 1850's the total value

of exports from Bengal continued to rise." ১৮৫৯ সনে নিম্নবঙ্গের নীলকরদের সংখ্যা প্রায় ৫০০। বাঙলার উৎপাদিত নীলের অর্ধেক উৎপন্ন হত নদীয়া ও যশোর জেলায়। এখানে নিজাবাদী ও রায়তী এই দুই পদ্ধতিতে নীল চাষ হত। রায়তী চাষের জমির মালিক প্রধানত ছিলেন জমিদারেরা। প্রজারা তা চাষ করত। ইউরোপীয় নীলকরেরা গ্রাম বাঙলায় ছড়িয়ে পড়লে তারা জোর করে প্রজাদের দিয়ে নীল চাষ করাতে থাকে। অন্য ফসল বাদ দিয়ে নীল চাষের জন্য জোরজুলুম, বেত্রাঘাত, প্রহার ইত্যাদি করতে থাকে। এর ফলে জমিদারদের আঁতে এবং আয়ে আঘাত আসে। তাঁরা সরকারের কাছে নালিশ জানাতে বাধ্য হয়। যদিও নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়নের ব্যাপারে সরকারও অবহিত ছিল, তবু প্রতিকারের ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু ১৮১০ সনে লর্ড মিণ্টো চারজন নীলকরের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করেন এবং ১৮৫৯ সনে লর্ড ক্যানিং আরও কঠিন হলেন। তবু "The oppression and violence continued".

নীলকরেরা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। লর্ড বেণ্টিক কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের জানালেন—"The occasional misconduct of the planters was more than offset by the benefits they brought to the countryside." বেণ্টিক "envisioned the rise of new India with religious sects incorporating Christian ethics and a populace demanding European luxuries and English education, inaugurating new commercial enterprises and co-operating with Europeans in business" এই সময় তিনি এ-ও জানালেন এবং বললেন—সরকারের নানা কাজে নেটিভদেরও নিয়োগ করতে হবে। বেণ্টিকের এই নীতিতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস বিরক্ত হয়। নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন বেণ্টিকের বিরোধিতা করে বললেন যে, ভারতীয়রা "should not participate in any way in the Government. They should be tried under their own laws in separate courts and never be called upon to serve on juries to judge Englishman. Because of differences in character, religion, habits and language, their association with Europeans as equals would lead to continual strife." এই মতানৈক্য ১৮৩৩ সনের চার্টারে অনেকটা মীমাংসিত হয়। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সম্বন্ধ ঠিক করার ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেলের অধীনে কাউন্সিল ও ল কমিশন গঠিত হয়। লর্ড মেকলে ল কমিশনের সভাপতি হয়ে ১৮৩৪ সনে এ দেশে আসেন। তিনি "shared the utilitarian conviction that legal code should be

constituted along rational and functional lines and as a liberal he believed that the major role of the Government should be to administer justice purely and cheaply...he drafted Act XI of 1836 which removed the right of Europeans to appeal to the Supreme Court in civil cases...Macaulay defended his measures on grounds that the Government should not support special privilges of any group, but should act as a firm and impartial despotism and do justice to all without distinction of race."[১]

১৮৫৩ সনে গঠিত হয় "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটি।" এই সোসাইটি এবং অন্যান্য সভা ও মানবদরদী ইউরোপীয়রা—"wanted to diffuse British civilization and christainity in India...The politically oriented wanted to protect India against Russian expansion by colonising the northwest frontier and fostering trade with Tibet and Central Asia"[২] ১৮৫৮ সনের মধ্যে ভারতকে কলোনী গড়ার আন্দোলন চরমে ওঠে। পার্লামেণ্টে উইলিয়াম এওয়ার্ট ঝড় তুললেন। কিন্তু ভারতের শাসকবৃন্দ, বণিক ও কোম্পানীর লোকেরা এর বিরোধিতা করতে থাকে। পার্লামেণ্ট "Select Committee on European Colonization and Settlement in India গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্টে অনেক সংস্কারের নির্দেশ থাকে। ইউরোপীয়দের নির্দেশ দেয়া হয় দেশীয়দের সঙ্গে দায়িত্বশীল আচরণ করতে। জেমস লঙ আদি পাদরীর দল এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন করলেন এবং সে ভাবেই কাজ করে যেতে থাকেন। বিরোধীরা চলতে থাকেন নিজেদের মত। লিবারেল চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একদিন তিনি নিজেই দেশজ সমাজের প্রেমে পড়ে যান। এই প্রেম ও চিন্তাভাবনাই তাঁকে এদেশে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অনুশীলনে উৎসাহিত করে।

॥ ৬ ॥

সকলেরই জানা যে এদেশে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের সূচনা লঙের প্রচেষ্টাতেই হয়। তিনি পোপের—মানুষই মানবজাতির যথোপযুক্ত আলোচ্য বিষয়—এই আদর্শ সম্মুখে রেখে এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। মানুষ কি ভাবে মানুষ হল, কি ভাবে উন্নত হল, কি করে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে শিখল,

এই সব বিষয় অনুশীলন করার জন্য সমাজ-বিজ্ঞান প্রবল প্রতাপে এখন এগিয়ে চলেছে। এই বিজ্ঞানের দ্বারা সমজের নানাদিক জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ, প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন সংস্থার সদস্য। শিশু পরিবারের অংশ, পরিবার প্রতিবেশীর অংশ, ধর্ম সকলেরই পালনীয়। সমাজ, ধর্ম, মানুষ, শহর, নগর, সরকার, আঞ্চলিকগোষ্ঠী, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবই এ বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সমাজ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন সমাজের বিভিন্ন অংশে মানুষ কি ভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়, কি ভাবে কাজ করে, খেলাধুলো, আমোদ-আহলাদ, পুজার্চনা প্রভৃতিতে অংশ নেয়, কি ভাবে চিন্তা করে, আদানপ্রদান, হাবভাব, ব্যবহার, পরিবেশ, চালচলন, কথাবার্তা, যোগাযোগাদির দ্বারা এগিয়ে যায় তা। অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে সমাজ বিজ্ঞান নতুন, লঙের আমলে সবে কাজ শুরু হয়েছে বিদেশে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই বিজ্ঞানকে এদেশে আমদানী করলেন।

সর্বপ্রথম গ্রীক লেখকেরা সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তারপর ফরাসী বিদ্বান কোঁৎ ১৮৩০ সনে সমাজ বিজ্ঞানকে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করার দাবী জানান বিদ্বৎসমাজের কাছে। তার আগে মানব সমাজকে দর্শনের সঙ্গে যুক্ত রেখে অনুশীলন করা হত। কোঁৎ বললেন, সমাজ বিজ্ঞানীকে নিজের মত করে সমাজ অধ্যয়ন করতে হবে। এলেন স্পেন্সার তাঁর "প্রিন্সিপাল অব সোসিওলজী" নিয়ে। সমাজ বিজ্ঞানীরা নতুন খোরাক পেলেন। স্পেন্সার ডারউইনের "থিওরী অব ইভলিউশনকে" প্রাধান্য দিলেন। তা থেকে সমাজ অধ্যয়ন বা সোসাল স্টাডিজ আরম্ভ হয়ে যায়। মানব সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপার এ বিদ্যার অন্তর্গত। কম্যুনিটি লাইফ, নৃতত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, গভর্নমেন্ট প্রভৃতি সবই অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয়। জানা যায় যুদ্ধের দ্বারা মানুষ কি ভাবে বদলে যায়, কি ভাবে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ও অবক্ষয় অনুষ্ঠিত হয় তা। রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, অগ্রগতির আন্দোলনের ফলাফল, কারিগরী বিদ্যার উন্নতি বা অবনতি জনিত ফলাফল, কি ভাবে সৎ নাগরিক হওয়া যায়, কি ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, দায়-দায়িত্বের কথা বোঝে, অতীতকে জানে, নিজ দেশ এবং অন্য দেশের যাবতীয় তথ্যাদি জানে ইত্যাদি সবই এর আওতায় চলে আসে। ইতিহাস অতীত ঘটনা জানায় আর সমাজ-বিজ্ঞান জানায় কি ভাবে মানুষ ঘটনা পরম্পরার দ্বারা নানাভাবে নিষ্পেষিত হয় তা।

সমাজ বিজ্ঞান আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, "stands for knowing

entire human culture. To understand culture is to learn something how it began and how it grew. It makes studies of significant social situations and analyse the changes. These changes are known as processes. It searches for the processes which bring about organisation disorganisation and reorganisation etc. among men and of group. The fundamental problem is to find out mutual actions and reactions of social phenomena in different social dynamics which means the loss of sequence a change. It helps to predict the plan. It gives insight into the difficulties of the individual and the group."[১] লঙ ও অন্যেরা যখন সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে কাজ করছিলেন তখন সমাজ বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতি সাধিত হয় নি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কাজের মধ্যেও এই সব সমস্যার উল্লেখ আছে। লঙ বললেন "Hindu society in various parts of India is in a transition state, and it is desirable to treasure up in writing the record of the past and the passing, and educated class of natives is rapidly rising, qualified not only to investigate but also to write in English the results of their investigations, literary societies and periodical litearture, are increasing among them. Natives can alone penetrate into native society. Europeans must remain in the surface ; but the two classes can work in harmony."[২] এই চিন্তা থেকেই লঙ উপরে বা সারফেসে থেকে দেশীয়দের উৎসাহিত করতেন। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন চিন্তা, তত্ত্ব ইত্যাদি দেশীয়দের জানাতেন—বক্তৃতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও গ্রন্থ রচনার মারফৎ।

লঙের সমাজ আন্দোলনের চেষ্টা আর বিদ্যাসাগর আদির সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের চরিত্র এক ছিল না। লঙ সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন সমাজ বিজ্ঞানী। সমাজ-সংস্কারকদের চেতনা বৃদ্ধিকল্পে সমাজ জীবনের নানা তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মারফৎ তিনি দেখাতে পেরেছিলেন যে সমাজ ও চেতনার যে স্তরে বাণিজ্যের প্রসার সে স্তরের মানুষ স্বার্থপর। বণিকতন্ত্রে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি স্বার্থ। ব্যক্তিস্বার্থবৃদ্ধির পথ ধরেই এসেছে আইন ও আমলাতন্ত্র। বণিকেরা যতদিন আকারে ছোট ছিল এবং প্রধানত যখন তারা নিজ নিজ দেশের ভিতর আবদ্ধ ছিল ততদিন তাদের একটা আলাদা প্রকোষ্ঠে রেখে আয়ত্তে রাখা গিয়েছিল। বণিকদের আকার

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে, বাণিজ্যের প্রসার আন্তর্জাতিক হলে, আর তাদের আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব হয় না। কারণ, বণিকবুদ্ধি চলে স্বার্থচিন্তার বা লাভক্ষতির ভিত্তিতে। যখন যেখানে তাদের স্বার্থে ঘা লাগে তখনই সেখানে তারা ভয়ংকর। তারা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। এই স্বার্থচিন্তা ও লাভক্ষতির চিন্তাদর্শের ভিতর দিয়েই আধুনিক যুগধর্মিতার বিকাশ ঘটেছে। ফলে দেশাচারকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দেখে প্রাচীন আচার অনুশাসনকে অনিবার্য বলে মনে করার ব্যাপার বন্ধ হয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন নতুন আইন-কানুনের প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে আইন ও আমলারা আসর জাঁকিয়ে বসে। অর্থাৎ বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় নতুন নতুন সমস্যা। সেই সব সমস্যা বাগে আনতে রচিত হয় নতুন নতুন আইন। আইনকে প্রয়োগ করার জন্য নানা ধরণের আমলার দরকার হতে থাকে। আইনের চোখে বাদী-বিবাদী উভয়েরই সমানাধিকার। এই আবেদনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আইনের শাসন প্রবর্তন করার জন্য বণিক ও আমলাতন্ত্রের যে ভূমিকা সে ভূমিকার জন্যই মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের চেয়ে বণিকতন্ত্রের আবেদন জেমস লঙ-আদি ইউরোপীয়দের এদেশে ও অন্যদের ইউরোপে আন্দোলিত করে। যদিও সামন্ততন্ত্রের যেমন নানান চেহারা আছে তেমনি বণিকতন্ত্রের চেহারাও সর্বত্র এক নয়। স্বদেশে ইউরোপীয় বণিকদের চেহারা আর এদেশে ও অন্যান্য কালানীসমূহে এই বণিকদেরই চেহারা ও চরিত্র যে সম্পূর্ণ আলাদা সে কথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। জেমস লঙ ইউরোপীয় বণিকদের চেহারা ও চরিত্র অনুযায়ী এ দেশীয় বণিক ও নীলকরদের দেখতে গিয়ে যে মনস্তাপে ভুগেছেন, নিগৃহীত হয়েছেন তাও আমরা দেখেছি।

যেমন বণিকতন্ত্রের মধ্যে তেমনি সামন্ততন্ত্রের মধ্যেও আমলাতন্ত্রের একটি রূপ দেখা যায়। আমলাতন্ত্র যখন বণিকতন্ত্রের সংযোগে আসে তখন সে আধুনিক চরিত্র লাভ করে। প্রাচীন আমলাতন্ত্র ও আধুনিক আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রাচীন আমলাতন্ত্র আমাদের শিখিয়েছে হিসাব পরীক্ষার পদ্ধতি। হিসাব পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয় সরকারী আমলা। এই আমলারা তখন বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় যখন সরকারী উদ্যোগে শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালিত হতে থাকে। এর ফলে বণিক সংস্কৃতি ও আমলা সংস্কৃতির মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবু উভয়ের সংস্কৃতি এক নয়। উভয়ের চিন্তা-ভাবনাও সর্বদা এক নয়। আমলারা সরকারী নীতি নির্ধারণ করে না, কিন্তু প্রয়োগ করে। নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বণিকদের উপর সরকার অনেকটাই নির্ভরশীল। নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ ব্যবহার আধুনিক আমলার আচরণবিধির অন্যতম অঙ্গ। তাতে

বণিকদের স্বার্থসিদ্ধিতে অনেক সময় অসুবিধা ঘটে। ফলে অনেক সময়ই অনেক আমলার সঙ্গে অনেক বণিকের মতান্তর ঘটতে থাকে। যে আইন বণিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত হয় না সে আইনকে অমান্য করার দিকেও বণিকদের চেষ্টা চলে। আইন অমান্যের চেষ্টা আমলারা বরদাস্ত করতে পারে না।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান কারিগরীবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার শক্তিতে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যাচ্ছে ফলে আমলাতন্ত্রও জাঁকিয়ে বসেছে। সুতরাং এ যুগের যুগধর্মিতায় একদিকে যেমন বণিক সংস্কৃতি ও রাজনীতি,আইন ও আমলাতন্ত্র তেমনি অন্যদিকে সর্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আমলাতন্ত্র যেমন চরিত্র পাল্টায় তেমনি বদলে চলে বণিকতন্ত্রের চরিত্র ও সংগঠন। পূর্বে যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সংযুক্ত হত রক্তের বন্ধনে, বণিক ও আমলা-তন্ত্রের প্রভাবে সে সম্পর্ক এখন সংযুক্ত হচ্ছে স্বার্থ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে। পূর্বে যে নীতিবোধ ও মানবিকতা আমাদের চালিত করত বর্তমানে তা পুঁথি ও গল্পের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সকলেই এখন নিয়মের অধীন। প্রয়োগ-কর্তাদের অধীন। এই নিয়ম সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। আমলাতন্ত্রের যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে সামগ্রিক প্রয়োজনের ও নিয়মের উপর। মনে রাখতে হবে, নিয়মের পিছনে সবসময় একটা সম্পূর্ণ জীবন্ত যুক্তি থাকে তা বলা যায় না। একদিকে প্রাণহীন নিয়ম অন্যদিকে প্রশাসনিক দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচার সাধারণ মানুষকে জর্জরিত করে চলেছে। তার উপর চলেছে ক্ষমতার জন্য প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে অন্যান্য বহু জিনিসের মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যাকেও কাজে লাগান হচ্ছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা প্রধানত নগরভিত্তিক। তাই নগর ও পল্লীর ব্যবধান প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার বাহকেরা নগর ছেড়ে গ্রামে বেশীদিন তিষ্ঠতে পারেন না। কারণ, যে যন্ত্রবিদ্যা তাঁদের আয়ত্তে নাগরিক উপকরণ হাতের কাছে না পেলে তাঁরা তা জুতমতো ব্যবহার করতে বা এগিয়ে যেতে পারেন না। একদিকে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার জয়যাত্রা অন্যদিকে নাগরিক চাহিদার ও সুযোগ-সুবিধার লোভ এবং বৃহৎশিল্প গ্রামের জীবন, শিল্প ও অর্থনীতিকে চুরমার করে ভেঙে দিয়েছে। ফলে গ্রামের বেকার ও অর্ধবেকারের দল শহরে ভিড় করে সেখানকার জীবনেও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সর্বত্রই চলেছে অরাজকতা। নীতিহীন শোষণ এবং ভঙ্গুর অর্থনীতি। তার উপর চলেছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখার বা আয়ত্ত করার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে বশে আনাবার কোন পদ্ধতি এখনও আমাদের অনায়ত্ত। তাই দিকে দিকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ, নগর ও পল্লীর মধ্যে ব্যবধানের সঙ্কট,

প্রয়োগধর্মী জীবনাদর্শের ব্যর্থতা প্রভৃতি সব মিলিয়ে একটা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। দেশীয় শিক্ষিত ও প্রধানদের অনেকেই যখন এই পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারেন নি তখন জেমস লঙ আদি বিদেশী ভারতবন্ধুরা এই অবস্থা মানশ্চোক্ষে দেখতে পেয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা নগরবাসীকে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছেন পল্লী ও পল্লীসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কুফল সম্পর্কে, দেশীয় ভাষা শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজবনা জনিত সঙ্কট সম্পর্কে। জেমস লঙ এ দেশের বণিকদের মাত্রাহীন লোভ দেখে সে লোভ সম্বরণ করার আবেদন জানিয়েছেন। বণিকতন্ত্রের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ কাজ করেন নি। বণিকতন্ত্রের যা ভাল তা গ্রহণ করতেও তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। এই বণিকতন্ত্র, অধ্যাপক অম্লান দত্তের ভাষায়, "আমাদের হিসাব রাখতে শিখিয়েছে। সেটা লাভ। গান্ধী নিজেকে বানিয়া বলতে দ্বিধা করেন নি...আমলাতন্ত্র যদি অনাত্মীয়ের সঙ্গে কাজকর্মে কিছু পরিমাণ নিয়মের শিক্ষা দিয়ে থাকে। তাবে সেটাও লাভ।"[১] অর্থাৎ বণিকতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের কাছেও আমাদের শিক্ষণীয় আছে। জেমস লঙের চিন্তাধারা এই চিন্তারই অনুরূপ। তাই তিনি রাণীর শাসনের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত শোষক বণিকদের সমালোচনা করে ভাল বণিক ও স্বদেশীয়দের স্তুতি করেছেন। তাঁর সময়ের তাঁর পরিস্থিতি ও অবস্থায় সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। তবু তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছিলেন। সমকালে বিকেন্দ্রীকরণের ধ্বনিকারদের অনেকেরই লক্ষ্য—কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা তুলে নিয়ে আরও একটু নীচুস্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। লঙ সে ধরণের বিকেন্দ্রীকরণের স্বপক্ষে ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন—শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সংগঠনের ও স্থানীয় স্বশাসিত ট্রাডিশনাল প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজ অধিকারের একটা ক্ষেত্র, পল্লী ও নগরের মধ্যে সমন্বয়, আর্থিক সাম্য, নগর-সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির ভিতর স্বাভাবিক ও সৃজনধর্মী দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়ার ভিত্তিকে শক্ত করতে। তিনি লোকসংস্কৃতির মানবিকতার ভিত্তি এবং নগর সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির যোগে নতুন মানবিক ভিত্তি বা মানবিকতাবোধ ও নতুন যুক্তির সন্ধানে ছিলেন। রামমোহন আচার শাসিত সমাজে যে যুক্তিধর্মিতার প্রবাহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সেই প্রবাহকেই এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টাও তাঁর মধ্যে ছিল, যেমন তা ছিল বহু দেশীয় শিক্ষিত ও প্রধানদের মধ্যে। যদিও সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক ছিল না।

রামমোহন-আদি বহু বিশিষ্ট দেশীয় প্রধান যখন ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে জোর আন্দোলন চালাচ্ছেন তখন কেরী, মার্শম্যান, জেমস লঙ-আদি বহু বিদেশী মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছেন। অজস্রবার উচ্চারণের গুণে এমন একটা ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়েছে যে "কেরাণী" সৃষ্টি করাই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য। "অথচ ওটাকে অর্ধসত্য বলেই স্বীকার করা সম্ভব। তাও 'কেরাণী' শব্দটিকে অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে তবে। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো পাঠ্যক্রম ও পুস্তকের তালিকা দ্রুত দেখে নিলেও বোঝা যায় যে শুধু কেরানী তৈরী করার জন্য অতসব প্রয়োজন ছিল না। বরং বলা যেতে পারে ইংরেজী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল উকিল ও ডেপুটী তৈরী করা। অনিবার্যভাবেই অধ্যাপকও হয়েছে। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়র।... ডেপুটির সঙ্গে যোগ হল উকিল। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার এরা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ হিসাবেও এঁরা উল্লেখযোগ্য।"[১] অনেকেই অনেকভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন এবং আমরাও বলেছি যে মেকলে "প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল না জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। কেরী, মার্শম্যান কিন্তু উনিশ শতকের গোড়াতেই জোর দিয়েছিলেন জনশিক্ষার উপর। মাতৃভাষাকে ওরা জনশিক্ষার মাধ্যম করে তুলতে চেয়েছিলেন।"[২] অধ্যাপক অম্লান দত্ত উল্লিখিত নাম দুটির সঙ্গে জেমস লঙের নামটি থাকা উচিত ছিল। মাতৃভাষার দ্বারা দেশীয় জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দিকে জেমস লঙের প্রচেষ্টার কথা আমরা নানাভাবে তুলে ধরেছি তা সুধী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। তিনি শুধু মাতৃ-ভাষার শিক্ষাই নয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকেও অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেও প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেরী, মার্শম্যান, লঙ, কৃষ্ণমোহন ও প্যারীচাঁদের প্রচেষ্টা যে মেকলে ও মেকলেপন্থীদের দাপটে মার খায় অর্থাৎ সরকারী স্বীকৃতি পায় না তাও উল্লেখ করেছি। এরই ফলে গত শতকের যে জাগরণ তা হয়ে পড়ে নগরভিত্তিক। পল্লী অঞ্চল এ জাগরণের কোন সুফল পায় না। গ্রাম শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করল, আর নগরের যুক্তিধর্মিতা ওকালতিবুদ্ধি ও ডেপুটির সাবধানী মানাবৃত্তিতে পর্যবেশিত হল। এর সঙ্গে প্রয়োগধর্মী বৈজ্ঞানিকযুক্তির বলিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হল না। জেমস লঙ আদি বিদেশী এবং কিছু দেশীয় প্রধানদের সতর্কবাণীতে যদি সেদিন আমরা কান দিতাম তবে অবস্থা আজকের মত এমন শোচনীয় হত না বলে অনেকেই এখন মনে করছেন।

॥ ৭ ॥

লঙের আমলে যাঁরা বাঙালীর সমাজ-জীবনে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সঞ্চার করেছিলেন তাঁরা কেউই ব্যক্তিচিন্তাশ্রয়ী ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নি। ইয়ংবেঙ্গলীরাও ঈশ্বর চিন্তাকে উপেক্ষা করে যুক্তিবাদকে মান্য করতেন। মিশনারী কৃষ্ণমোহন রোমান ক্যাথলিক ভক্তিবাদ ত্যাগ করে যুক্তিনিষ্ঠ প্রোটেষ্টাণ্ট মত অবলম্বন করেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী ফ্রি চার্চ গঠন করেন। সনাতনপন্থীরাও ভক্তিবাদের পথিক ছিলেন না। যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঔপনিষেদিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এই অবস্থায় যে বাঙলাগদ্য রচিত হতে থাকে তা স্বভাবতই বর্ণাঢ্য, সাবলীল এবং পরিচ্ছন্ন, সে গদ্যের ভাষাও সংযত।

আমরা জানি, প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চে ভাষা, ইতিহাস, সঙ্গীত ও অঙ্কশাস্ত্র অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন মারটিন লুথার। ষোড়শ শতকে এই চিন্তার দ্বারা কলভিন জেনেভা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের দিকে নজর দেন। কারণ, বিদ্যালয় ধর্মশিক্ষার ও ধর্মপ্রচারের আদর্শ স্থান। জ্ঞানের প্রসার ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কর্ম। তাঁরা বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও পার্থিব বিষয়সমূহ অধ্যয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকেন। উনিশ শতকে নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ শিক্ষার অন্যতম আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয় ইংলণ্ডে। রাগবি স্কুলের টমাস আর্ণল্ড ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। লঙ আর্ণল্ডের চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্যের ব্যাপারেও নীতিবাগীশ ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে এর উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নানা ধরণের কাজে যখন হাত দেন তখন তাঁর এই নীতিবোধ সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে। পূর্বেই বলেছি এই সময় বাঙলা গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোন থেকে যে Selection সংকলন করেন তাতে বিভিন্ন দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এর সাহায্যে নবাবদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনে কোম্পানীর লুঠেরাদের কার্যকলাপ, সিরাজ, ক্লাইভ, মীরকাশীম, জগৎশেঠ প্রভৃতির বিষয়ে যে সমস্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে তা বাঙালীর সমাজ ইতিহাস এবং জীবন সম্পর্কিত অমূল্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কলকাতার মিশনারী সম্মেলনে ১৮৫১ সনে তিনি যে "Peasant Degradation an Obstacle in Gospel Propagation" বিষয়ে বক্তৃতা দেন তা রায়তদের ওপর নানাবিধ অত্যাচারের তথ্যে পূর্ণ। নীলকরদের বিরুদ্ধে এবং কৃষিজীবীদের স্বপক্ষে লঙ যে আন্দোলন করেছিলেন চার্চ মিশনারী সোসাইটির

সম্পাদক ডঃ কটনের তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল। তিনি লিখেছিলেন—"ডিকেন্স ইয়র্কশায়রের স্কুল শিক্ষক, সরকারী কেরাণী, সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের অনেক চরিত্র রচনা করলেও অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত হন নি, একই কারণে লঙের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন।" কিন্তু তাতেও লঙ রেহাই পান না। লঙের জনপ্রিয়তা এবং সৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সওয়াল করতে গিয়ে মিঃ পিটারসন বলেছিলেন—"The Government of the country were on trial". উত্তরে হরিশ লিখলেন—"Nay more than that, the defendants were more numerous than the court could accommodate and a far more important body than even the Government."[১] এই উন্মাদনার মধ্যে যে জাগ্রত জাতীয় চেতনা ও বাঙালী মানসিকতার সন্ধান মেলে তার পিছনে লঙের হাত ছিল।

এ দেশীয় মনের গতিপ্রকৃতি স্বদেশীয়দের জানাবার উদ্দেশ্যে লঙ 'বেঙ্গল হরকরায়' "The Spirit of Native Press" বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। সমাজ বিজ্ঞান সভায় "On Hindu Female Education," "On Population of India," "On the Prison Discipline in Bengal" বিষয়ে আলোচনা করেও নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে থাকেন। তিনি গ্রামীণ সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভায় পাঠের জন্য। কিন্তু হঠাৎ এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য তা পাঠ করতে পারেন না। প্রবন্ধটি মুদ্রিত করে বিলি করা হয় ১৮৭২ সনের ২৬শে মার্চ। ঐদিন লঙের অবদানের কথা উল্লেখ করে সভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে বলা হয়ঃ "এই সভার প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় গভীর আগ্রহ সহকারে জেমস লঙ তাঁর বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। এই সভা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করছে। দীর্ঘকাল দেশীয় জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন সেবা করার পর স্বাস্থ্যভঙ্গ-জনিত কারণে রেভারেণ্ড জেমস লঙ খুব সম্প্রতি কলকাতা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এই সভার শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে গেছেন—সেই শুভেচ্ছায় তাঁর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হবে এবং দেশীয় জনগণকে যে মানব কল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞে তিনি ঋণী করেছেন সেই কর্মযজ্ঞের পুনরারম্ভ হবে"।[২]

মানুষের কোন কাজ বিচ্ছিন্ন নয়, একটি সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তা

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লঙের প্রত্যেকটি কাজকে সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দেখতে হবে। কি ভাবে লঙ দেশীয় বিদ্বান এবং সমাজ ঐতিহাসিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কি ভাবে তিনি ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা বঙ্কিম প্রভৃতির সাহিত্যাকাশে আবির্ভাবের পূর্বেই অনাবিস্কৃত দুর্গম পথে হেঁটে তাঁদের আগমনের পথ মসৃণ করেছিলেন তা আমরা লক্ষ্য করেছি। সরকারী বিদ্যালয়ে যখন রাজরাজরাদের বিবরণ পড়ানো হত তখন জেমস লঙ তাঁর বিদ্যালয়ে সাধারণ মানুষের কথা শোনাতেন। শিক্ষিত লোকদের কাছে আবেদন জানাতেন সাধারণ মানুষের ইতিহাস রচনা করতে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস," আদিপর্ব, বিনয় ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি," এবং বর্তমান গ্রন্থকারের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ "বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি" সাধারণ বাঙালীর জীবন ইতিহাসের মালমশলায় পরিপূর্ণ। সাধারণ মানুষের প্রতি উৎসাহিত হয়েই জেমস লঙ কৃষকদের কথা বলেছেন। তাদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল।

মনে রাখতে হবে লঙের সময়ে ডিরোজিয়ানদের পরিণতির যুগ। তাঁদের চিন্তায় ও কাজে তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, রাজকার্যে বাঙলার ব্যবহার, রায়তদের প্রতি নতুন জমিদারদের অত্যাচারের, বিরুদ্ধে ধিক্কার সমাজ সংস্কারের যুক্তি ও ন্যায়ধর্ম গুরুত্ব লাভ করেছিল। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা তখন স্বাধিকারের স্বপ্নও দেখতে আরম্ভ করেছেন। আন্তর্জাতিক লিবারেল মুভমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টাও আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ অন্যদিকে পাশ্চাত্যের আলোয় এদেশের মানুষদের সমস্যা বোঝা, উপলব্ধি করা ও সমাধানের প্রয়াস চলতে থাকে। এই সময়—"A new attitude toward local administration was spreading through the ranks of the Company's service. In the North-West Provinces Robert Bird and James Thompson in 1830's and 1840's introduced a system of district Government known as 'authoritarian paternalism'. It was later introduced into the Punjab by John Lawrence. In Bengal, the Governor General, Lord Dalhausie (1848-1856), took preliminary steps to reorganise the internal administration which had been virtually neglected since the days of Lord William Bentinck."[১] কড়া শাসন প্রবর্তিত হবার আগে জমিদারেরাই ছিলেন গ্রামের সর্বেসর্বা। নীলকরদের সঙ্গেও তাঁরা লড়াই করতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ জমিদারীপ্রথাকে নতুন আইনের আওতায় নিয়ে এলে নীলকরদের সুবিধা ও

১। Ogilvie J. N. op. cit.

অসুবিধা দুই-ই বেড়ে যায়। আগে যে সব চাষী নীল চাষ করত তারা আর সরাসরি নীলকর সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। নীলকর ও চাষীদের মধ্যে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারাই সমস্ত ব্যাপারটাকে পরিচালনা করতে থাকে। ইতিমধ্যে নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জমিদারদের নিকট থেকে লীজ নিয়ে তখন তারা হাজার হাজার বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে পারে। প্রথমদিকে জমিদারেরা নীলচাষের ব্যাপারে আপত্তি তুলতেন। কারণ, নীলচাষীদের নিকট থেকে নিয়মিত খাজনা ইত্যাদি পেতেন না। তাই অর্থের লোভে নীলকরদের কাছে জমি লীজ দিতে থাকেন। নীল-করেরা লাঠিয়াল নিয়ে চাষ করাত। তবু নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের বিবাদ বাঁধে। নীলকর ও জমিদার উভয়েই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাদের বিরোধ মেটাত। গায়ের বলে কাজ করাত। জমিদারদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নীলকরেরা ১৮৫১ সনে "ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টারস এসোসিয়েশন" গঠন করে। দুই শক্তিমানের লড়াইয়ের ফলে সাধারণ কৃষকদের দুর্দশা আরো বেড়ে যায়। আইনের শাসন প্রবর্তিত হলে গায়ের জোর দেখিয়ে কাজ করার প্রবণতা কিছু কমতে থাকে। তখন জমির মালিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে থাকেন কোর্ট। ১৮৫৯ সনের আইনের পূর্ব পর্যন্ত নীলকর ও জমিদারদের অখণ্ড প্রতাপ। উভয়েই লাঠিয়ালের জোরে বলশালী। ১৮৫৯ সনে চাষীদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্কও বদলে যায়। ক্লিঙ লিখেছেন—"Although the planters were now a more civilized body, they were also more efficient and forced cultivators to take greater pains to produce the fine quality indigo in which they took such pride." নীলকরদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে মিশনারী পাদরীরা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জার্মান মিশনারী "Bomwetsch, J. G. Linke and Frederick Schurr of the Church Missionary society...were German Lutherans who had been brought to lower Bengal to staff mission posts"[১] কৃষকদের হয়ে কথা বলার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে বিরক্ত হয় নীলকরদের কাগজ ইংলিশম্যান। এই পত্রিকা জার্মান মিশনারীদের বিরুদ্ধে অশালীন আক্রমণ করতে থাকে। বোমওয়েটস বাঙালী ললনা বিয়ে করেছিলেন বলে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে অবধি কটাক্ষ করতে ছাড়ে না ইংলিশম্যান।

॥ ৮ ॥

নিজেদের মধ্যেই যখন বাঙালীদের আদর্শগত সংঘাত অনুষ্ঠিত হতে থাকে তখন আসেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর বাঙলা পাঠশালায় বাঙলা ভাষায়

১। Kling B. B. op. cit,

বেদান্ত শিক্ষা প্রবর্তন করেন। রাধাকান্ত দেব সনাতনীদের নেতা। কিন্তু তিনি একদিকে দেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চেয়ে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে চাইলেন, অন্যদিকে মাতৃভাষার বিকাশেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন। বিদ্যাসাগর নানা প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে, মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে, বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে, নতুন চেতনা আনলেন। এখানে একটি ব্যাপার পরিষ্কার করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা যেমন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তকদের অন্যতম একজন হিসাবে চিত্রিত করেছি, তেমনি উল্লেখ করেছি বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কথাও। স্মরণে আছে, ১৮৫৪ সনের ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের তরফ থেকে স্যার জন উড যে 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' পাঠান তাই এখন অবধি সরকারী শিক্ষানীতি নির্ধারণের মাপকাঠি। এই নীতি অনুসারে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। স্তরভেদে বিভিন্ন নির্দেশ থাকে। মেকলের শিক্ষানীতিতে শুধু ইংরেজী শিক্ষাই সমর্থন পেয়েছিল। উড-এর ডেচপ্যাচে ইংরেজী ও বাঙলা উভয় শিক্ষারই নির্দেশ দেয়া হয়। ঠিক হয় উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী এবং নিম্নশ্রেণীগুলোর শিক্ষার বাহন হবে বাঙলা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঙলা বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা সরকারী উদ্যোগে নেয়া হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা যে বানচাল হয়ে যায় তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ক্রমে বিদ্যাসাগর মশাই বঙ্গসাহিত্য ও বাঙলা ভাষার সেবায় কিভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা সকলেরই জানা। কিন্তু উড ডেচপ্যাচের আগে যখন মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা নীতি শিক্ষাজগতে আসর জাঁকিয়ে বসেছে তখন বিদ্যাসাগর মশাইও সরকারী শিক্ষানীতিকে সমর্থন করেন। জনশিক্ষার বদলে উচ্চশ্রেণীদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান। ১৮৫৪ সনের পর যে শিক্ষানীতি গৃহীত হয় তাকেও অনুসরণ করেন এবং আদর্শ বাঙলা বিদ্যালয়, বাঙলা ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথাদির প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়ে লঙ কখনো দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরদের সঙ্গে একাত্ম, কখনো বিরোধী। কিন্তু তাতে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে চির ধরে না। অথবা কমন ইণ্টারেস্ট নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও অসুবিধা হয় না। তিনি দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে বিভিন্ন বিদ্বৎ সভায় মিলিত হয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটিতে, প্যারীচাঁদের সঙ্গে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীতে

এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ মিলন হয়েছে কাজের মাধ্যমে। এসব কথা পূর্ব অধ্যায়গুলোতে আলোচিত।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি তাই বহু ব্যাপার বিস্মৃত হতে তার সময়ের দরকার হয় না। মনে রাখতে হবে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের উন্মেষপর্ব থেকে যেভাবে বাঙলা এগুচ্ছিল তাকে বিদ্যাসাগর "সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন," (রবীন্দ্রনাথ) বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিম লিখেছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।" তবে গত শতকের সাতের দশক থেকেই বঙ্কিম সংস্কৃতানুসারী ভাষা অপেক্ষা চলতি ভাষার প্রশংসা করতে থাকেন। কারণ, বঙ্কিমের মতে যে রচনা সকলেই বুঝতে পারে এবং পড়ামাত্র যার অর্থ বোঝা যায় তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। "যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয় তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে,... ইংরাজী, ফারসী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে। অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেননা, যাহা অসুন্দর মনুষ্য চিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প"। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (ইংরেজী ১৮৭৮ সনে) বঙ্কিম এ কথা লিখেছেন। ভাষাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করতে বঙ্কিম সচেষ্ট হয়েছিলেন। সরাসরি এবং স্পষ্ট ভাষায় রচনার জন্য জেমস লঙ আদি বিদেশীরা প্রভূত পরিশ্রম করলেও ভাষাকে সৌন্দর্য সুষমা মণ্ডিত করতে পারেন নি।

স্মরণে আছে, নানা বিষয়ে নানা ধরণের কাজ করে জেমস লঙ এদেশ ছেড়ে চলে যাবার একমাস যেতে না যেতেই ১২৭৯ বঙ্গাব্দের (১৪।৪।১৮৭২) ১লা বৈশাখ, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন। মাত্র চার বৎসর বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করেন। এই চার বৎসর বাঙলা সাময়িক সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। বঙ্গদর্শনের পূর্বে "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৪ সনে। এ পত্রিকা

ছাড়া ১৮৫৫ সনের "বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা" 'এবং ১৮৫৬ সনের 'সর্বতত্ত্ব-বিকাশিকা'-ও বাঙলা মাসিক সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের পূর্বে কোন পত্রিকাই শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করতে পারে নি।[১] লঙের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিমাপ করতে হলে এ সব মনে রাখতে হবে। কারণ, তাঁর সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদক বাঙালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বাঙালীকে বিলোড়িত এবং বিকৃত করছিল। বাঙালী আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল যে সে ঋষি-সন্তান এবং সে অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী।

ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালীর অন্তরে আঘাত দিতে গিয়ে লিখলেন—'কতরূপ স্নেহ, করি দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'। রাজনারায়ণ 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে ও মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নিখুঁত ফটো তুললেন। বঙ্কিম লিখলেন—"দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের ঈশ্বরীর আত্মসমর্পন শুনিয়া কি হইবে। চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরাজীতে শিক্ষিত, ধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।" অনুকরণ প্রবন্ধে লিখলেন—"ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু জগতে দেখা দিয়াছে...শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, গর্দভ হইতে গর্জন...ভরসার বিষয়ীভূত।.. গোরু হইতে বাঙ্গালী কি সে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালীও সেইরূপ।.. চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে। বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারের গাড়ীতে বিলাতীমাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তৈল বাহির করিতেছে।" এই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চাবুকের মত বাঙালীর মর্মে বাজে। "লেখাপড়া দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে...আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম স্বরূপ হইবে মাত্র।" বঙ্কিমের এই ভর্ৎসনায় বাঙালী জ্ঞান ফিরে পায়।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোঁৎ-এর পজিটিভজম বাঙলায় প্রসারলাভ করেছিল। দেবীচৌধুরাণীর মুখবন্ধে বঙ্কিম "Catechism of Positive Religion" থেকে

উধৃত করেছেন—"The general law of Man's progress, whatever the point of view chosen, consist in this that Man becomes more and more religious" কোঁতের মতে মানবের চিন্তাধারা পরপর তিনটি 'ক্রম' পার হয়ে অগ্রসর হয়েছে—এই তিনটি 'ক্রম' হচ্ছে—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। লুইস এই ত্রি-ক্রম-বাদকে ব্যাখ্যা করেছেন—"Every branch of knowledge passes successively through three stages—1st, the *Supernatural* or fictitious; 2nd, the *metaphysical* or abstract; 3rd, the *Positive* or scientific." ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম কোঁতের এই বিদ্যা বিভাগ অনুমোদন করেও বিজ্ঞানের উপর 'প্রজ্ঞান' যোগ করলেন। পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের অনেকে বললেন—'বিজ্ঞান' পর্যাপ্ত নয়—দর্শন চাই। বঙ্কিম কোঁতের অনুরাগী হলেও দৃষ্টবাদী ছিলেন না। ১৭৮০ সনে "Principals of Morals and Legislation" এবং ১৭৭৯ সনের "Introduction to the Principals of Morals and Legislation" গ্রন্থের দ্বারা বেন্থাম প্রচার করলেন হিতবাদ। স্টুয়ার্ট মিল হিতবাদকে ব্যাখ্যা করে বললেন,—সুখই জীবের কাম্য—"Pleasure is the ultimate end of every rational being." সুখ-দুঃখই ধর্মাধর্মের একমাত্র কষ্টিপাথর। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেবের মুখে যে কথা শোনা গিয়েছিল 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়', তারও আগে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন—"যাহাতে লোকের হিত তাহাই ধর্ম, যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য" তা-ই নতুন করে পরিবেশন করলেন বেন্থাম।

বঙ্কিমের বাঙলার সাহিত্যাকাশে উদয়ের অনেক পূর্বেই পাশ্চাত্য হিতবাদের পূর্ণ প্রভাব চলছে বাঙলায়। কারণ, হিতবাদী স্বার্থপর নন, পরার্থপর। হিতবাদী ব্যষ্টির সুখ অন্বেষণ করেন না—করেন সমষ্টির সুখের খোঁজ। এই সুখে, মিলের মতানুসারে, 'তারতম্য' আছে। সকল সুখ সমজাতীয় নয়। সুখের মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদ আছে। বঙ্কিম এই সুখের শ্রেণীচিহ্নিত করে বললেন, সুখ ত্রিবিধ—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিনামে দুঃখ শূন্য, ক্ষণিক কিন্তু পরিনামে দুঃখের কারণ এবং শেষোক্ত সুখ সুখই নয় তা হচ্ছে দুঃখের প্রথমাবস্থা।[১] এইভাবে নিজ-নিজ চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী বেন্থাম-মিলের চিন্তাধারাকে নিজেদের মত করে গ্রহণ করে যখন দেশীয় সাহিত্যসেবক ও বিদ্বানেরা অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন জেমস লঙও তাঁদের সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করে

১। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রাগুক্ত।

তাঁদের সঙ্গে থেকে সাহিত্য ও জনজীবনকে বোঝার ও বোঝাবার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আমদানী করলেন। তাঁর মধ্যেও ছিল হিতবাদী চেতনা। কৃষকদের রায়তী সত্ত্ব দানের জন্য যে আন্দোলন তার সঙ্গে হিতবাদের চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

নতুন চিন্তাদর্শের আগমনে নীলচাষীদের উপর অত্যাচার-অবিচার নতুন চরিত্র পায়। "Now emotions quickened as the proprietors of large indigo concerns along with Indigo brokers, agents and merchants enlisted the support of the entire British Commercial community in defence of the Indigo Planters. In opposition, Government officials and missioneries joined with Bengali merchants, landholders and intelligentsia in support of the peasantry."[১] ১৮৩৭ সনে কিছু জমিদার ও ব্যবসায়ী একত্রিত হয়ে জমিদার সমিতি গঠন করেছিলেন। ১৮৩৮ সনে প্রিন্স দ্বারকানাথ এই সমিতিতে ঢুকেই নেতা। ইয়ং বেঙ্গলীরাও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই সমিতির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার জনক ফরাসী বুদ্ধিজীবী ডেভিড হিউম ও টমাস পাইন এবং বাঙলার হেনরী ডিরোজিও। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে একদিকে যেমন কোম্পানীর সরকার মহারাণীর হাতে চলে যায় অন্যদিকে মিশনারীদের কাজের ধরণও পাল্টে যায়। প্রসঙ্গত সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় ও গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের বীরত্ব, সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ যে সব বাঙালী উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন অনুচ্চারিত সেই সব বাঙালী মনের বার্তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ইন্দ্রজিৎকে তাঁর কাব্যের নায়ক করলেন। ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ রাক্ষস। দেবত্বে উন্নীত রামচন্দ্রের দৌর্বল্য ও বীরোচিত কাজের মধ্যে নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতি তুলে ধরলেন তিনি তাঁর কাব্যে। জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণকে সাজালেন দেশদ্রোহী করে। দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতিদ্রোহিতার বিষময় ফল চমৎকার বিশ্লেষণ করলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহের সমকালীন এ কাব্য তৎকালের বাঙালীকে শুধুমাত্র ছন্দের নতুনত্ব বা রসের গভীরতা দিয়েই মাতায় নি। এইসব নতুনত্ব ছাড়া এ কাব্যে যুক্ত হয়েছে মেঘনাদের বীর্যবত্তা ও সাহস। সাহসী ইন্দ্রজিৎ শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও বিক্রমের পরিচয় দিয়েছে তা দুর্বল বাঙালীকে প্রবল পরাক্রান্তশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সাহস জুগিয়েছে। স্বদেশভক্ত বাঙালীর মনে দেশানুরাগের বীজ রোপিত হলো

১। Kling B. B. cit

ধীরে ধীরে একদল বাঙালী নিয়মমাফিক আন্দোলনের সামিল হতে থাকেন। আরেকদল শিক্ষিত বাঙালী ডেপুটিগিরী, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তির মধ্যে চরম সার্থকতা দেখতে পান। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মণীষী অবধি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বেশী আশা করতে পারেন নি।

ডেপুটিবাবুদের দৃষ্টিশক্তি আরও একটু প্রসারিত হতে থাকে। ১৮৬০ সনের পর। এই বছর থেকে বাঙালী উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যেতে আরম্ভ করে। ১৮৬৩ সনে মহর্ষির দ্বিতীয়পত্র প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের কর্তাব্যক্তিরা খুশি হন নি। ভারতীয়দের জন্য এই পরীক্ষাকে আরও কঠোর করা হয়। তবু বেশ কিছু ভারতীয় এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে থাকে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের একদল শিক্ষিত যুবকের মধ্যে উন্মাদী পানীয় প্রীতির পরাকাষ্ঠাও অব্যাহত থাকে। এটা দমন করার জন্য ১৮৬৪ সনে প্যারীচরণ সরকার 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন' গঠন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রেভারেণ্ড ডাল, লঙ প্রভৃতি প্যারীচরণের সঙ্গে যোগ দিয়ে মাদক দ্রব্য নিবারক আন্দোলন দুর্বার করলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্যারীচরণের এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন—'এ আন্দোলন যুবসমাজের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়েছিল। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে নানা সৎ কর্ম করতে অগ্রসর হতে পেরেছিল'। জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করার মানসে কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা'। আলাপ, ব্যবহার পোষাক, পরিচ্ছদ রীতিনীতির সব বিষয়েই স্বাদেশিকতা প্রচার করা হতে থাকে এখান থেকে। গুড-মরনিং-গুড-ইভিনিং-এর বদলে সুপ্রভাত, সুরজনী বলা হবে। ১লা জানুয়ারীর বদলে ১লা বৈশাখ নববর্ষ পালন করা হবে। পরস্পরের মধ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও কথাবার্তায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা চলবে না। ব্যবহৃত হলে প্রতিশব্দের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে এক পয়সা দণ্ড দিতে হবে। দমকা হাওয়ার মত এ আন্দোলন প্রসারিত হয়। এই আন্দোলন একদল শিক্ষিতকে স্বাদেশিক হতে প্রেরণা জোগায় ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা ইংরেজীয়ানার প্রকোপ মন্দীভূত:হয় না। স্বদেশীভাবাপন্ন হিন্দুসমাজকে জাতীয়তার পতাকাতলে ও নবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে এগিয়ে এলেন নবগোপাল মিত্র।

কলকাতার মিশনারীরা ও কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তি তখন জমিদারদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কেউ কেউ সমাজ আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেদের জড়িয়ে ফেললেন। তা নিয়ে সমালোচনা উঠলে নিজেরা নিজেদের সমর্থন করে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন। এদের মধ্যে

ছিলেন জেমস লঙ। ক্লিঙ লিখেছেন—"Of all British missionaries the one who most vigorously champined both the ryots and the German missionaries was James Long.... James Long and Reverend Alexander Duff of the Scottish Church Mission led the faction which advocated involvement.... A Committee was appointed which included Long and Duff as members to observe the indigo disturbances as they affected missionary work. (CMS. Long to CMS London). Until late in April 1860 Long knew of the misery of the indigo cultivators only from reports of others. Then, one morning while he was studying Sanskrit with his Pandit fifty ryot appeared at his door. They had fled from Nadia and Jessore Districts to escape oppression...Long immediately called a meeting of the leading missionaries of Calcutta.... Soon afterwards called on Lieutenant Governor and found him "most anxious to ameliorate the social conditions of the ryots. They discussed plans for the Indigo Commission which was about to be appointed."১ জেমস লঙ সর্বশক্তি নিয়ে নীলকরদের অত্যাচার থেকে চাষীদের রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। রায়তদের মঙ্গল-বিধানের নিমিত্ত কলম ধরেছিলেন। শোষণ-বিরোধী প্রচার চালিয়েছিলেন। মিশনারী পাদরী হিসাবে এ কাজ তাঁর এলাকা বহির্ভূত হতে পারে, কিন্তু মানবতাবাদী বা হিতবাদী হিসাবে মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার আদর্শ আঁকড়ে থাকা কারোর আচরণীয় নীতি বহির্ভূত ব্যাপার হতেই পারে না। একদিকে রায়তদের কল্যাণ, অন্যদিকে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য গদ্যসাহিত্য ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ, সমাজ এবং স্থানের ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি কর্ম গভীরভাবে লক্ষ্য করলে লঙের মানবহিতৈষী চিন্তাভাবনা ও আদর্শ অবগত হওয়া সম্ভব। আসলে লঙ ছিলেন বিলাতের লিবারেল চিন্তাদর্শের আলোকে আলোকিত। এ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লঙের আগে ও পরে আরও বহু ইউরোপীয় স্বচ্ছ চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির হাওয়া বইয়ে দিতে পেরেছিলেন এ দেশে।

॥ ৯ ॥

উল্লেখযোগ্য, গত শতকের পঞ্চাশের দশকেই নীল ব্যবসা মন্দার দিকে। এইসময় বহুপ্রতিক্ষীত প্রশাসনিক সংস্কারও আরম্ভ হয়। "In effect,

১। I bid

the tenets of mid-Victorian Liberalism, as upheld by John Peter Grant in Bengal and Charles Wood in London, became an instrument for peasant emancipation and a barrier to unrestricted colonial exploitation. The limits that Liberalism set on economic oppression were mild enough, but they were specific: Economic relations between individuals must be free and voluntary." জেমস লঙ এ আদর্শের জন্য বহু অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন। সে জন্যই তিনি রাজনৈতিক পাদরীর আখ্যা পেয়েছেন। অর্থনীতির ব্যাপারে তিনি কৃষকদের আইনানুগ অধিকার পাইয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় তারা আদালতের বিচারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির ব্যাপারে সরকারের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপার নিয়েও রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু করতে পারে। নীল আন্দোলনের ন্যায় "An idealistic cause thus helped to shape the character of nationalism in Bengal. This in turn was to influence the political goals of all India in which the attainment of self Government was considered in separable from the realization of social and economic justice... If a foreigner like James Long could saerifice for himself for the peasantry, how could a native born Bengali remain indifferent ?[১] লঙের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি যে মমত্ব এবং ভিক্টোরীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য তার সঙ্গে দেশীয় প্রধান ও শিক্ষিতদের চিন্তাধারার অমিল দেখা যায় না।

লঙের মানবপ্রীতির জন্য তিনি এতদ্দেশীয় আপামর জনতার সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। এবং এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজ জীবনের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করে যেতে পেরেছিলেন। তবু জেমস লঙ তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পান নি। বিদেশী ও এদেশীয়দের অনেকেই এক সময় সামনে একটা পর্দা রেখে তার বিচার করেছেন। প্রথম দিকে এই পর্দা ছিল খ্রীষ্টধর্মের দিক মুখ করা, মানুষটি ভাল কিন্তু পাদরী। সুতরাং কিছু রিজার্ভেশন ছিল। পরবর্তীকালে সে পর্দা—মানুষটি পরোপকারী ও দরিদ্রের বন্ধু ঠিকই কিন্তু সরকারী খয়ের খাঁ। কেন ও কি ভাবে এ সব চিন্তা এ দেশীয়দের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

১৮৬৬ সনের ১৭ই ডিসেম্বর মিস কার্পেণ্টারের ইচ্ছানুসারে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সভা থেকে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের নতুন দীপশিখা

১। I bid.

প্রজ্বলিত হয় সে কথা আগেও বলেছি। সেখানে বাঙলার লেফটানেন্ট গভর্ণর যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমন উপস্থিত ছিলেন সীটনকার, জেমস লঙ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সুধীবৃন্দ। এঁদের সকলকে নিয়ে একটি সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলন কমিটি এবং সীটনকার, জেমস লঙ ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়। ১৮৬৭ সনের ২২শে জানুয়ারীর সভায় সাবকমিটি যে পরিকল্পনা পেশ করেন তা গৃহীত হলে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নের নতুন দরজা খুলে যায়। এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন জেমস লঙ। সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের সভায় একটি আলোচনায় মুসলমানদের সম্পর্কে লঙের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙলাদেশের মুসলমানদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমানদের জানার জন্য তাদের বিষয়ে আরও নানা তথ্য আহরণ করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। এ জন্য লঙ একটি প্রশ্নমালা তৈরী করেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মারফৎ তথ্য সংগ্রহের দিকে লঙের ঝোঁক থাকাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়েই যে তিনি প্রশ্নাবলী রচনা করেছেন তা আমরা জানি। তাঁর বক্তৃতার পর মৌলভী আবদুল লতিফ বক্তৃতা করেন। তিনি লঙের কোন কোন বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি জানালেও মুসলমানদের বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার ওপর জোর দেয়া উচিত তা মান্য করেন। চন্দ্রনাথ বসু লঙকে প্রশংসা করেন। ১৮৭০ সনের সমাজ বিজ্ঞান সভার আর একটি বক্তৃতায় বাঙালীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে লঙ বললেন—"বাঙালীরা বুদ্ধিমান এবং চতুর, কিন্তু নির্বোধ। বিদ্বৎসভার সংগঠনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে বোম্বের চেয়ে উন্নত, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ, বাঙালী অলস এবং অনেকক্ষেত্রে স্বার্থপর।" লঙের এই অবজারভেশন যে কত সত্য তা এখন আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। বাঙালীদের এভাবে সমালোচনা করার অধিকার লঙ অর্জন করেছিলেন তাঁর কাজ ও সেবার দ্বারা। তাই লঙের সমালোচনা তাঁরা হৃষ্ট মনে মেনে নিতেন।

লঙের একদিকে যখন এরূপ স্বীকৃতি তখনও কিন্তু একশ্রেণীর বাঙালী তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। কারণ, তাঁর বহু কাজকর্ম বাঙালী স্বার্থের পরিপন্থী বলে তাঁরা মনে করতেন। বাঙালীর সমাজ, জীবন ও সাহিত্য থেকে সংবাদাদি সংগ্রহ করে দেশীয় মন কর্তাদের সমীপে উপস্থাপিত করার মধ্যে তারা গুপ্তচরীয় বৃত্তির গন্ধ পেয়েছিলেন। লঙ বাঙালী কৃষক, শ্রমজীবী এবং দরিদ্র সাধারণকে ভালবাসতেন ঠিকই, কিন্তু সর্বদাই তাঁর চেষ্টা ছিল খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার দিকে।

এটাও অনেক দেশীয় ব্যক্তি পছন্দ করতেন না। পাদরী হিসাবে তিনি শুধু নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন না, অন্যধর্মেরও সমালোচনা করতেন। তাতে কিছু হিন্দু ও মুসলমান তাঁর ওপর উষ্ণ হয়েছিল। তাছাড়া, তাঁকে ঠিক বোঝা যেত না। কখন কোন ব্যাপার নিয়ে মাতবেন, কখন কোন ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করবেন তা আগে থেকে কেউই বলতে পারত না। তিনি নীলকরদের বিরোধিতা করেছিলেন ধর্মপ্রচারের ও আরো কিছু কারণে। কিন্তু তা এদেশবাসীর প্রয়োজনে লাগায় তাঁর নীলকর বিরোধিতা যে অন্য চরিত্র পেয়েছে তাতো সকলেরই জানা। এবং একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বাঙলা পাঠশালা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে তিনি যখন ঝুঁকলেন তখনও তার মধ্যে অনেকে ফন্দি আবিষ্কার করতে থাকেন নীলদর্পণ-এর মামলার পর। তখন থেকেই একদল বাঙালী তাঁকে দেখে মুখ ফেরাতে থাকেন। মুখ ফিরাতে থাকেন মিশনারী পাদরীদের একাংশও। কি ভাবে নিজ সৃষ্ট ঠাকুরপুকুর চার্চের সহকর্মীরা পর্যন্ত তাঁকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে রাখতে চেষ্টা করেছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এবং উল্লেখ করেছি কি ভাবে সরকারের কিছু আমলাও লঙকে পরিহার করে চলতে উৎসাহ দেখাতে থাকেন তা।

মনের দিক থেকে লঙকে মেনে নিতে অনেকের মধ্যেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আবার লঙের মানবসেবা, সাহিত্যসেবা, সমাজসেবামূলক কাজের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারেন না তাঁরা। ফলে, দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনায় পূর্বসম্পর্ক বহাল থাকলেও অন্তরের দিক থেকে দূরে সরে গেল অনেকে। তাঁর ভালমানুষীর দিকটা চাপা পড়ে গেল অন্য কারণে। সে জন্য তিনি যখন এদেশ থেকে চলে গেলেন, এবং ওদেশে দীর্ঘ পনের বৎসর কাটাবার পর মারা গেলেন, তখন কিছু লোক-দেখান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিছু লেখা ও প্রস্তাবও নেয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁর কীর্তিকে ধরে রাখার তেমন জুতসই কোন চেষ্টা এখনও হয় নি। বৃহৎ কোন স্মরণসভাও অনুষ্ঠিত হয় নি কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর পর। পূর্বেই বলেছি, এ জন্য লঙ নিজেই অনেকাংশে দায়ী। কারণ, লঙকে নিয়ে একসময় এদেশে মাতামাতি কম হয় নি। এক সময় এদেশীয়দের মধ্যে তিনি কম সম্বর্ধনা পান নি। হঠাৎ সে উন্মামতা বন্ধ হয়ে গেল কেন? বিদেশী বণিকচক্র যখন লঙ প্রভৃতির বিরোধী, লঙ তখন রীতিমত এ দেশীয়দের শ্রদ্ধাভাজন। তবে?

লঙের বিরুদ্ধে পাদরী সাহেবদের অভিযান ছিল নিজেদের ঘরের ব্যাপার। সেদিকে দেশীয়দের মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু লঙ নীলদর্পণ মামলার পর দেশীয়দের সমর্থন পাবার জন্য নিজ কর্মধারার সমর্থনে এমন সব কথা

ফাঁস করে দেন যা বহু দেশীয় ব্যক্তির ভাল লাগে না। তারপর ১৮৬৭ সনে লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পর দেশীয় স্বার্থ-বিরোধী শক্তি এবং পাদরীদের সঙ্গে মিশে এমন কিছু কাজ করেন যার জন্য দেশীয় পত্র-পত্রিকা তাঁকে সমালোচনা করতে ছাড়ে না। অবশ্য এ সব সত্ত্বেও তিনি নানা ধরণের কনস্ট্রাকটিভ কাজ করে যান। দেশীয় প্রধানেরা তখন লঙের কনস্ট্রাকটিভ কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারেন না। ভাবাবেগে লঙের অন্য কাজের সমালোচনায় উৎসাহী হয়ে পড়েন। তাঁরা সমর্থন পান একশ্রেণীর রাজপুরুষ, একদল পাদরী ও বণিকদের। ক্রমে এই শ্রেণীর লোকেরা দলে ভারী হয়ে উঠলে লঙ তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেন।

দীর্ঘদিন বাঙালী লঙের কার্যাবলী সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অনুধাবনে সক্ষম হয় নি। তার পরে গুরুবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা গুরুদের কাছে লঙের ব্যাপারে তেমন কিছু শুনতে না পেয়ে চুপ করে গেছেন। কেউ কেউ তাঁকে গবেষণার পাদটীকায় ব্যবহার করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন মাত্র।

॥ ১০ ॥

অনেক অনেক পরে লঙের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে এসে দেখলাম এই প্রতিভাধর মানুষটি নানাভাবে বাঙালীকে ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। আমরা তাঁকে বাঙালীদের মধ্যে বাঙালী চেতনার প্রবক্তাদের অন্যতম একজন হিসাবে সম্মান দিতে চাই। দেশীয়দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, ঈশ্বরচন্দ্র, স্যার আশুতোষ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত যে কাজ করেছেন, বিদেশীদের মধ্যে কেরী-মার্শম্যান-জোন্স-বেথুন-জেমস লঙ ইত্যাদি সেই কাজই করেছেন। দেশীয় প্রধানদের মানসিক গড়ন, উৎসাহ, উদ্দীপনা জোগাতে, তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে, স্বজাতীয় চিন্তা-চেতনার প্রতি দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে জেমস লঙ-আদি বহু বিদেশী নানাভাবে বাঙালীকে সাহায্য করেছেন একথা যদি স্বীকার না করি তবে আমরা সত্যভ্রষ্ট হব।

সকলেই জানেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগমনের পর থেকেই বাঙালীর সমাজ ও জীবনে বিপ্লব আসে। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে আমরা জেমস লঙের নামটিকেও যুক্ত করতে চাই। এই সময়ের যে বিপ্লব তা বাঙলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। প্রাক-বিদ্যাসাগর যুগে মিশনারী চালিত বিদ্যালয়ের ও হিন্দু পাঠশালার পুস্তকের বাঙলা থেকেই যে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের নবজীবনের সূচনা তা তো জানা কথাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্ব থেকে ইতিহাসের দিকে

বাঙালী পাঠক ও লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকলেও তা স্পষ্ট প্রবাহ সৃষ্টি করে বিদ্যাসাগর—জেমস লঙ প্রভৃতির আমলে। লঙ বাঙালীকে বাঙালী জীবন, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসার, বাঙালীর নিজস্ব ইতিহাস গঠন ব্যাপারে সচেতন করান। আর বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন ও বাঙলা গ্রন্থাদি রচনা করে বাঙালীকে আত্মস্থ করান। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বাঙলী চেতনার উন্মেষ কোন এককের কৃতিত্ব নয়, অথবা নিঃসঙ্গ নয়। বহুলোকের শ্রম ও মেধা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। তবু এঁদের মধ্যে যাঁরা মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দেশীয়দের ভিতর বিদ্যাসাগর-আশুতোষ-প্রফুল্লচন্দ্র থেকে বঙ্কিম এবং বিদেশীদের মধ্যে কেরী-মার্শম্যান-জোন্স-প্রিন্সেপ-জেমস লঙ ইত্যাদির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আমরা যদি অকৃতজ্ঞ না হই তবে এঁদের কথা কোনদিনই ভুলতে পারবো না। এঁদের জীবন ও কর্মধারা জানার মধ্যে আমরা ঐ সময়ের বাঙালীর জীবন ও সাধনার যথাযথ পরিচয় পেতে পারি। তাই—জেমস লঙ, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন—এই শিরোনামে বর্তমান গ্রন্থের অবতাড়না।

লঙ ছিলেন হিউম্যানিষ্ট, প্রেম ও মননের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে ব্যাকুল। কোঁতের মতই তিনি মানুষকে নিয়ে নিশ্চিন্ত ও ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাঁর সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কাজ, শিক্ষকের কাজ, অনুবাদ এবং পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতার কাজ—সবেতেই দেখি এক একটা ঝড়ের সঙ্কেত। পূর্বতন সংস্কারাচ্ছন্নদের তিনি কাঁপিয়ে তোলেন নতুন চিন্তার আমদানীর দ্বারা। আর তারফলে তিনি একদিকে অভিনন্দিত অন্যদিকে সমালোচিত। এইভাবে ত্রিশ-বত্রিশ বছর একনাগাড়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন—কোথাও সক্রিয় ভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে বা সারফেসে থেকে। শ্রম দিয়েছেন, সাধ্যমত অর্থও ব্যয় করেছেন। নীল আন্দোলন নিয়ে কৃষক ও শিক্ষিত সমাজের যে ঐক্য গড়ে উঠে ছিল তাতেও লঙের ন্যায় মিশনারী পাদরীদের দান কিছু কম ছিল না।

১৮৬৩ সনে কেশব যখন থিসটিক সোসাইটি এবং ১৮৬৪ সনে ব্রহ্মবন্ধুসভা প্রতিষ্ঠা করেন তখন জেমস লঙ বিলাতে। বিলাতে বসে একদিকে তিনি তাঁর নিজের কাজের সমর্থন আদায় করছিলেন অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষা ও অন্যান্য সংস্কার কার্যের ব্যাপারে, পরিবেশ ব্যাপারে, বিলাতের কর্তৃপক্ষকে সচেতন করাচ্ছিলেন। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা এবং বালিকাবিদ্যালয় সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য কেশবের প্রচেষ্টার অনেক আগেই তিনি পথ প্রস্তুত করেছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তৈরীর কথা বহু পূর্বেই জেমস লঙ ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৬৬ সনে

মিস কারপেণ্টার এই উদ্দেশ্যে যখন এদেশে আসেন তখন লঙ ভারতবর্ষে। মিস কারপেণ্টার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন তা স্মরণে আছে। ১৮৫৫ সনে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল শিক্ষয়িত্রী সৃষ্টির জন্য। স্বতন্ত্র বাড়ী পাওয়া না যাওয়ায় সকালে সংস্কৃত কলেজে এই স্কুল বসত।[১] অক্লান্তকর্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্মালস্কুল, চার জেলার মডেলস্কুল ও বাঙলা পাঠশালা তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তিন বৎসরের মধ্যে ছোটলাট ক্যাম্বেল বেথুন বিদ্যালয় সংক্রান্ত নর্মাল স্কুল তুলে দেন। যদিও "বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুলের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহয্য করিতে ত্রুটী করিতেন না।"[২]

১৮৫৩ সনে কালীপ্রসন্ন গঠন করেছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। সাহিত্যানুশীলনে সাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য এ সভা গঠিত হয়েছিল। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সুরুচির সাধনা। গুণীজন সম্বর্দ্ধনাও তাঁদের কর্ম-সূচীর অঙ্গ। এই সভা মধুসূদনকে সম্বর্ধিত করে ১৮৬১ সনে। ১৮৬২ সনে সম্বৰ্দ্ধিত করে জেমস লঙকে। এখানে লঙকে ভারতবন্ধু হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখেছে "The Biddhotsahini sabha headed by Baboo Kaliprosanna Singha presented valedictory address to Rev James Long on the day of his departure. The address does honour to those from whom it emanated"[৩] লঙের সঠিক পরিমাপ করতে হলে আরও কয়েকটি দিকে লক্ষ্য করতে হয়। লক্ষ্য করতে হয় তাঁর প্রবাদ সংগ্রহের দিকেও। পূর্বে এ বিষয়ে যে সামান্য আলোচনা করেছি এখানে সে আলোচনাকে একটু বিস্তৃতভাবে করা যেতে পারে।

॥ ১১ ॥

আঠারর পঞ্চাশ দশকে, আরও একটু নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় ১৮৫১ সনে, লঙ প্রথম Bengali Proverb প্রকাশ করেন। মাত্র ২১ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় ১৮৬টি প্রবাদ এতে স্থান পায়। ১৮৬৮ সনে বেঙ্গল সোসাল সাইন্স এসোসিয়েশান বাঙলা প্রবাদের ওপর বক্তৃতা দেন। ১৮৬৯ সনে Popular Bengali Proverb নামে আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বৎসর "ইউরোপ ও এস্যাখণ্ডস্থ প্রবাদমালা"ও প্রকাশ করেন। তাতে ইউরোপ ও এশিয়ার

১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রগুক্ত।
২। সজনীকান্ত দাস: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

বিভিন্ন দেশের প্রবাদ বাঙলায় অনূদিত হয়। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদে সাহায্য করেন। দু খণ্ডের প্রথম খণ্ডে ২৩৫৮টি বাঙলা প্রবাদ বর্ণানুক্রমে দেয়া আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতির চিন্তায় যা বৈশিষ্ট্য প্রবাদে প্রতিফলিত তা তুলে ধরা। এরপর লঙসাহেব আরও একখণ্ড প্রবাদমালা প্রকাশ করেন ১৮৭২ সনে। এখানে ৩৪২৯টি প্রবাদ স্থান পায়। সব প্রবাদই বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রকাশিত। বাঙলা ভাষায় তুলনামূলক প্রবাদ অধ্যয়নের সূচনা প্রবাদমালা থেকেই আরম্ভ হয়। সম্প্রতি এ গ্রন্থটিও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কলকাতা থেকে। শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও লঙের বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পুনর্মুদ্রণের হিড়িক দেখে বুঝতে পারি তাঁর গ্রন্থের অপরিহার্যতা। গ্রন্থাদি অপরিহার্য হলেও গ্রন্থকারকে জানার প্রয়োজনীয়তা অনেকের মধ্যেই অনুভূত না তা দুঃখের।

লঙ লিখেছেন—"I found the services of pandits, teachers, and inespectors of village schools, of great value in collecting them. The editors of native newspapers also lent me aid by advertising their willingness to receive and forward to me any that might be sent to them. As the best collections of proverbs are among the women, who interland their discourses plentifully with them, I paid women to collect them from Zenanas (women's quarter)."[১] এই প্রবাদমালা অন্যতম বরণীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও উল্লেখ করতে হয় এখানে সংবাদদাতার নামধাম, কোথা থেকে কোন প্রবাদ সংগৃহীত, এ ধরণের সংবাদ পরিবেশিত হয় নি যা এ যুগের গবেষকদের কাছে অপরিহার্য। তাছাড়া, উইলিয়ম মর্টন সংগৃহীত প্রায় সমস্ত প্রবাদ 'প্রবাদমালায়' স্থান পেয়েছে, কিন্তু কোথাও সে কথা উল্লেখ করা হয় নি। মর্টনের প্রবাদ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ সনে। এ গ্রন্থে ৮০৩টি প্রবাদ আছে, কিন্তু তা বিষয় অনুক্রমে সাজান হয় নি। তবে ইংরেজী অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। শেষে ৭০টি সংস্কৃত বাক্য আছে। তারও আগে ১৭২৫ সনে বঙ্গদূতে সম্পাদক নীলরত্ন হালদার তাঁর কবিতা রত্নাকর-এ ২০৫ টি সংস্কৃত নীতিবাক্য একত্র করেছিলেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মার্শম্যান বাক্যগুলোর ইংরেজী অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

প্রবাদমালার প্রথম খণ্ডে লঙের নাম ছাপা হয় না। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়

তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৭৫ সনে "Oriental Proverbs and their uses in Sociology, Ethnology, Philosophy and Education; with suggestions for their collections, interpretations and publication' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে তিনি যে রাশিয়ার অধ্যাপক স্নীগরীফকে অনুসরণ করেছেন তা মনে আছে। ১৮৮০ সনে লণ্ডন ফোকলোর সোসাইটিতে "Proverbs: English and Keltic, with their Eastern Relation" পাঠ করেন এবং সেখানে বিষয় অনুযায়ী প্রবাদের শ্রেণীবিন্যাসের কথাও যে বলেন তা-ও মনে আছে।

১৮৮১ সনে প্রকাশিত হয় "Eastern Proverbs and Emblems" এর ভূমিকায় লিখেছেন—"The material from which this little work has been compiled are scattered over more than 1000 volumes, some very rare, and to be consulted only in libraries in India, Russia and other parts of the Continent or in the British Museum....The work began a quarter century ago in the jungles of India for the instruction of the peasants and women." লঙ সংগৃহীত প্রবাদ নৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় এবং ধর্মীয় এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ তিনি প্রবাদের সংগ্রহ ও নির্বাচনের ব্যাপারে সিলেকটিভ ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের জন্যই তিনি প্রবাদের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। তুলনামূলক লোকপুরাণের চর্চায়ও প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। এর মধ্যে সামাজিক রীতি ফটোগ্রাফের মত ফুটে ওঠে, ব্যবহারিক জগতের তথ্যনির্ভর সাংসারিক জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। লঙ অনুপ্রাণিত "বাংলা প্রবাদ" সংকলক ডঃ সুশীল কুমার দে "বাংলা প্রবাদের" ভূমিকায় প্রবাদ বিষয়ে লিখেছেন "নিরর্থক না হইলেও যদৃচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলি কবিতা নয় তত্ত্বকথা নয়, নীতি প্রচারও নয়। অথচ এগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে"।[১]

প্রত্যেক জাতির মনস্তত্ত্ব বুঝতে প্রবাদের মূল্য অপরিসীম। এর ভাষা জোরাল এবং খোলাখুলি। দৈনন্দিন ব্যবহারের শক্তিশালী ভাষা জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বাঙলা প্রবাদ বাঙলা গদ্যের উন্মেষপর্বে বাঙালীর ভাব ও ভাষার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। "নীলদর্পণ, আলালের ঘরের দুলাল, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, সধবার একাদশী, কৃপণের ধন, তাজ্জব ব্যাপার, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যেমন রোগ তেমনি রোঝা, প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণ

হইতেও গ্রন্থকারদের প্রবাদ ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে"।[১] হুতোমের নকশায়-ও প্রবাদের ছড়াছড়ি। যদিও ব্যক্তিগত ভাবুকতা ও কল্পনা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ আর তেমন শক্তিশালী থাকে না। গত শতকে শুধু সাহিত্যে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও ছিল প্রবাদের অবাধ ব্যবহার। এমন একটি দিনও ছিল যখন কথায় কথায় এ দেশের মেয়েরা ছড়া গাইত। কথায় কথায় প্রবাদের অবতাড়না করত। "It is not enough to know the provebs; one must also know how to apply them to specific situations." উপরে উল্লেখিত গ্রন্থে এই সব প্রবাদের সার্থক ব্যবহার দেখতে পাই। মেয়েদের মুখের কথাতেও দেখি প্রবাদের সার্থক ব্যবহার। লঙ এ কথা জানতেন বলেই মেয়েদের নিকট থেকে মেয়ে সংগ্রাহিকাদের দিয়ে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়েছিলেন।

জনযোগাযোগ ও জনশিক্ষার কাজেও প্রবাদ কার্যকর। ধর্মশিক্ষায় এর অদ্বিতীয় ভূমিকা। সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যয়নেও এখন প্রবাদের মূল্য স্বীকৃত। শিক্ষার ব্যাপারে প্রবাদকে দুভাবে ব্যবহার করা যায়—সঞ্চিত জ্ঞানকে ছোটদের মধ্যে বিতড়ন এবং জনশিক্ষা। কারণ, প্রবাদ "developed witty poetic tradition" এবং এর মধ্যে কোন না কোন নীতিশিক্ষার ব্যাপার থাকেই। নানা দেশ নানা ভাবে প্রবাদ সংগ্রহ করেছে এবং পরবর্তী সংকলকদের সকলেই অগ্রজ সংকলকদের সংগ্রহ নিজ নিজ গ্রন্থে যুক্ত করেছেন। কারণ, নতুন সংগ্রহ "continued to act as reference works to those who wanted to appear wise in public stateut's. 'Wisdom and wit are therefore stressed in these works throughout the world'. 'Proverbs serve a specific and important intellectual function—that of subsuming the particular under the general' (G. Herzog)[২] সুতরাং পূর্বসূরীদের প্রবাদ নিজ সংগ্রহের মধ্যে নিয়ে লঙ নীতি বহির্ভূত কাজ না করলেও তাঁদের স্বীকৃতি না-দেওয়াটা সমর্থনযোগ্য নয়।

উনিশ শতকের লোকবৃত্তের আন্দোলনে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে প্রবাদ সংগৃহীত হতে থাকে। পূর্বে জ্ঞান বিকাশের আধার হিসাবে প্রবাদকে গ্রহণ করা হত। এই সময় থেকে তুলনামূলক অনুশীলনের ব্যাপারে প্রবাদকে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। তার জন্য গ্রাম্য ও মেয়েলী ভাষাচর্চার দিকেও ঝোঁক

আসে। সুতরাং "texts were collected and included in most of the tremendous dialect dictionaries."

বিশ শতকের নৃতাত্ত্বিকরা বললেন "Proverbs must be studied within groups which use them if we are to understand why so many diverse peoples have been attracted to such sententious inventions." প্রবাদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এবং বুদ্ধিদীপ্ত ঐতিহ্যানুযায়ী প্রকাশ। বিচার এবং শাসন কার্যেও তাই প্রবাদের ব্যবহার দেখি। বহু প্রবাদ সংক্ষিপ্ত গল্প। যেমন, কাঁচের ঘরে বাস করে ঢিল মারা উচিত নয়।

লঙের প্রবাদমালা সর্বশ্রেণীর বিদ্বানদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, লঙ প্রবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সুদীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন। সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নে প্রবাদের যে ব্যবহার তা লঙের আমলে আধুনিক চিন্তা। প্রথম দিককার সংগ্রাহকেরা নীতি ও ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে প্রবাদ ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন। দ্বিতীয় দফার সংগ্রাহকদের উদ্দেশ্য ছিল ভাষা ও উপভাষা শিক্ষা। সমাজ বিজ্ঞানে প্রবাদের ব্যবহার অনেক পরের ঘটনা। কিন্তু লঙ এই পরবর্তী চিন্তাকেও সমকালীন করতে পেরেছিলেন। সমাজ বিজ্ঞানে প্রবাদের ব্যবহার প্রসঙ্গে লঙ গতশতকে এ দেশে বসে যা ভেবেছিলেন পরবর্তীকালে Firth, Herzog, Herskovits, Tagbwe Messenger, Seitel, Arewa ও Dundes প্রভৃতি সে কাজ করেছেন ও করছেন বিদেশে।

॥ ১২ ॥

প্রবাদের কাজে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য যে দ্বার উন্মোচন করেছিলেন, ততোধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন লঙ এ দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসার ও বিকাশের ব্যাপারে। আমরা জানি—বই, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, প্রচারপুস্তিকা ইত্যাদি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংরক্ষিত হয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি; শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি ব্যাপারে জ্ঞান বাড়াবার জন্য গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। বিভিন্ন রকম গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদির পরিচয় সহ কার্ড নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয় গ্রন্থাগারে। এই কার্ড দেখে পাঠক প্রয়োজনীয় বইর সন্ধান পান। লাইব্রেরীর অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে বই আর বই। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বই বের করতে হলে এ ধরণের কার্ড, যা লেখক বা অথর অনুযায়ী এবং বিষয় বা সাবজেকট অনুযায়ী বা আরও নানাভাবে প্রস্তুত করা হয়, তার দরকার হয়ই। এই কার্ড না হলে অত বইর মধ্য থেকে ঠিক ঠিক বই খুঁজে বের করা মুস্কিল। লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ধরণের নম্বর দিয়ে যেমন

কার্ড বা ইনডেক্স তৈরী করা হয়, তেমনি নম্বর দিয়ে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে পত্র-পত্রিকা রেফারেন্স গ্রন্থাদিও সাজিয়ে রাখা হয়। গ্রন্থাগারের মাঝখানে সুবিধামত কোন স্থানে থাকে রিডিংরুম বা পাঠগৃহ। এখানে বসে পাঠক পাঠ করেন। দরকার মত বই বাড়ীতে নিয়ে যান। প্রত্যেক গ্রন্থাগারের নিজস্ব নিয়ম থাকে। তবে যেসব গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগার বলে পরিচিত তা পাবলিক লাইব্রেরী আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সাধারণত বই শ্রেণীচিহ্নিত করা হয় ডিউই সিসটেম অনুযায়ী। সেভাবেই কার্ড ইনডেক্সও তৈরী করতে হয়। প্রস্তুত কার্ড—বিষয়, গ্রন্থকার ইত্যাদি অনুযায়ী কেবিনেটে রাখা হয়।

১৮৭৬ সন থেকে আমেরিকায় সর্বপ্রথম ডিউই সিসটেম চালু হয়। ক্রমে তা সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখন কোন কোন গ্রন্থাগারে ডেসিমেল সিসটেমেও বই চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু এ পদ্ধতি এখনও এদেশে বা বিদেশে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

সভ্যতার শুরু থেকেই গ্রন্থাগার দেখি। পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থাগার বোধ হয় ব্যাবিলনের আক্কাদ গ্রন্থাগার। এটা ছিল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। এথেন্সে প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন গ্রীকেরা, ৫৪০ সনে। প্রাচীন রোমেও বহু পাবলিক লাইব্রেরীর সন্ধান পাওয়া গেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার টনিসিকো গ্রন্থাগার পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান আশ্রমগুলো গ্রন্থাগারের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চদশ দশক থেকেই ইউরোপে ধারাবাহিক গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। এই সময়ের কোন গ্রন্থাগারই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তা ছিল ব্যক্তিগত অথবা পুরোহিত ও যাজকদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। ফরাসী বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষ গ্রন্থাগারগুলোতে তাদের অধিকার লাভ করে। গত শতক থেকে আরম্ভ হয় সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন। জেমস লঙ এই আন্দোলনের সামিল হয়ে এ দেশে কি ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ার কাজ করতে থাকেন তার হিসাব পূর্বেই দিয়েছি।

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগারের বিষয়ে খুব কিছু জানা না গেলেও সিন্ধুসভ্যতার যুগে ভারতে গ্রন্থাগার ছিল তার প্রমাণ মিলেছে। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলা, বলভি, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি স্থানেও যে গ্রন্থাগার ছিল তা সকলেরই জানা। মুসলমান যুগে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও কয়েকটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আমলে এদেশে যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয়, তেমনি কিছু কিছু গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

বাঙলা মুদ্রণ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৭৭৮ সনে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপাবার জন্য চার্লস উইলকিনস বাঙলা হরফ তৈরী করেছিলেন। ১৮০০ সনে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা কর্মচঞ্চল এবং ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর থেকে দুখানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙলা ভাষায় প্রথম ছাপাখানার কাজ সুরু হয় হুগলীতে। হুগলীর পরই কলকাতায়। ছাপাখানার ব্যাপারে অন্যতম উদ্যোগী বাঙালী ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি ১৮১৮ সনে বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একথা অনেকেরই জানা।

ছাপাখানা মুদ্রিত বইর সাহায্যে জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাশিক্ষাকে সার্বজনীন করেছে। সেজন্য একদল দেশীয় যে ছাপাখানার উপর ক্রুদ্ধ ছিল তা পূর্বেই বলেছি। পুস্তক মুদ্রণ শুরু হবার পর পুঁথির যুগ শেষ হয়। এখন পুঁথির স্থান হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও কিছু উৎসাহী গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। এইসব পুঁথি নানারকম অক্ষরে লেখা হত। ছাপাখানার প্রসার এবং প্রকাশকদের আগমনের পর পুস্তকের প্রকাশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ১৮৫৫ সনে জেমস লঙ যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে ১৪০০ বই ও সাময়িক পত্র ছিল। লঙ সাহেবের হিসাবে ১৮৫৭ সনে ৩২২খানা বই ছাপা হয়। দুশবছরের মধ্যে পুস্তকের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যার হিসাব পাওয়া মুস্কিল। কয়েক বছর আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে গত একশ বছরে প্রতি বৎসর গড়ে সাত-আটশ বই ছাপা হয়েছে।

স্মরণে আছে, গত শতকের মধ্যকালেও কলকাতায় বইর দোকান ছিল না। এখন এখানে বইর দোকানের অভাব নেই। বই এখন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ। এর সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সব বই কেনা বা সব বইর সন্ধান রাখা সম্ভব নয়। সমকালে বই সংরক্ষণের জন্য তাই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। গতশতকেই জেমস লঙ এ ব্যাপার বুঝতে পেরেছিলেন, তাই নানা ধরণের কাজের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এটা লঙ সাহেবের অন্যতম প্রধান কীর্তি।

॥ ১৩ ॥

এই কীর্তিমান পুরুষটি এখনও যথাযোগ্য সম্মান পান নি। কি ভাবে জেমস লঙ বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবনকে নানা ভাবে উন্নত করতে চেষ্টা করে-ছিলেন আশাকরি এ গ্রন্থের পাঠক অনায়াসে তা অনুধাবন করতে পারবেন। এ দেশের নৈতিক ও সাহিত্যিক উন্নতি, ইতিহাস চেতনা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি

ও আলোচনার জন্য যেসব প্রয়াস বিদেশীরা আরম্ভ করেছিলেন লঙ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। তা বোধকরি এ গ্রন্থের আলোচনা ও তথ্যাদির সাহায্যে স্পষ্ট করা গেছে। জেমস লঙ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাঙলা ও বাঙালীকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন বলেই বাঙলা ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্রপত্রিকা, সংবাদসার, ধাতুমালা, প্রবাদমালা, ক্যাটালগ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন। এ ভাষার প্রতি এবং ভাষাভাষি জনগণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল। তিনি গভীর অনুশীলনের দ্বারা বহু বাঙালীর চেয়ে শুদ্ধ বাঙলা শিখেছিলেন। বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বাঙালী জীবনের বহু ব্যাপারে তাঁর বোধ বহু নেটিভদের চেয়ে ধারাল ছিল। তাই দেশীয়দের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভার্নাকুলার স্কুল। ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, গ্রন্থাগার স্থাপনা, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, বৃত্তি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তন করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালী কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকেন দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবর্ধনে কোন কোন দিকে নজর দেয়া দরকার—অধ্যয়ন-অনুশীলন হওয়া দরকার, তা। তাঁর এই নির্দেশে কাজ হয়। বহু গবেষক যে তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ করে পরবর্তীকালে যশস্বী হয়েছেন তা আমরা আলোকন করেছি। বাঙলা ভাষার ব্যাপারে তিনি সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণ পছন্দ করতেন। কথ্যভাষার সাহিত্যকে মর্যাদা দিতেন। প্রায় পাঁচশ বছর ফারসী বাঙলার সরকারী ভাষা ছিল অথচ বাঙলা সাহিত্যে :রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে কেন ফারসীর প্রভাব লক্ষিত হয় না এ বিষয়েও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি তৎসম শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে গৃহীত ও বাঙলা ভাষায় অবিকৃতরূপে প্রচলিত শব্দের সঙ্গে দেশীয় এবং লৌকিক উপভাষা বি-ভাষার মিশ্রণের দ্বারা বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন।

লৌকিক এবং দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে ও আরও নানা কারণে প্রবাদ সংগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তাছাড়া, প্রবাদের দাপট তাঁর সময় অবধি বাঙালী জীবনে কিরূপ ব্যাপক ছিল সে কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বৈদিক সাহিত্য থেকে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসীরামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিও আলালী ভাষা, হুতোমী ভাষা এমন কি নীল দর্পণের কথ্যভাষার মধ্যেও প্রবাদের ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে বিশেষত মহিলামহলে এখনও প্রবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রবাদের মধ্যে লঙ

বহু ঐতিহাসিক চরিত্র, প্রাচীন প্রথা, পূজার্চনা মন্দির প্রসঙ্গ, উল্লেখযোগ্য স্থান ও মানুষদের আবিষ্কার করেছেন।

তাঁর বহু চিন্তা ও বহু পরিকল্পনা এক শ্রেণীর মধ্যবিত্তকে বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করে। তার ফলে সংঘশক্তি, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনতার চেতনা জন্ম নিতে থাকে। স্ব-বোধ জাগরিত হলে বাঙালী শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আচার সর্বস্বতাকে বিচার করে গ্রহণ করার দিকেও ঝুঁকতে থাকে। তার মধ্যে স্বতন্ত্রবোধ উজ্জীবিত হয়। এ জন্যই লঙের কথা বলতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্য, শিক্ষা বিকাশের ধারা ও বাঙালী জীবনের কথা বলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে জেমস লঙ কি ভাবে ও কত ভাবে বাঙালীকে কত ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন তা। এসব কথা বলতে গিয়ে দেখাতে হয়েছে কি মন নিয়ে জেমস লঙ এদেশে এলেন, কি মন নিয়ে তিনি দেশীয় সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র-শোষণাদি নিবারণে তৎপর হলেন, কেন দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রাম ও সাধারণ মানুষদের প্রতি নিস্পৃহতায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন তা-ও। কোন পরিস্থিতিতে তিনি স্বদেশীয় বণিক ও শোষকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেন; পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের হাওয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশীয় সাধারণের মধ্যে বিতড়নের উদ্দেশ্যে কি ভাবে স্বদেশীয় ও এদেশীয়দের ঐক্য-অনৈক্যর কলরোলে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছিলেন, টাকা-সর্বস্ব, অমানবিক-অসংস্কৃত-অশিক্ষিতদের দুর্ব্যবহার তাঁকে মনের দিক থেকে কত ভাবে পীড়িত করেছিল, এবং তিক্তবিরক্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নহৃদয়ে কি ভাবে এ দেশ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন তা সবই নানা স্থান থেকে আহৃত তথ্যের আলোকে বিচার করেছি।

এবং বলেছি লঙ যে মনের পীড়নে দগ্ধ হয়েছেন তার বহু বেদনা তাঁর নিজের সৃষ্টি। তাঁর স্ব-বিরোধ এবং পুরুষকার বনাম নিয়তিবাদের দ্বন্দ্ব। তাঁর অহং এবং খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তৎপরতা তাঁকে কাছের মানুষে পরিণত করতে, বুকে জড়িয়ে ধরতে, অনেকের বেঁধেছে। কিন্তু তাতে তাঁর কাজের সুফল ভোগ করতে অসুবিধা হয় নি। যতদিন তিনি এদেশে ছিলেন ততদিন সর্বপ্রকার মিল ও অমিলের মধ্যে দাপটের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অটুট ছিল। এই জনপ্রিয়তায় চির ধরায় স্বার্থান্বেষী বণিক ও তাদের পো-ধরা দেশীয় মধ্যবিত্তদের একাংশ। তারা লঙকে না গ্রহণ না বর্জন নীতির দ্বারা অভিনন্দিত করতে থাকে তখন থেকে যখন মেকলে ও মেকলে-পন্থীরা প্রচণ্ড। লঙ মেকলে মিনিটকে মেনে নেন নি। তার সমালোচনা করেছেন। এবং নিজের বোধ ও বুদ্ধিমত চলেছেন। তাতে তিনি খুব

একটা বিরোধীতার সম্মুখীন না হলেও কিছু বন্ধুহীন হয়ে পড়েন। ১৮৫৪ সনের পর অবশ্য নীচুক্লাশের শিক্ষায় বাঙলা গৃহীত হয়। তাতে দেশীয় সাধারণদের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যাপারে লঙের যে প্রচেষ্টা ছিল তা অনেকটাই সফল হয় তা মনে করা যেতে পারে। দেশীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্যও চেষ্টা আরম্ভ হয়ে যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কি অসাধারণ কাজ করে গেছেন তা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি তাতেই জানতে পারি। পরবর্তীকালে এই ভাষা যখন নোবেল পুরস্কারে বন্দিত হয় তখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙলাকে আর অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য উচ্চশিক্ষায় বাঙলাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে যে কৃতবিদ্য বাঙালী মনীষীর কথা স্মরণ করার প্রয়োজন আছে, তিনি হচ্ছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জেমস লঙ যেমন সাধারণের মধ্যে বাঙলা ভাষার মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, তেমনি উৎসাহী ছিলেন স্যার আশুতোষ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার করতে। ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন "when Sir Asutosh-Mookerjee contemplated higher teaching and research in our languages, he had some national ideals in view and he thought that those ideals could be woven into the fabric of our academic life."* যখন স্যার আশুতোষ এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন তখন "the universities of the West too, were organizing their faculties in modern European languages. The emergence of nation-states in the middle of the nineteenth century necessarily gave an incentive to university studies in modern languages along with Greek and Latin and often such studies had an overtone of linguistic patriotism."* আশুতোষ মনে করতেন ভারতবর্ষ তার অখন্ড সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য নিয়ে না এগুলে অগ্রবর্তী দেশ ও জাতি সমূহের সঙ্গে তালে তাল ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে না। অখন্ড সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য অনুধাবনের নিমিত্ত তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বনের কথা ভেবেছিলেন তা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধমে উচ্চশিক্ষা।

শুধু-পরীক্ষায় পাশ নয় প্রকৃত জ্ঞানচর্চার জন্যই মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। অন্যথায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায়—"একজামিন পাশ করিবার

নিমিত্ত এমন হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞাণী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মোদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, যে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারাই একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিতে হয়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি। সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজী দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুন্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।...এমার্সন বলেন, "Universities are, of course, hostile to geniuses; which seeing and using ways of their own discredit routine" বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিভা বিকাশের সহায়ক নহে, অন্তরায়। ধরাবাঁধা নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া প্রতিভা বিকশিত হইতে পারেনা।..এককালে ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াছিল স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের দ্বারা। আবার যদি ভারতের উন্নতি হয়, তবে তাহাও স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের অনুষ্ঠান দ্বারাই হইবে। ভাবের দাসত্ব ও শারীরিক দাসত্ব উভয়ই জাতীয় উন্নতির সমান অন্তরায়। যাঁহারা এদেশের মনের উপর ইংরাজী ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন বা যাঁহারা এদেশের মনের উপর সংস্কৃতভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। হারবার্ট স্পেন্সার বা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বলিয়াই কোন কথা মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে। নিজের যুক্তি ও বিচারের দ্বারা উহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই স্বাধীন চিন্তার মূলমন্ত্র। ভারতবর্ষে পুনঃ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচার প্রবর্ত্তিত হউক।"[১] আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের স্বাধীন চিন্তার যুক্তি ও বিচারের বোধ বাড়াবার ইচ্ছাকে শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে নেবার ইচ্ছায় স্যার আশুতোষ—"looked upon a university as an institution which nursed a nation and its civilization... At a time when political power depends upon the vast masses of our illiterate people who make and unmake governments, politics need no longer be an intellectual exercise. Asutosh believed that there was no freedom without enligehtenment

and he looked upon universities as the instruments of that enlightenment...Asutosh thought that there could be no deep awareness of our national heritage and our national aspiration without a serious cultivation of our modern languages."* প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন নিজে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এবং শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি ও ছাত্রদের ডিগ্রীর প্রতি লালসা কিন্তু জ্ঞানার্জনের প্রতি অনীহা দেখে। স্যার আশুতোষ মনে করলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়বে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ডিগ্রীকে জ্ঞানার্জনের প্রথম সোপান হিসাবেই দেখেছিলেন। তাই তিনি ১৮৯১ সনের ২৪শে মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক ভাষাসমূহকে যুক্ত করতে। ইংরেজী সরকারী ভাষা হওয়ার জন্য ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম করার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পান নি। কারণ, প্রাচীন যুগের সংস্কৃত ও মধ্যযুগের ফারসী রাজানুগ্রহ লাভ করলেও বৃহৎ জনসমাজের ভাষা ছিল না। জনগণকে জনগণের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত তাঁর যুক্তি ছিল অকাট্য। কিন্তু স্যার আশুতোষের প্রস্তাব গৃহীত হয় না। ১৮৯১ সনের ২১শে জুলাই সিণ্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেন—"it cannot accede to the request" তাতে তিনি দমেন না। প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পনের-ষোল বৎসরের চেষ্টায় অবশেষে কৃতকার্য হন। ডঃ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন—"he was more fortunate and persuaded the Government of Minto to hold that every student in this university should, while still an undergraduate, acquire a complete knowledge of his vernacular."* অবশ্য এই স্বীকৃতির পিছনে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির যোগকেও অস্বীকার করা যায় না।

এখন নানাদিকে বাঙলা ভাষার বিস্তৃতি ঘটছে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এ ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে। তবু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করার দিকে আমাদের স্পৃহা জাগরিত হয় নি। এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয় নি। অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাই ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন—"I fear our doctoral degrees in these subjects (Ph. D. and Litt.) may soon become certificates of illiteracy. That doctoral degrees in any subject in these days

R. K. Dasgupta op. cit.

of declining academic standards may have that dire fate is not a solace for those who have a particular concern about the quality of our higher studies in modern Indian languages."*

স্যার আশুতোষ এ জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন নি অথবা জেমস লঙও এ জন্য দেশীয়দের ভিতরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন নি। দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদ ও মহানুভব ব্যক্তিরা যে আদর্শে-উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, পরবর্তীকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে তাঁদের প্রত্যাশা যে পূরণ হয়নি তা উপরের উদ্ধৃতিতে সপ্রমাণিত। এদিক সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি তা থেকে মুক্ত হবার জন্য সচেষ্ট হতে। তা করা গেলে তবেই মুক্তবুদ্ধির সংগ্রামীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে। তবেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির ধারা হৃদয়াঙ্গম করা সহজ হবে। এবং তবেই জেমস লঙের জীবন কথা রচনার উদ্দেশ্য সফল হবে।

॥ ১৪ ॥

লঙ বিরোধীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে থাকেন ১৮৬০ সন থেকে। এই সন থেকে নীলকরদের পত্র-পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকে। নীলদর্পণ মামলা সুরু হবার কয়েক সপ্তাহ আগেই ইংলিশম্যান সম্পাদক লঙকে শাসাতে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে এই বলে। Brahmin and Parihar পুস্তিকায় নানারূপ অশোভন ও অশালীন কথাও লেখা হয়, তবু তিনি পিছু হঠেন না।

নীল বিদ্রোহ দমিত হলেও এই বিদ্রোহের পর থেকেই বাঙালী মনে স্বাধীনতার প্রত্যাশা জাগতে থাকে। সেই প্রত্যাশার একদিকে ইংরেজ বিরোধিতা অন্যদিকে ইংরেজ বণিকদের ওপর প্রচণ্ড আস্থা একই সঙ্গে দেখতে পাই। একদিকে স্বদেশীয়দের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনানুকরণের জোয়ার। পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে স্বদেশের সমস্যা উপলব্ধি করার চেষ্টা। একদিকে স্টুয়ার্ট মিল, কোঁৎ প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ, অন্যদিকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মধুসূদনের ইন্দ্রজিৎ-চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা নিপীড়িত বাঙালীর অন্তরে প্রবল বলশালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস, বিভিন্ন সভার প্রসার, হেম-নবীন-বঙ্কিমদের আহবান বাঙালীকে চঞ্চল করে তোলে। বিদেশী সমাজ-নায়কদের বিভিন্ন মতবাদ একেকজন বাঙালী একেক ভাবে গ্রহণ করে এগোতে

* Ibid

থাকেন। এই পরিস্থিতিতে লঙ সাধারণ মানুষদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি রায়তদের জমিতে সত্ব দান দেবার ব্যাপারে সোচ্চার হলেন। কারণ, এর দ্বারা তাদের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সম্ভব হবে। একই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে কারা বিভাগের সংস্কার, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের মান উন্নয়নের কথাও বলতে থাকেন। দুর্বলশ্রেণীয়দের জন্য কিছু সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা গেলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বিপ্লব রোধ করা যাবে—এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

যদিও বণিকেরা লঙের বিরুদ্ধে ছিলেন তবু লঙ ইউরোপীয় মূলধন রপ্তানিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই মূলধনের দ্বারা ভারত-বাসীর জীবনের মান উন্নীত হবে। কিন্তু তা যে হয় নি, হয়েছে উল্টোটা, তা উল্লেখের দাবী রাখে না। লঙ সরকারী কর্তা, মিশনারী ও বণিকদের কাছে দেশীয় পত্র-পত্রিকার মতামত জানাতেন। লঙের আগে এ কাজ করতেন রেভারেণ্ড উইলিয়ম মর্টন। মর্টনের প্রবাদ পুস্তকের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মিশনারী পাদরীরা এ কাজ করতেন দেশীয় অনুভূতি সম্পর্কে ইউরোপীয়দের অবহিত করাতে। এরদ্বারা ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাস নিরাপদ হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বাঙালীদের কাছে এ কাজ সমর্থন পায় না সঙ্গত কারণেই। কারণ, ইউরোপীয়দের শোষণ ও এদেশে নিরাপদ বাস তাদের মোটেই কাম্য ছিল না।

দেশীয় সমাজ ও জীবন অনুশীলন করার উদ্দেশ্যেই লঙ সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করেছেন, সংগঠন গড়েছেন কলকাতা, উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর, সিউড়ী, বহরমপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে। সংগ্রাহক তৈরী করেছেন, সংগ্রাহকদের শিক্ষিত করার জন্য বলেছেন—সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ বিদ্যার চোখ না থাকলে জঙ্গলে গিয়েও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান আসে না। তেমনি সমাজের বহু প্রসারিত শাখা-প্রশাখাকে অনুভব করার মত অনুশীলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার না হলে সমাজ বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। তিনি দেশীয়দের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি চাষ করেছেন। তার ফলে সমাজ বিজ্ঞানের চিন্তা ও চেতনাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

॥ ১৫ ॥

এক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কাজ করেছিলেন, আমাদের কাছে সে কাজ অন্য উদ্দেশ্য সাধন করেছে। আর তাতে আমরা লাভবান হয়েছি। এত লাভবান হয়েছি যে তাঁর কথা মনে হলে মন প্রীতিতে প্রসন্ন

হয়ে ওঠে। তাঁর পাদরীর কাজ, ব্রিটিশ শাসনকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জীবনের প্রতি তাঁর দরদ ও ভালবাসা যে অন্য মূল্যমানের দ্বারা বুঝে নেয়া যায় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে। তার জন্য নীলদর্পণের অনুবাদ প্রসঙ্গেও বোধ হয় কিছু আলোচনা করতে হয়। এই গ্রন্থের অনুবাদকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনে যে ঝড় বয়ে গেছে, নীলদর্পণের অনুবাদক কে: তা নিয়ে যে জিজ্ঞাসা এখনও বহু বাঙালীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর সে আলোচনায় যুক্ত করে দিলাম। নীলদর্পণের অনুবাদকের নামটি জানতে পারলে অনুবাদকের প্রেরণাময় ব্যক্তিত্বের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা জাগরিত হবে। বর্তমান বাঙলার সাহিত্যিক, সমালোচক ও সাহিত্য-রস-পিপাসুদের মধ্যে মতামতের দিক থেকে যতই বিচ্ছিন্নতা থাক না কেন, জেমস লঙের মৌলচিন্তা, অধ্যবসায় ও গভীর সন্ধানী বিচারশক্তির আদর্শ গ্রহণ করলে বাঙলা সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হবে, তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা যে গভীর হবে, একথা বোধ হয় সকলেই মানবেন।

কারণ, তিনি ছিলেন ইউরোপীয় ও দেশীয় সমাজের অন্যতম যোগসূত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থকে অবহেলা করে তিনি এতদ্দেশীয়দের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি আমাদিগকে উপহার দিয়েছেন ন্যায় ও নীতি; সত্য ও সততার প্রতি অবিচল থেকে অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য, লড়াই করবার জন্য দুর্জয় সাহস।

পরিশিষ্ট—১

নীলদর্পণের অনুবাদক

সকলেই জানেন যে কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং 'নীলদর্পণং" প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সনে ঢাকা থেকে। ১৮৬১ সনে কলকাতা থেকে নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নাট্যকার বা অনুবাদকের নাম থাকে না। অনুবাদক হিসাবে A Native এই কথা ছাপা হয়। এই অনূদিত নাটকটি নিয়ে মামলা হয়। মামলায় অনুবাদকের নাম জানা যায় না। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য অনুসরণ করে বিদগ্ধ গবেষকেরা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অনুবাদক হিসাবে চিহ্নিত করলেন। কোন কোন বিদ্বান মধুসূদন রচনাবলীতেও নাটকটিতে যুক্ত করে দিয়েছেন। তবু নাটকটির প্রকৃত অনুবাদক কে সে সন্দেহ ঘোচে নি, অর্থাৎ সঠিক অনুবাদক কে সে সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি।

এই নাটকই অর্থাৎ 'নীলদর্পণ' দিয়ে বঙ্গীয় সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি। কিন্তু "যে কোন কারণেই হোক রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বাংলা নাটক রচনাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে পারে নাই"[১] অনেক বিদ্বান মনে করেন বাঙলা নাটকের মুক্তির সম্ভাবনা আসে মধুসূদনের দুটি প্রহসন[২] এবং দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ও "সধবার একাদশীর" বাস্তব ও জীবননিষ্ঠ নাটকের দ্বারা। যে সময় ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে জনজীবন ও তার ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ফারাক বেড়ে যেতে থাকে বা মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে তখন বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু ও আরো দু-একজন শিল্পী সাহিত্যিক জনজীবনের অস্তিত্বের শিকড় খুঁজতে গিয়ে 'নীলদর্পণ' ও অন্যান্য রচনা প্রকাশ করে স্বজাতিবোধ ও দেশপ্রীতির প্রমাণ দিলেন। তাঁরা যে শিক্ষিত সমাজের এলিটিষ্ট মানসিকতার দ্বারা বিভ্রান্ত হন নি, ভিক্টোরিয়ানদের রুচিগত ও নৈতিক শুচিরক্ষার আদর্শে প্রভাবিত সমাজের ছুতমার্গ ও ইনহিবিসনের চাপ অগ্রাহ্য করে বাস্তবজীবন বোধ ও দেশজসংস্কার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটকাদি, রচনা করতে পারছিলেন নীলদর্পণ আদি রচনা তারই উদাহরণ। তাই এ সব রচনা তাৎপর্যপূর্ণ। জেমস লঙ নীলদর্পণের এ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নাটকটির বাস্তবজীবন বোধ ও ফ্যাক্টস তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। রচনাশৈলী বা নাটকটির মূল্যবিচারে তাঁর উৎসাহ ছিল না। অনূদিত নাটকটি সম্পাদনা

করার সময়ও তিনি এই বোধ ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। শৈথিল্য ও ভুলের শিকার হয়েছেন এবং সম্পাদনা করতে গিয়ে একটু বেশী রকম স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন। জেমস লঙ ছিলেন ইংরেজী গ্রন্থের সম্পাদক। কিন্তু অনুবাদক কে? অনুবাদক ও সম্পাদক কি একই ব্যক্তি?

॥ ২ ॥

নীলদর্পণের অনুবাদক কে এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন বিখ্যাত জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ প্রবাসী পত্রে।[১] ঐ পত্রিকায় প্রতিবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। ঐ পর্যন্তই। ১৯৭২ সনে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে "Nil Durpan or the Indigo Planting Mirror" প্রকাশ করতে গিয়ে অনুবাদকের বিষয়টি তলিয়ে দেখি এবং মধুসূদনকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না।[২]

আদালতে লঙ সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে ১৮৬১ সনের ২০শে জুন তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতির উত্তরে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু প্রসন্ননাথ ঠাকুর প্রভৃতি চল্লিশজন নাগরিক লঙকে একটি পত্রে জানান—অনুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আপনি সংবাদপত্রের কুৎসিৎ আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন দেখে আমরা মর্মাহত। এ নাটকটিতে "এতদ্দেশীয়দের অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ইউরোপের জনগণের কাছে এতদ্দেশের জনগণের মনোভাব তুলে ধরার সৎ প্রচেষ্টাকে হেয় করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে যে নাটকটিতে এতদ্দেশীয়দের সঠিক অনুভূতি প্রকাশিত হয় নি। আমরা মনে করি নাটকে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।"[৩] লঙ পত্রটির জবাব দেন ১৫ই জুলাই, মামলা আরম্ভ হবার চারদিন আগে। জবাবে বলেন—"এদেশে মিশনারী পাদরীর কাজ করতে এসে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলেছি। আমার স্বদেশবাসীর প্রতিভা ও কর্মদক্ষতায় আমি যেমন শ্রদ্ধাশীল তেমনি তাঁদের অখ্রীষ্টিয় আচরণে আমি ব্যথিত। সত্য, ন্যায় ও মানবতার জন্য জগতের বহু মহাপুরুষের আত্মোৎসর্গ করেছেন। এ দেশের সরল অশিক্ষিত গ্রামবাসীর অন্তরের

১। "প্রবাসী" মাঘ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। ঐ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় গোপালচন্দ্র রায়ের প্রতিবাদপত্রে মধুসূদনকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করার স্বপক্ষে ওকালতি থাকে।

২। See Editor's Preface & Introduction by the Editor pp, V-XXXIII+XXXIV-C of Indian Pub Edn. of Nil-Durpan op. cit.

৩। Hindu Patriot, July 1861 ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। সরকারী নথিভুক্ত, বাকল্যান্ড, ললিতচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির গ্রন্থে উল্লেখিত।

কথা—যা তারা বলতে পারে না—তা বৃহৎ জনসমষ্টির কাছে তুলে ধরার অপরাধে যদি নির্যাতীত হই তবে তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার গৌরব অর্জন করব। এবং প্রকৃত খ্রীষ্ট মিশনারীর দায়িত্ব পালন করব।"[১]

১৮৬১ সনের ১৯, ২০ ও ২৪ জুলাই তিনদিন ধরে মামলার শুনানি চলে। ২৪ তারিখ রায় দেওয়া হয়ঃ "JAMES LONG,—after a careful and patient investigation of the charge preferred against you, the Jury returned a verdict of 'guilty' on both counts, and the Court having refused to arrest the judgement on the motion of your learned Counsel, it is now my painful duty to award the punishment called for by the verdict of the Jury... The sentence of the Court is that you pay a fine of Rs. 1000 to our Sovereign Lady the Queen, and that you be imprisoned in the common Jail for the period of one calander month, and that you be further imprisoned until the fine is paid."[২] সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার টাকা দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। মামলার খরচা বহন করেন প্রতাপচন্দ্র সিংহ। রায়ের বয়ান শুনে এ দেশবাসী রাগে ফেটে পড়ে। চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে যায়। রায় শুনতে যারা আদালতে উপস্থিত ছিল তাদের ভীড় সামলাতে বারে বারে পুলিশ ডাকতে হয়। বিলাতের কাগজেও যে রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ হয় তা আমরা আগেই দেখেছি।

অনুদিত নাটকটি প্রকাশের ব্যাপারে সীটনকার নিজেও উৎসাহী ছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপির টাইপ কপি থেকে অতিরিক্ত একটি কপি নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তা সরকারী ব্যয়ে প্রকাশের জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। এ ব্যাপারে জেমস লঙ অবগত ছিলেন না। B. B. Kling লিখেছেন—"Long had not even been aware that Seton-Karr had intended to print the translation; in fact, he had kept a duplicate copy of translation for himself (C. M. S. Long to Lord Bishop of Calcutta, Aug 24, 1861). But the Government remained silent and to save itself from embarrassment allowed Long to become the scapegoat."[৩]

লঙের সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে লঙ নিজের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে

পারেন না। দ্বিতীয় দিনে লঙ 'দোষী' সাব্যস্ত হলে লঙের অ্যাটর্ণী "arrest of judgement"-এর আবেদন জানান। ২৪শে জুলাই ফুল বেঞ্চে পুনরায় শুনানী হয়। লঙকেও তাঁর সমর্থনে বলতে দেওয়া হয়। তাতে তিনি জানান—"it was his duty to inform the authorities of Indian opinion and that if the Government had known the sentiments of the people in 1857, much bloodshed would have been avoided."১

স্মরণে আছে, লঙ জেলে—"saw and spoke to more people than he had in any previous month of his life. The visitors included chaplains, missionaries, liberal non-officials, civilians and Indian of all classes. Among the officials were Bartle Frere, Seton-Karr, Lord Ulick Brown, Registrar of Sadar Court, J. C. Erskine of the Legislative Council and Calcutta Judge McLeod Wylie" (Englishman, Aug. 24, 1861) দেশীয়দের মধ্যে যেতেন রাজা রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্যামচরণ শর্মসরকার, দীনবন্ধু মিত্র, শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি। বিশফ কলেজের ডঃ কে লঙকে বলেছেন—"he was struck with the tone of the native newspapers who were astonished at the fact of a Christian missionary cheerfully going to jail in the cause of the oppressed." তিনি বাঙলা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতিও লঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাতে লেখা হয়—"এই যদি খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা হয় তবে সারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম বিস্তারিত হউক এই কামনা করব।" লঙ চার্চ মিশন সোসাইটির কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, যে "সোমপ্রকাশ" খ্রীষ্টধর্ম এবং পাদরীদের ঘোরতর বিরোধী, সেই পত্রিকা অবধি ১৮৬১ সনের ১৭ই জুন লিখেছে—"Amongst the benefit that India and the English Government has received, the coming of the missionary to this country is the highest.... It is through them that the fame of the English nation and the righteousness of the British Government has been served." (Letter from Bomwetsch to Venn, C. M. S. July 5, 1861).

নীলকরেরা লঙের চেয়েও বেশী ক্রুদ্ধ ছিল বারাসতের জেলাশাসক অ্যাসলে ইডেন, কৃষ্ণনগরের জেলাশাসক ডবলু. জে. হারসেল, বেঙ্গল অফিসের সেক্রেটারী ও নীলকমিশনের সভাপতি স্যার সীটনকার এবং বাঙলার লেফটানেন্ট গভর্ণর স্যার পিটার গ্র্যান্টের ওপর। লর্ড মেকলে গ্র্যান্ট সম্পর্কে লিখেছেন—"One

১। Long's Statement in the Court.

of the flowers of Calcutta society: one of the little circle of people whose friendship I value, and in whose conversation I take pleasure." তিনিও রেহাই পান না।

॥ ৩ ॥

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কোম্পানীর শাসন অবসানের আগেই সতীপ্রথা রদ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-সংস্কার, সাঁওতালাদি-কৃষক বিদ্রোহ, বিধবা বিবাহ আইন, পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রেলওয়ের প্রসার, সার্ভিসের সদস্যদের বেতন-সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। চড়কপুজোর বাণফোঁড়া বন্ধ করার জন্য মিশনারীদের আন্দোলনও চলছে। নতুন প্রেস আইন (Act XV of 1857) প্রবর্তিত হলে প্রেসের জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু হয়। প্রেস আইন অমান্য করার দায়ে ১৮ই সেপ্টেম্বর "হরকরা" বাজেয়াপ্ত হয়। অপরাধ স্বীকার করে নিলে পুনরায় প্রকাশের অনুমতি মেলে। সেনা ও পুলিশবাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ সনের ২রা জানুয়ারী কলকাতার লর্ড বিশফ মারা যান। নতুন বিশফ খ্রীষ্টধর্ম প্রসারকল্পে নতুন উদ্যম নিয়ে দেশীয় জনগণের মধ্যে মিশে যাবার জন্য পাদরীদের নির্দেশ দেন। পাদরীরা দেশীয় জনগণের সঙ্গে মিশে নানা ধরণের তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা মিশনারী ও সরকারী কর্তাদের নজরে আনতে থাকেন। ১৮৫৮ সনের ২রা অক্টোবর কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। ১৮৫৯ সনের ২৯শে এপ্রিল Act X of 1859 চালু হয়। নীলকরেরা এ আইন মানে না। তারা তাদের খেয়ালখুশী মত উচ্ছৃংখল আচরণ করে যেতে থাকে। পরিবর্তিত অবস্থায় সরকারের উচ্চপদস্থ চাকরিতে মুন্সী আমীর আলী, কাজী রমজান আলী, শাহ কবিরুদ্দিন আহম্মদ প্রভৃতি মুসলমানদের নিয়োগ করা হয়। শাসনকার্যে মুসলমানদের প্রবেশে এই সমাজের অসন্তুষ্ট শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৯ সনে লেফটানেণ্ট গভর্ণর হয়ে আসেন গ্রাণ্ট সাহেব। তাঁর আমলে রেলওয়ে ব্যবস্থার আরো উন্নতি হয়। ডাকাত দমনের জন্য নতুন আইন রচিত হয়। ডাক ও তার বিভাগেরও উন্নতি হয়। তার আগে দেশবাসী একদিকে নীলকর অন্যদিকে ডাকাতদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। জলে ও স্থলে ডাকাত। বসানো হয় ডাকাত কমিশন। নীলকরদের অত্যাচার দমন করতে গঠিত হয় নীলকমিশন Act XI of 1860 অনুযায়ী। প্রকাশিত হয় নীলদর্পণ।

ইউরোপবাসীদের কাছে এ দেশীয় সমাজের কথা তুলে ধরতে গিয়ে লঙ

যশোর-নদীয়ার কথা ভাবাপূর্ণ নাটকটির অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। সরকারী সীলযুক্ত হয়ে সাধারণ ডাকঘরের মারফৎ তা বিলি করা হয়েছে এই অজুহাতে নীলকরদের তরফ থেকে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয় এ কাজ সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী হয়েছে কি না; হয়ে থাকলে এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নামধাম কি! সরকারের কাছে লেখা চিঠিতে এও জানানো হয় যে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ, অনুবাদটি নীলকরদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে পারে এবং এটি শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অবশেষে মামলা দায়ের করা হয়। সে মামলায় লঙ নিজেকে ধরা দেন।

সরকারের একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং কিছু মিশনারী নীলকরদের ওপর বিরক্ত ছিলেন। তাঁরাই 'নীলদর্পণ'-এর অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য লঙকে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ, তিনি মিশনারী সম্মেলন থেকে নীল বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও কথা বলার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাই এ কাজে তাঁর অধিকার ছিল বলে মনে করা হত।

পূর্বেই জানিয়েছি, লঙকে যখন চার্চ মিশনারী সোসাইটি থেকে বিতাড়িত করা হবে বলে ঠিক হয়, তখন লর্ড ক্যানিং কলকাতার বিশফ ডঃ জর্জ কটনকে লিখলেন—"to try to save off any such hasty and exaggegarated proceeding" (Indian Field, Aug. 24, 1861) এবং লণ্ডনের চার্চ মিশনকে লঙ জানালেন যে তিনি—"had acted throughout on the advice of Duff and Wylie and with the sanction of the Bengal Government, and insisted that he had committed no moral offence in the throwing light on Indian opinion." (C. M. S. Long to C. M. S. August 8, 186) তবু ইংলিশম্যান পত্রিকা লঙের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যেতেই থাকে, এবং লঙকে যে বিতাড়িত করা হবেই সে সম্পর্কেও নানারূপ গল্প প্রকাশ করতে থাকে। ক্লিঙ জানিয়েছেন—"the decision...proved the *Englishman* guilty of wishful thinking. His superiors supported Long wholeheartedly, and wrote line of their 'prayerful sympathy' and of their continued conifdence in his Missionary character and principles. They further expressed the hope that 'his efforts on behalf of the masses of Bengal'...will be unabated" (Minute of the C. M. S. on the Conviction and Imprisonment of Rev. James Long for Libel, Sept. 24.1861). লঙ বরাবর বলে

গেছেন যে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের নিমিত্ত সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে। এজন্যই এতদ্দেশীয়রা বলতেন—"Long had done more for the Christian religion than all the other missionaries combined" রোমওয়েটস ১৮৬১ সনের ৬ই জুলাই লণ্ডনে চার্চ মিশন সোসাইটির কাছে লঙের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"The sympathy he shows to us in every way and the help he lends to every improvement, etc. makes a much more favourable inspiration than if he was going about merely *Preaching*." জেমস লঙ এমন একটি মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন যা অন্য বহু মিশনারীর মধ্যে দেখা যায় নি। তিনি ধর্মপ্রচার যেমন করতেন তেমন দেশীয়দের কথা শুনতেন। তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করার ব্যাপারে চেষ্টা করতেন ও সৎ পরামর্শ দিতেন। দেশীয়দের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে গিয়ে তিনি দেশীয় বা কথ্যভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। লঙের বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী প্রীতির বহু নিদর্শন, এমন কি তাঁর রচিত বাঙলার বহু নমুনা ইতিপূর্বেই উত্থাপিত করেছি। সুতরাং লঙের বাঙলা পাণ্ডুলিপি দেখতে না পেয়ে বা বাঙলায় সই দেখতে না পেয়ে যারা ঠোঁট চেপে বলতে চেষ্টা করছেন লঙ বাঙলা ভাষা লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ,* তাঁরা যত বড় মাপের লোকই হোন না কেন, তাঁদের সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না।

লঙ অনুবাদের ব্যাপারে ঝুঁকি নেন না। যশোর-নদীয়ার হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের কথ্যভাষার অনুবাদ দেশীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে করা সম্ভব নয় মনে করে দেশীয় অনুবাদকের সন্ধান করতে থাকেন। যে দেশীয় ব্যক্তি বাঙলা থেকে ইংরেজী অনুবাদে সিদ্ধহস্ত এবং যিনি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের কথোপকথন এবং নদীয়া-যশোরের ভাষার সঙ্গে পরিচিত তাঁর পক্ষেই এ নাটকের অনুবাদ সম্ভব। ঘনিষ্ঠ দেশীয় প্রধান তথা প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত, রামগোপাল ঘোষ, মৌলভী আবদুর রহিম, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রসন্নকুমার টেগোর থেকে সরকারী বড় কর্তা ও মিশনারী সম্প্রদায়ের জ্ঞাতসারে তিনি অনুবাদকের খোঁজ করতে থাকেন। অনেকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান অনুবাদকের সাহায্য নিতে বললেন, অনেকে মধুসূদনের নাম করলেন। মধুসূদন তখন পুলিশ কোর্টের অনুবাদক, কিন্তু খামখেয়ালী ও নীল

ব্যাপারে উদাসীন। তাছাড়া, কাজটা গোপনে করতে হবে। নীলকরদের টের পাওয়ার আগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে হবে অনূদিত নাটকটিকে। মধুসূদনের যে চরিত্র তাতে কোন ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন। লঙ তাই পুলিশ কোর্টের মধুসূদনের বদলে সুপ্রীম কোর্টের অনুবাদকের সাহায্যে নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করার কথা ভাবলেন।

॥ ৪ ॥

মামলায় অনুবাদক কে তা প্রকাশ পায় না। পরবর্তীকালে "ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি শেষ জীবনে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"[১] এ উক্তি বঙ্কিমের কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেও প্রায় সকলেই বঙ্কিমকে কষ্টিপাথর করে মধুসূদনকে অনুবাদক হিসাবে মেনে নিলেন। যদি এ মন্তব্য বঙ্কিমেরই হয় তবে বঙ্কিম মধুসূদনকে অনুবাদক হিসাবে ঘোষণা করে ভুল করেছিলেন। তিনি এ ধরণের ভুল অন্যত্রও করেছেন। এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উপরও সুবিচার করেন নি। কাশীপ্রসাদ ঘোষের "মৃত্যুঞ্জয় জঘন্য বাংলা লিখিতেন" এ কথা মেনে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের উপর ন্যায় বিচার করেন নি। এখনও বাঙলা গদ্য-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্তির সুষ্ঠু এবং যথাযথ বিচার হয় নি। যেমন হয় নি লঙের বিচার। তা যাই হোক, আমাদের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে মধুসূদনকে কেন অনুবাদক হিসাবে মেনে নিতে পারি না তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না। তথাপি উল্লেখ করতেই হয়, মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু নীলদর্পণের অনুবাদক হিসাবে মধুসূদনকে গ্রহণ করেন নি। যদিও তাঁর জীবনী প্রকাশ হওয়ার আগেই বঙ্কিমের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল মূল নাট্যকারের নামও। তার জন্য সরকারী চাকরীতে নাট্যকারের কোন অসুবিধা তো হয়ই নি, বরং তিনি নাটক প্রকাশের এগার বছর বাদে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। তাছাড়া, নাটকটির প্রচারও বন্ধ হয় না ১৯০৭ সনের আগে। এই নাটক দিয়েই শুরু হয় বঙ্গীয়-নাট্যশালা। ১৮৭৩ সনে, মধুসূদনের মৃত্যুর কুড়ি বছর বাদে, যোগীন্দ্রনাথ জীবনী রচনা করেছিলেন। তিনি এ জীবনীকে প্রামাণ্য

করার জন্য বিভিন্ন স্থান ও মানুষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পান নি বলেই অনুবাদক হিসাবে মধুসূদনকে গ্রহণ করেন নি।

১৮৬১ সনের গোড়ায় যখন নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় তার বছর দুই আগে থেকে ১৮৬২ সন পর্যন্ত মধুসূদন পুলিশ কোর্টের দোভাষী। আরও দুবছর আগে তিনি ঐ আদালতের কর্ণিক। এই সময়ে কুচবিহারে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরীর জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন। কয়েকমাস "হিন্দু প্যাট্রিয়টের" সম্পাদক। তারপর চলে যান লণ্ডন। ব্যারেণ্টারী পাশ করেন ১৮৬৭ সনে। অনেক কষ্টে কলকাতা বার-এ নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন। স্বাধীন ব্যবসায় কৃতকার্য হতে না পেরে ১৮৭০ সনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের চাকরি নেন। এই সময় অবধি নীলকরদের ফোঁসফোসানী চলছে। তারা হরিশের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রীকেও নাস্তানাবুদ করেছে। ছোটলাট স্যার গ্র্যাণ্টের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করে ছোটলাট সাহেবকে জরিমানা দিতে বাধ্য করেছে। সীটনকারকে তাঁর অপরাধের জন্য বদলী করিয়েছে। কিন্তু মধুসূদন যখন সুপ্রীম কোর্টের চাকরি পান তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে। লঙ ইত্যাদির শাস্তি পাবার পরও যারা এভাবে এগিয়েছে তারা সুপ্রীম কোর্টের চাকরি পেলে মধুসূদনকে কিছুতেই স্বাগত জানাত না, যদি তিনি নাটকের অনুবাদক হতেন। তাছাড়া, বঙ্কিমের মন্তব্য—"সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন" একেবারেই ঠিক নয়। বরং নতুন করে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল বিভাগের অনুবাদ পরীক্ষকের চাকরী পান। এটা প্রমোশন। তিরস্কৃত হয়েছিলেন, তাও ঠিক নয়। কার দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন? সরকারের ও নীলকরের দ্বারা সর্বদাই তিনি অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত। সুতরাং বঙ্কিমের মন্তব্যের সঙ্গে বাস্তব সত্য বা তথ্যের মিল নেই।[১]

মধুসূদন ১৮৭২ সনে সুপ্রীমকোর্টের চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে পুনরায় স্বাধীন ব্যবসায় লিপ্ত হন। চাকরি জীবনে কোথাও তিনি তিরস্কৃত হন নি। তবে তাঁর আয় এবং চাহিদার মধ্যে সমতা না থাকায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বুকভরা অসন্তোষ নিয়ে তিনি ইতস্তত ছোটাছুটি করেছেন। কিন্তু যখন যেখানে যে চাকরি করেছেন সেখানেই সমাদর পেয়েছেন। দেশীয়দের নিকট

থেকে স্নেহ করুণা এবং শ্রদ্ধা সবই লাভ করেছেন। তবু জীবনে বহু কষ্ট এবং দুঃখ পেয়েছেন। এই কষ্ট ও দুঃখের অনেকটাই তাঁর নিজের সৃষ্টি। সে কষ্ট লাঘব করার ব্যাপারেও তিনি সাহায্য কম পান নি, তবু সামলাতে পারেন নি। সে কথা থাক। আমাদের প্রশ্ন অনুবাদক কে?

॥ ৫ ॥

জেমস লঙ বলেছেন—"This has been made by a Native, both the original and the translation are bonafide native production"[১] সরকারী নথিতে দেখি—"The original play having aroused great interest a wish for a translation was expressed by several Europeans: This was accordingly made by a Native under superintendence of Rev. J. Long: both the original drama and the translation was bonafide native production."[২] লঙের কৌশলী এই bonafide native-দের নাম প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আদালতে। কিন্তু সে ব্যাপারে আদালতের তেমন উৎসাহ না থাকায় নাম জানতে পারা যায় না। শুনানীর প্রথম দিন ১৯ শে জুলাই স্যার গ্রাণ্ট গভর্নর জেনারেলকে জানালেন—" Mr. Seton-Karr several months ago, mentioned to me that he had been informed that a curious Bengali play had been written, the subject of which was indigo—a genuine native production, a translation of which may be made by a private hand, and some copies printed off at a trifling cost. I wished to see the work, partly as a curiosity, and partly because I thought it likely that it would show what the rural popular feeling was on the subject better than anything else.. Mr. Seton-Karr's ideas on this point were the same as mine"[৩] সীটনকারও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি ২৯ শে জুলাই ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি এই বিবৃতিতে বলেন—"What I know of the history of this drama will be found in my printed statement, and I can only add hereto, that Reved. Mr. Long has been known to me and others having, for years, devoted his attention to vernacular literature of Bengal, and to the various publications which issue from Native press, and criculate among the middle and lower orders, to an extent of which very few Europeans are

aware...Publications on diverse social questions of interest have been by him brought to the notice of authorities, of which a record will be found in Bengal office."[১] মামলা আরম্ভ হবার আগে ২০ শে জুন জেমস লঙও সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি সম্পর্কে সরকারী রেকর্ড: 'He dwelt on his acquaintance with the Native Press and thus publications and the importance of the European knowing the tendency of the Native mind as manifested therein it was this, he said, that had induced him to bring to the notice of certain persons the 'Nil Darpan' which though highly coloured appeared to give the view of the effects of the indigo planting system. At the sametime he expressed his regret that while the coarse passages of the play had been expunged or softened in the translation, any that had given offence had been inadertently allowed to reimain.'[২] ২৭ শে জুন ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া-পত্রে লঙের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়।

লঙের বিবৃতিতে, আদালতের শুনানীতে, সরকারী রেকর্ডে এবং অনূদিত নাটকের কথারম্ভে সর্বত্রই উল্লেখ দেখছি অনুবাদক একজন নেটিভ। লঙ নেটিভ-কৃত অনুবাদকে ছাটকাট, সংস্কার ও মোলায়েম করতে গিয়ে কিছু অংশ ছাড় দিয়েছেন। অনধাবনতাবশত কিছু ভুলভ্রান্তিরও শিকার হয়েছেন। অনুবাদের মধ্যে এমন সব ত্রুটি আছে যা কোন নেটিভের অনূদিত বলে মনে করার কারণ নেই। যেমন, "তার শ্রাদ্ধে ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্ত টাকা রাখিয়া দেয়>"Keep your money for the sacrifice of many bulls; কোর্টকাছারীর সঙ্গে যুক্ত কোন অনুবাদক "ধর্মাবতারকে">My Lord না বলে My Saheb অথবা "আমার মক্কেলকে">My Client না বলে The person who has engaged me প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করবেন না। অনুবাদক যখন নেটিভ তখন এ ধরণের ত্রুটী লঙের পাণ্ডুলিপি সংস্কার এবং মেলোয়েম করার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে শৈথিল্য অনূদিত নাটকে দেখতে পাই তা কোন অবাঙালীর পক্ষেই সম্ভব। বর্তমানকালেও একজন বিখ্যাত বাঙলা জানা ইউরোপীয় বিদ্বান 'গাঙ্গে নাও দৌড়ানি'-কে অনুবাদ করেছেন "boat race on the Ganges"[৩] এমতাবস্থায় অনেকের ধারণা নেটিভের ছদ্মনামে অনুবাদক

লঙ নিজে। কিন্তু এ যাবৎ প্রাপ্ত কোন তথ্য থেকেই লঙকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আদালতে লঙের কৌশলী মূলে নাট্যকার এবং অনুবাদক উভয়কেই আদালতের সামনে হাজির করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা বিচারকালে আদালতেও উপস্থিত ছিলেন। অনুবাদক নেটিভ না হলে কৌশলী আদালতের কাছে এ প্রস্তাব কিছুতেই দিতে পারতেন না। অর্থাৎ অনুবাদক যে নেটিভ তাতে সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন কে এই নেটিভ ? কে সত্যিকার অনুবাদক ? মধুসূদন ? জেমস লঙ ? আমাদের উত্তর এ দুজনের একজনও নন। দু-একজন লোক বলছেন, এ গ্রন্থের অনুবাদক জনৈক দাস। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রটির নাম নাকি প্রকাশ করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা। এ গল্পেও আমরা বিশ্বাস করি না। নীলদর্পণের অনুবাদকে যাঁরা কাঁচা হাতের অনুবাদ বলে নিজেদের পাকাবুদ্ধির কথা জানাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গেও সহমত হতে পারছি না। যে বইর যে অনুবাদ দাঁড়িয়েছে তা পাকাহাতের না হয়েই পারে না। আগেই বলেছি যে সামান্য শৈথিল্য ও অশুদ্ধি অনুবাদে দেখতে পাই তার জন্য অনুবাদক দায়ী নন, দায়ী সম্পাদক। সম্পাদক বেশ কিছু অনূদিত অংশ বাদ দিয়েছেন, সমস্ত ব্যাপারটা ইউরোপীয়দের বোঝাবার জন্য পান্ডুলিপিকে নির্দয় হাতে অপারেশন করেছেন। কিন্তু এত করেও তিনি রেহাই পান নি। তা যাই হোক, আমাদের প্রশ্ন অনুবাদক কে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে পুনরায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হব। বঙ্কিম লিখেছেন—অনুবাদ করার অপরাধে মধুসূদন "সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" অর্থাৎ অনুবাদক সুপ্রীম কোর্টের চাকুরে। বঙ্কিমের এই সংবাদ সত্য। জেমস লঙ সুপ্রীম কোর্টের অনুবাদকের সাহায্যেই যে অনুবাদ করাবার চেষ্টা করছিলেন একমুহূর্ত আগে সে কথা বলেছি। এই সত্যের ওপর নির্ভর করে কল্পনার রঙ মিশিয়ে মধুসূদনকে অনুবাদকের আসনে বসিয়েছেন বঙ্কিম ও তাঁর পরবর্তী গবেষকেরা। মনে রাখতে হবে বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। কোর্ট কাছারী সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনে তাঁর ভুল হবার কথা নয়। নীলদর্পণ অনুবাদের তিন বছর আগে তিনি ডেপুটির চাকরি পান। যখন অনুবাদ প্রকাশিত হয় তখন তিনি খুলনার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। ১৮৬০ সনের নভেম্বর মাসে তিনি খুলনা আসেন মেদিনীপুরের নেগুঁয়া মহকুমা থেকে, এবং জুন মাসে রাজলক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করেন। বিভাগীয় অফিসার হিসাবে

এবং সাহিত্য ব্যাপারে অত্যুৎসাহ থাকাতে তিনি খোঁজ খবর করে জানতে পারেন যে নীলদর্পণের অনুবাদক ও সুপ্রীম কোর্টের অনুবাদক একই ব্যক্তি। এই সংবাদ জেনে ও অনুবাদক হিসাবে মধুসূদনের খ্যাতি লক্ষ্য করে মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে ঘোষণা করলেন অনুবাদক মধুসূদন। তাঁর কথা সকলেই মেনে নিলেন, লেজ তুলে কেউ দেখতে চেষ্টা করলেন না, সত্যিই মধুসূদন অনুবাদক কি না! যৌবনের উদ্দাম ও সাহিত্য প্রেমের তাড়নায় বঙ্কিম অনুবাদকের নাম জানতে উৎসাহী হয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে যে নাম ঘোষণা করলেন, তিনি ভেবে দেখলেন না সেই মধুসূদন অন্যের বই অনুবাদের দায়িত্ব নিতে কতটা উৎসাহী। বিশেষত নীল ব্যাপারে, নীলচাষীদের ব্যাপারে সারা দেশ তটস্থ হলেও মাইকেল ভয়ানকভাবে শীতল ও নিস্পৃহ। তিনি নিজের 'ইগো' নিয়ে ব্যস্ত। চাকরির চেষ্টায় অক্লান্ত। কোন কাজে তৃপ্তি নেই। তখনও সুপ্রীম কোর্টের চাকরি জোটে নি। তাই ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার কথাও ওঠে না। অবশ্য, অন্যের অনূদিত পাণ্ডুলিপি একরাত্রির মধ্যে দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বোধহয় তা-ও হয় নি। হলেও সতর্কতার সহিত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করা হয় নি। তাই মধুসূদনকে কোন ভাবেই নীলদর্পণের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। যদিও দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সৌভ্রাত্য ছিল। এবং যে ভাষায় নাটকটি রচিত সে ভাষার সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তা হলে নেটিভটি কে, ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্নের দিকেই ফিরে যাই।

॥ ৬ ॥

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাদিগকে আরও কিছু ঘটনা-পারম্পর্য বিচার করতে হবে। প্রথমেই দেখতে হবে সুপ্রীমকোর্টের তৎকালীন অনুবাদক কে ছিলেন। তার আগে কিছু টুকরা সংবাদও জেনে নিতে হবে।

১৮৪৮ সনে সংস্কৃত কলেজের জনৈক ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক কলেজের চাকরি ছেড়ে চার্লস টকর সাহেবের আদালতে পেশকারের কাজে নিযুক্ত হন। টকর সাহেব দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাধারণের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর নবনিযুক্ত পেশকার বহুভাষাবিদ পণ্ডিত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। "পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, সংস্কৃতসাহিত্য দর্পণকারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন অষ্টাদশভাষা-বারবিলাসিনীভুজঙ্গঃ (the fancyman of eighteen courtezans of

languages)"[১] এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাহেবস্বাদের অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার চূর্ণী তীরবর্তী মামজোয়ানী গ্রামে। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহারা হন। ছোটবেলায় পড়াশুনা করতেন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। চৌদ্দবছর বয়সে ফারসী শিখতে আসেন কৃষ্ণনগর। সুপণ্ডিত শ্রীনাথ লাহিড়ী বিনা পারিশ্রমিকে তাঁকে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষান্তে সাংসারিক অভাব-অনটন রোধ কল্পে কলকাতা আসেন চাকরির খোঁজে। পিতৃবন্ধু রীড সাহেব দশটাকা বেতনে নিজ মুন্সীর কাজে নিযুক্ত করেন। কোন এক বিশেষ কারণে কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দেন। গিয়ে ওঠেন বন্ধু রামতনু লাহিড়ীর বাসায়। এখানে রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। রামগোপালের আনুকুল্যে জোসেফ কোম্পানীর বড় সাহেবকে হিন্দী শেখাবার কাজ পান মাসিক কুড়িটাকা বেতনে। সেখানে থেকে ক্যালসেল সাহেবের হিন্দী শিক্ষক। এই সময় উমাচরণ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির কাছে ইংরেজী শেখেন। তারপর ডাঃ ম্যাকডলেণ্ড তাঁকে হিন্দী শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৩-৩৪ সনে যখন তাঁর বয়স ১৯-২০ তখন স্যার ট্রিবিলিয়ান কাউন্সিল সদস্য। তিনি ডি. রোজারিও সাহেবকে হিন্দী ও বাঙলা অর্থযুক্ত রোমান অক্ষরে অভিধান তৈরী করার দায়িত্ব দেন। রোজারিও সাহেব এ কাজে ডাঃ ম্যাকডলেণ্ড মারফৎ তাঁর হিন্দী শিক্ষকের সাহায্য চাইলেন। শিক্ষকটিও আনন্দের সঙ্গে রাজী হলেন। তাতে তাঁর কিছু আয় বাড়ে। কিন্তু তখনও চলছে তাঁর প্রস্তুতিপর্ব। নিজেকে তৈরী করার জন্য ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে গিয়ে নানা ধরণের গ্রন্থাদি পাঠ করতে থাকেন। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বেড়ে চলে। সাহেবদের দেখা পেলে তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমান। আলাপের মধ্য দিয়ে ইংরেজী শিখতে থাকেন। উৎসাহী হয়ে পড়েন উর্দু শিখতে। সুযোগ আসে দিল্লী নিবাসী ইয়াকুব খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর। খাঁ সাহেব কলকাতা মাদ্রাসার জনাব হাফেজ গোলাম নবীসের আত্মীয় এবং বন্ধু। তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে গোলাম নবীস সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে উর্দু শেখেন। ১৮৩৭ সনে ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা অর্থযুক্ত অভিধান প্রকাশিত হয়। অভিধানের কাজে সাহায্য ও পরিশ্রম করার জন্য তিনি ট্রিবিলিয়ান সাহেবের নজরে আসেন। এই সময় চার্চ মিশন সোসাইটি অব লণ্ডনের কলকাতা কেন্দ্রের অনুবাদ এবং

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামচরণ শর্মসরকার সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বসাপ, কলিকাতা।

প্রুফ সংশোধনের কাজও করতেন। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত লঙ ভারতবর্ষে এসে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আকৃষ্ট হন। তিনি তাঁর কাছেই বাঙলা, হিন্দী ও উর্দু শেখেন। অভিধানটি প্রকাশিত হলে সে অভিধানের কাজের জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও বুদ্ধির ব্যাপার টের পেয়ে বিদ্যোৎসাহী সাহেবেরা এই যুবকটির প্রতি উৎসাহিত হয়ে পড়েন। তাঁদের চেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় পঁচিশ টাকা বেতনে বাঙলা পণ্ডিতের চাকরি পান। তখন ছাত্রদের মধ্যে উর্দুর পরিবর্তে বাঙলা শিক্ষার গরজ দেখা যায়। তারই ফলে ইংরেজী বিভাগের সংলগ্ন বাঙলা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিছুদিনের মধ্যে বেতন হয় চল্লিশ টাকা। সকালে অধ্যাপনা এবং বিকালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করতে থাকেন। অধ্যয়নান্তে মেদিনীপুরের কালেকটর এইচ. ডি. বেলীর বাঙলা শিক্ষকের কাজ নিয়ে মেদিনীপুর আসেন। ইতিমধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৪২ সনে সংস্কৃত কলেজে পুনরায় ইংরেজী শ্রেণী স্থাপিত হয়। হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন রসিকলাল সেন, দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন বেলী সাহেবের বাঙলা শিক্ষক। বেতন সত্তর টাকা। ছয়/সত বছর অধ্যাপনা করার পর আদালতের পেশকারের চাকরি নেন। সেখান থেকে ১৮৫০ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুবাদকের চাকরি পান মাসিক চারশ টাকা বেতনে। ১৮৫৭ সনে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ইণ্টার-প্রেটার এভিয়ট সাহেব অবসর গ্রহণ করলে রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি দেশীয় গণ্যমান্য এবং ইউরোপীয় সুহৃদদের চেষ্টায় ও সহায়তায় মাসিক ছয়শত টাকা বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ সন অবধি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বদেশ, স্বদেশবাসী, স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং ছিলেন বন্ধুবৎসল ও গরীবের বন্ধু। তাঁর উন্নতিতে তাঁর সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের সকলের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতেন।

১৮৫৭ সনের নতুন চাকরিতে তিনি খুবই খুশী হন। তাঁর এ চাকরির বছর পাঁচেক আগে, ১৮৫২ সনে, প্রকাশিত হয় "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"। লেখিকা হানা কাথারীণ ম্যালেনস। ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা খৃষ্টান মহিলার এ উপন্যাসটির কথা আগেও বলেছি। বইখানি ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও ভাষান্তরিত হয়েছিল, তবু পরবর্তীকালের বাঙালী এ গ্রন্থকে ভুলে যায়। "ব্রজেন্দ্রনাথ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের লেখিকা মিসেস মুলেন্সকে চট্টোপাধ্যায় বংশোদ্ভূতা খৃষ্টান বঙ্গমহিলা বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ উপরি উক্ত মিসেস মুলেন্স বা মালেন্স যে ইউরোপীয় পাদরি রেভারেণ্ড লাক্রোয়ার কন্যা, এ তথ্য ও মিসেস ম্যালেন্সের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—বহুকাল পূর্বেই মধুসূদন মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'সুশীলার উপাখ্যান' গ্রন্থে প্রদান করিয়াছিলেন।"[১] গ্রন্থটি 'স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত। এর কাহিনী ও চরিত্র দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের। এ উপন্যাসটি" "বাংলা সাহিত্যের যে মাত্র প্রথম উপন্যাস তা নয়। বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ রচনা। ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা এই বিদেশিনী মেয়েটির কাছে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে ঋণী।"[২]

॥ ৭ ॥

যদিও সারা জাগানো প্রথম কথ্যভাষার রচনা—টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল।" এ বই নিয়ে নানা মহলে সাড়া পড়ে। বিদেশী সাহিত্য রসিকেরা বললেন—"The story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit, spirit and clever touches of nature". বঙ্কিম বললেন, "উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙলা সাহিত্যে যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙলা গ্রন্থের দ্বারা সেইরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ"।[৩] এই সময় মধুসূদন তাঁর পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে এসে গেছেন। অসামান্য প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বঙ্কিম। প্রকাশিত হয়েছে "হুতোম প্যাঁচার নকশা" ও "নীলদর্পণং" ১৮৬০ সনে। ১৯৬১ সনে এই নাটকের অনুবাদকে কেন্দ্র করে সারাদেশ চঞ্চল।

ইতিপূর্বে মিরিয়াম এস. নাইট শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাস "মেজ-বউ' অনুবাদ করে ফেলেছেন। তাছাড়া বঙ্কিমের "সুবর্ণগোলক", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "বিষবৃক্ষ", তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" প্রভৃতিও ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে লণ্ডনের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জার্নালে। এই জার্নালের দ্বারাই বাঙলা উপন্যাস, নাটক, প্রহসনাদির ইংরেজী অনুবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব পুস্তক অনূদিত হতে

থাকে ঠিক সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হলেও অন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে জেমস লঙ নীলদর্পণং এর অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

জেমস লঙ যখন থেকে দেশীয় ভাষা শিখলেন তখন থেকেই যে দেশীয় সাধারণ, দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, সাময়িক ও সংবাদপত্রাদি থেকে অংশ বিশেষ অনুবাদ করে ইউরোপীয়দের গোচরে আনতে থাকেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা আমরা জানি। দেশীয় লেখক শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করতে থাকেন মাতৃভাষায় গ্রন্থাদি রচনায়। এ সব কথা আমরা পূর্বেই জেনে নিয়েছি। তাঁরই অনুপ্রেরণায়ও উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় যে 'বাঙলার শ্রমজীবীগণের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন' রচনা প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাতে লালবিহারী দে "Bengal Peasant Life or Govinda Samanta" রচনা করে প্রথম পুরস্কার পান।[১] লালবিহারীর পরবর্তী "Folktales of Bengal"-এর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান। বাঙলার সাধারণ ও গ্রাম্য মানুষদের কথা সাহিত্যের মারফৎ তুলে ধরার জন্য গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাদরী ও ইউরোপীয়দের অনুপ্রেরণায় যে কাজ শুরু হয় তাতে জেমস লঙের অনেকটাই উদ্যম ছিল।

শিবনাথের "মেজ বউ" অনূদিত হবার পরই বাঙালী লেখক সাহিত্যিক ও কবিকুল তাঁদের সৃষ্টিকর্ম ইংরেজীতে অনুবাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হতে থাকেন। অনেক ইউরোপীয় এ দেশের সাহিত্য মারফৎ জনজীবন প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছায় তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কেউ কেউ আবার ইংরেজীতেই সাহিত্য রচনা আরম্ভ করে দেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বা স্ট্রাটেজি অনুসারে ইউরোপীয়েরা নীলদর্পণং নাটকের অনুবাদে উৎসাহী ছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকেও তথ্যাদি সংগ্রহে আগ্রহ দেখাতে থাকেন। ইংরেজীতে বাঙালীর কৃষক জীবন বা গোবিন্দ সামন্ত প্রকাশিত হয়১৮৭৪ সনে। তার দশ বছর আগে বঙ্কিম লিখেছিলেন Rajmohon's Wife, "ইণ্ডিয়ান ফীল্ড" সাময়িকীতে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সনে। মধুসূদনের "রত্নাবলী" ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সনে। পরের বৎসর শর্মিষ্ঠা। অনুবাদক স্বয়ং মধুসূদন। দেশীয় ও বিদেশীয়দের দ্বারা মধুসূদন অনুবাদের জন্য ভূয়সী প্রসংশা পেতে থাকেন। কিন্তু ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর প্রসংশার দ্বারা তিনি নিজেকে

জনতার কাছে নিয়ে যেতে পারেন না। তা পেরেছিলেন দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন ও টেকচাঁদ ঠাকুরেরা। জনপরিচিতি সীমাবদ্ধ থাকার জন্যও মধুসূদন ক্রুদ্ধ। এই ক্রোধ বুকে চেপে রেখে জনপ্রিয় দীনবন্ধুর নাটক অনুবাদে মধুসূদন এগিয়ে আসবেন মধুসূদনের জীবনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা তা ভাবতে পারেন না।

নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারে দেশীয়দেরও উৎসাহ ছিল। উৎসাহ থাকলেও অনুবাদ করতে বসে দেখা গেল এ গ্রন্থের অনুবাদ ইংরেজী জানা সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, বিদেশীর দ্বারা তো নয়ই। নেটিভ অনুবাদককে হতে হবে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে, কৃষকদের কথ্য ভাষার সঙ্গে, পরিচিত। দেশীয় ভাষা এবং ইংরেজীতে সমান দক্ষতা সম্পন্ন কোন অনুবাদকের সন্ধান করতে এসে স্বভাবতই অনেকে মধুসূদনের কথা ভাবেন। কিন্তু মধুসূদন তখন নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত এবং নিজের কাজ নিয়ে এতই যন্ত্রণা জর্জর যে খুব একটা আমল দিলেন না অন্যের রচনা অনুবাদে। লঙও মধুসূদনকে দিয়ে অনুবাদে যে আগ্রহী ছিলেন না তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। লঙ তখন গেলেন পুরাতন সুহৃদ, গরীবের বন্ধু, নদীয়াবাসী শ্যামাচরণের কাছে। তিনি জানতেন শ্যামাচরণ দক্ষ অনুবাদক এবং বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। নদীয়ার জনজীবন তথা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের ভাষার সঙ্গেও সুপরিচিত। শ্যামাচরণ লঙকে এড়িয়ে যেতে চান না। দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে এবং সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গে লঙের যে সম্পর্ক, ও তাঁর নিজের সঙ্গে লঙর যে ঘনিষ্ঠতা তাতে লঙকে এড়ানোও সম্ভব ছিল না। হাঁ, তিনিই অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন করে পাণ্ডুলিপি লঙের হাতে দেন। লঙ সে অনুবাদ ইউরোপীয় পাঠকদের উপযোগী করতে গিয়ে সম্পাদনা ও সংস্কার করেন।[১] প্রাকৃত অংশ মসৃণ করতে গিয়েও মূল নাটকের সঙ্গে সমতা রাখতে পারেন না। তবে ফ্যাক্টসের সঙ্গে আপোষরফা করেন না। অর্থাৎ সোজা কথায় নীলদর্পণের অনুবাদক যে নেটিভ তাঁর নাম শ্যামাচরণ শর্ম-সরকার।

লঙ অনূদিত পাণ্ডুলিপি ঘষামাজা করেন। এক সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠান না, খণ্ডে খণ্ডে পাঠান এবং বারে বারেই পাণ্ডুলিপি সংস্কার করেন। ছাপার কাজ সমাপ্ত হলে অনুবাদক ফাইল কপি দেখে স্বনাম প্রকাশে মত দেন না। সরকারী অনুবাদক হিসাবে মূলের সঙ্গে গরমিল যুক্ত অনুবাদ গ্রন্থে নাম প্রকাশে তাঁর চাকরির দিক থেকে অসুবিধা ছিল। অনুবাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় A Native. এমতাবস্থায় মূলের সঙ্গে মিলিয়ে কোন পাঠক যদি অনুবাদের অসঙ্গতি ও

১। সংবাদপত্রে লঙের বিবৃতি, বাকল্যান্ডের গ্রন্থ ও সরকারী নথীতে লিপিবদ্ধ।

শৈথিল্য নিয়ে অনুবাদকের ওপর কটাক্ষ করেন তাতে অনুবাদক হিসাবে তাঁর যে সুনাম ও খ্যাতি তাতে আঘাত আসে না। মামলার পর লঙের শাস্তি, সীটনকারের বদলী, স্যার গ্রান্টের জরিমানা, এবং হরিশের বিধবা স্ত্রীর লাঞ্ছনা প্রভৃতি দেখে পরেও অনুবাদক হিসেবে নিজেকে জাহির করতে আগ্রহ দেখান না। নিজেকে প্রকাশিত করার দিকে তাঁর ঝোঁকও ছিল না।

॥ ৮ ॥

শ্যামাচরণ কেন এ গ্রন্থ অনুবাদে রাজী হয়েছিলেন তার কারণ, একদিকে যেমন লঙের অনুরোধ, তেমনি অন্যদিকে তাঁর নিজের উৎসাহ। এবং এ ব্যাপারে যে সব দেশীয় ও ইউরোপীয় সাহেবদের আগ্রহ ছিল তাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তাছাড়া নদীয়ার লোক হিসাবে তিনি নদীয়া জেলার নীল চাষীদের দুর্দশা ও উৎপীড়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। শহরে বসবাস করলেও গ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অটুট ছিল। ১৮৫৮ সনে স্বগ্রাম মামজোয়ানিতে একটি ইংরেজী ও একটি বাঙলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৬০ সন পর্যন্ত এর যাবতীয় ব্যয় তিনিই বহন করেছেন।[১] তাছাড়া নিজগ্রাম থেকে হাজরাপুর অবধি একটি, এবং মামজোয়ানি থেকে বাদকুল্যা অবধি আরেকটি রাজপথ প্রস্তুত করে দেন। সন্নিহিত দলুই গ্রামে এবং হলুদপাড়া গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক কূপ খনন করে দিয়েছিলেন পানীয় জলের অভাব দূর করতে। তাঁর বাসস্থান তালতলা অঞ্চলেও তিনি পানীয়জলের এবং কলকাতার অনেক স্থানে জলছত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রাম থেকে প্রায়ই লোকজন আসত তাঁর কাছে। নীলকরদের অত্যাচারাদি সম্পর্কে তারা তাঁকে অবহিত করাত। তিনি তাঁদের উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। তাঁরই পরামর্শ মত নদীয়ার নীল চাষীরা লঙের সঙ্গে দেখা করেছিল, এবং পরে তারা পাদরী বোমওয়েটসকে সঙ্গে নিয়েও লঙের কাছে এসেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে ১৮৫৬ সনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত যেতেন।[২]

শ্যামাচরণ শর্ম সরকার যখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান অনুবাদক তখন তিনি নাটকটির অনুবাদ করেন। নীলদর্পণের ভাষার সঙ্গে নদীয়ার কথ্য ভাষার যে মিল আছে সে ভাষার সঙ্গে ছিল তাঁর রক্তের যোগ। ভাষা ব্যাকরণ লেখার ব্যাপারে তিনি কথ্যভাষা, বি-ভাষা, উপ-ভাষা প্রভৃতির চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া

By a Native এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ অনুবাদের দশবছর আগে, ১৮৫০ সনে, প্রকাশ করেছিলেন "Introduction to the Bengali Language adopted to Students who know English"—অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে গ্রন্থ রচনায় তিনি আগে থেকেই অভ্যস্ত ছিলেন। বেথুন সাহেবের সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই অনুরোধে তিনি নিজের ইংরেজী গ্রামার অনুসরণ করে, "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" রচনা করেছিলেন। বাঙলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী উর্দু, হিন্দী, গ্রীক এবং লাটিন এই নয়টি ভাষা জানতেন শ্যামাচরণ। গ্রামের মুসলমানেরা তাঁকে মৌলানা মৌলভীর মত সম্মান করত।[১]

এই মানুষটির ছোটবেলা ভীষণ দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটে। কলকাতা আসেন ১৮৩৫ সনে, যখন তাঁর বয়স একুশ। বাড়ীতে বাড়ীতে জল দিয়ে দিনাতিপাত করতেন। তারমধ্যেও জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত ছিল। সময় সুযোগমত প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষের কাছে গিয়ে ইংরেজী শিখতেন। রামগোপাল সান্যাল তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—"with the dawn of the day, Shyama Churn rose from his bed, took his morning abulation, and a few chapatis prepared the night before, and having done his duties in Calcutta Madrasa, he walked to Dum Dum to teach some European Military gentelmen residing there and had to come back to town to attend to his duties at the Fort William College. With the setting sun, his Herculean task for the day came to a close, and poor Shyama Churn had to come back to his lodging, to prepare his own food with his hand, then to pertake it and after taking a little rest, read his books and went to bed at midnight. In this way he struggled on with poverty till at last he conquered it. Nurtured in the lap of cold adversity, he knew what a misfortune it was to be poor and his sympathy to the helpless and the distressed was as ever."[২] এইচরিত্র থেকেই তিনি গ্রাম্য সাধারণ ও নীল চাষীদের ব্যাপারে উৎসাহিত ছিলেন এবং নীলদর্পণ অনুবাদের অনুরোধ লুফে নিতে পারেন। গরীবদের প্রতি তাঁর যে দরদ ছিল তা-ই তাঁকে প্রেরণা জোগাত দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। তিনি বহু দরিদ্র বিধবা ও গরীবকে সাহায্য করতেন। বহুছাত্র ও মাতৃপিতৃহীন শিশুদের ভরণপোষণ করতেন। তাঁর ফারসী শিক্ষক শ্রীনাথ লাহিড়ীর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীর ভরণপোষণের জন্য নিয়মিত অর্থ পাঠাতেন এবং তাঁর ছেলেকেও হাই-

কোর্টে চাকরি দিয়েছিলেন।[১] তাঁর সঙ্গে রামতনু লাহিড়ীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া, প্যারীচরণ সরকার, রামগোপাল ঘোষ, রাজা রাধাকান্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি দেশীয় প্রধানদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এঁরা সকলেই আবার নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়েছিলেন যা তাঁদের পরবর্তী কার্যাবলী প্রমাণ করে। শ্যামাচরণ তাঁর কাজে এত দক্ষ ছিলেন যে প্রধান বিচারপতি প্রায়ই বলতেন—"Shyama Prosad (Churn) and Rama Prosad (রাজা রামমোহনের ছেলে) were the real *maliks* (owner) of Supreme Court. That Babu Shyama Churn was highly respected both by the Bench and the Bar —may indeed, by all classes of people, for his learning, ability, honesty and integrity, is a fact which does not admit of any derelet"[২]

১৮৫০ সনে তাঁর Anglo-Bengali Grammar—Introduction to Bengali language রচিত হয়েছিল মিঃ ই. টি. মার্শালের অনুরোধে। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা করেন "বেতাল পঞ্চবিংশতি"। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য এ সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ১৮৬১ সনে তাঁর বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। স্মরণে আছে, এটি রচিত হয়েছিল স্যার ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের অনুরোধে। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "ব্যবস্থাদর্পণ"। তিনি আরও বহু গ্রন্থের রচয়িতা, যেমন—"The Muhammadan Law, being a digest of the law applicable especially to the Sunnis of India', 1873, "Vyavastha Chandrika"—a digest of Hindu law as current in all provinces of India" দু খণ্ডে, ১৮৭৪ ও ১৮৮০ সনে, প্রকাশিত হয়। মুসলমান ও হিন্দু আইন বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর বক্তৃতা। এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশকও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮৮১ সনে প্রকাশ করেন "পাঠ্যসার"। এ গ্রন্থের নামকরণে জেমস লঙের "সংবাদসার"-এর কথা মনে পড়ে। ভাষাবিদ পণ্ডিত হিসাবেও উভয়ের মিল।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে গত শতকে দেশীয় ও এ দেশস্থ বিদেশীদের মধ্যে একটা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। ২৪ বছর বয়সে জেমস লঙ ৯টি ইউরোপীয় ভাষায় এমন পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন যে ১৮৩৮ সনে, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইশলিংটন কলেজের বিদায়ী অধ্যক্ষ মিঃ পিয়ারসন নতুন অধ্যক্ষ মিঃ চাইল্ডের সঙ্গে লঙের পরিচয় করিয়ে তাঁকে ভাষার যাদুকর

১। Ibid.
২। Ibid.

মেজ্জোফ্যান্টির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মেজ্জোফ্যান্টি ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও ইতালীদেশীয় রোমান ক্যাথলিক। ১৭৭৪-১৮৪৯ অর্থাৎ ৭৫ বছর বেঁচে ছিলেন। লঙ বেঁচে ছিলেন ৭২ বছরের কিছু বেশী। কিন্তু ভাষাবিদ পণ্ডিত হিসাবে যে ব্যাপক খ্যাতি পাবেন বলে তাঁর শিক্ষক আশা করেছিলেন সে খ্যাতি পান নি। তাঁর খ্যাতি হয়েছিল অন্য কারণে। তাঁর সময়ের কিছু আগে ও পরে যেসব দেশীয় ও বিদেশী ভাষাবিজ্ঞানী সমাদৃত তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেসুইট পাদরীর দল। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন ভাষা শিখেছিলেন। ব্যাপটিস্ট পাদরীদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীই সবচেয়ে বেশী ভারতীয় ভাষ জানতেন। তাছাড়া বিশফস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মিল, চার্চ মিশন্ সোসাইটির জেমস লঙ, কোম্পানীর কর্মচারী হ্যালহেড, উইলকিনস, কোলব্রুক, উইলসন, জোন্স, কাউয়েল, জন বীম্‌স প্রভৃতির কথা সর্বজন পরিচিত। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলরত্ন হালদার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, প্রিয়নাথ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্যামাচরণ শর্ম-সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রবি দত্ত, হরিনাথ দে প্রভৃতি বহু ভাষা জানতেন। হরিনাথ দে মাত্র ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন তার মধ্যে ৩৫টি ভাষা ভালরকম আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন বলে শোনা যায়। শ্রীরাধারমণ মিত্রের হিসাবে দেখি—"Sir William Jones মোট ২৮টি ভাষা জানতেন, তারপর Nibhur, Sir John Bowring, Elihu Burrit ও Cosma de Koros প্রত্যেকে ১৮ থেকে ২০টি ভাষা জানতেন। Dr. John Leyden জানতেন ২০টি ভাষা। আয়ারল্যান্ডের Sir William Rowan Hamilton (১৮০৫-১৮৬৫) ১৩ বছর বয়সে ১৩টি ভাষা শিখেছিলেন আর ১৭ বছর বয়সে একজন উঁচুদরের গণিতজ্ঞ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।...অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে মিরান্ডোলা ও রাওয়ান হ্যামিলটন হরিনাথ দের চেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এঁদের কেউই মোট ভাষা হরিনাথ দের চেয়ে বেশী শেখেন নি।" রাধারমণ বাবু হিসাব দিয়েছেন—"অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জানতেন ২৬টি ভাষা, রামমোহন রায় ৭টি, কৃষ্ণমোহন ১০টি, রাজেন্দ্রলাল অন্তত ১০টি, মধুসূদন, ১৩।১৪টি, হরপ্রসাদ ৮টি ও আনন্দকৃষ্ণ বসু ৯টি," কিন্তু তাঁর তালিকায় শ্যামাচরণ বা জেমস লঙ কারোরই উল্লেখ দেখি না। যদিও যাঁদের তালিকা তিনি তৈরী করেছেন তাঁদের মধ্যে এই নাম দুটির অনুপস্থিতি চোখে ঠেকে। শ্যামাচরণ ও লঙকে আমরা বহুভাষাবিদ পণ্ডিত হিসাবেও উল্লেখ করেছি বলে এই সংবাদ পরিবর্তন করে নিতে হল।

জেমস লঙ ও শ্যামাচরণ উভয়েই দরিদ্র সাধারণের দুঃখে কষ্ট পেতেন। তাঁদের

সাধ্যমত সাহায্যের চেষ্টাও করতেন। জেমস লঙ খ্রীষ্টিয় মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করেন। শ্যামাচরণ হিন্দু-ব্রাহ্ম মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বগ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীরও উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং ছিলেন কলকাতার নাগরিক সভার অন্যতম উদ্যোক্তা। চার্চ মিশনারী সোসাইটির কাজে প্রায়ই লঙকে নদীয়া যেতে হত। নদীয়ার ব্যাপার নিয়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে শ্যামাচরণের সঙ্গে লঙের আলাপ-আলোচনাও হত। সুতরাং নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারে লঙ শ্যামাচরণের সাহায্য নিবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

।। ৯ ।।

নীলদর্পণের অনুবাদে যে শৈথিল্য তা তুলে কেউ যদি অনুবাদক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে চান তবে তিনি ভুল করবেন। কোর্ট অনুবাদকদের অনেকেই আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ফ্যাক্টস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তাতে অনেকসময় অনেক অনুবাদ যথাযথ হয় না। তা ইংরেজী না জানার ব্যাপার নয়। অনেক সচেতন অনুবাদকও অনেকসময় ভুলের শিকার হন। অনেক কারণে কখনো অনুবাদ শিথিল হয়, কখনো অনুবাদ মূলকে ছাড়িয়ে যায়। শ্যামাচরণ ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখেছিলেন। সে শিক্ষায় কোন ফাঁক ছিল না। খুবই ভালই জানতেন কথ্যভাষা, উপভাষা, বিভাষাদি। কোর্টকাছারীর ভাষা তো ভালই জানতেন। তবু 'মি লর্ড'-এর বদলে 'মাই সাহেব' অথবা 'মক্কেল' বা ('ক্লায়েণ্ট') এর বদলে 'দি পারসনস হু হ্যাজ এনগেজড মি'-জাতীয় অনুবাদ তিনি করেন নি। এগুলো করেছেন জেমস লঙ যিনি কোর্টকাছারীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। আদালতের বিবৃতিতে লঙ বলেছেন—'বিশ বছর ধরে দেশীয়দের মধ্যে কাজ করছি, আইন আদালতের ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই'। মিশনারী পাদরীদের কাছে লর্ড হচ্ছেন তিনি যিনি পরমপিতা—যিশু। কিন্তু আইন আদালতের রাজত্বে লর্ড হচ্ছেন বিচারক। লঙের খ্রীষ্টিয় চেতনায় লর্ড হয়েছেন সাহেব এবং মক্কেল হয়েছে 'দি পারসন হু হ্যাজ এনগেজড মি'। কিন্তু তাতে মূল বক্তব্য বা ফ্যাক্টসের কোন ক্ষতি হয় নি। মূল নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করতে গেলে যে ধরণের অসঙ্গতি চোখে পড়ে, মূল নাটককে দূরে সরিয়ে রেখে কেউ যদি শুধুমাত্র ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন তবে তাঁর কাছে নাটকটির অনেক শৈথিল্য বা অসঙ্গতি ধরা পড়বে না। যাঁদের জন্য নাটকটি অনূদিত হয়েছে এই সব ছোটখাট ত্রুটী বা শৈথিল্য তাঁদের মূল বিষয় বুঝতে নিশ্চয়ই কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

আরেকটি কথা। রায়দান কালে বিচারপতি ওয়েলস সমস্ত বাঙালীকে গালি দিয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে এতদ্দেশীয়রা শোভাবাজার রাজবাটিতে একটি সভায় মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা ওয়েলসের দুঃস্বভাবের বিষয় স্টেট-সেক্রেটারীর গোচর করেছিলেন, প্রায় বিশহাজার লোক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই আবেদনপত্র গোপনে মুদ্রিত হয়ে চতুর্দিকে পাঠানো হয়েছিল। ইংলিশম্যান ও হরকরা একটি কপির জন্য পাঁচশ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল। এরূপ একতা হয়েছিল, কেউ তাদের একখণ্ড দেন নি। আবেদনপত্রের জবাবে সরকারের তরফে চার্লস উড মর্ডাণ্ট ওয়েলসকে সতর্ক করে দিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রে ১৮৬২ সনের ১৪ই এপ্রিল সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

বিরোধী পক্ষ থেকে আদালতে বলা হয়েছিল লঙই নীলদর্পণের অনুবাদক। নিজের নাম গোপন করার জন্য নেটিভের বর্ম পরিধান করেছেন। উত্তরে লঙের কৌশলী বলেছিলেন—"There had not been the slightest attempt on the part of Mr. Long to shield himself; on the contrary, he had put himself forward as much as any man could do... Mr. Long had certainly not hesitated to acknowledge the share he had takan in it...If there was any necessity, Mr. Long would at proper time divulge the name of both the author and the translator."[১] আদালতের অনীহায় অনুবাদকের নাম জানা যায় না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই নাট্যকারের নাম প্রকাশ হয়ে যায়।

॥ ১০ ॥

তাই একশ কুড়ি বছর বাদে প্রকৃত অনুবাদকের খোঁজে অনেক তথ্য ঘেঁটে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শ্যামাচরণ শর্ম সরকারকে নীলদর্পণের অনুবাদক হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি। তারজন্য বঙ্কিম-মন্তব্যের যে অংশ সত্য, অর্থাৎ অনুবাদক সুপ্রীমকোর্টের ইন্টারপ্রেটার, তা মান্য করেছি এবং বঙ্কিম যেখানে সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েছেন সেই অংশকে বর্জন করেছি।

শ্যামাচরণকে অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করার পিছনে আমাদের যুক্তি—নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারে তৎকালে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মধুসূদনের পর শ্যামাচরণই দ্বিতীয় উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুপ্রীমকোর্টের প্রধান অনুবাদক ও গ্রাম্য-ভাষা, উপভাষা, বিভাষা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নদীয়ার লোক হিসাবে নদীয়ার হিন্দু-মুসলমান চাষীদের অবস্থা দরিদ্রসাধারণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন এবং নীলকরদের আচরণাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

তাঁরই অনুরোধে নীল চাষীরা লঙের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি জেমস লঙ সীটনকার আদির সঙ্গে এবং রাজা রাধাকান্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে আন্তরিকভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁরা যখন নীলদর্পণ অনুবাদের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন তখন তিনি সাগ্রহে অনুবাদ করতে রাজী হন। অনুবাদক হিসাবে নিজের নাম ব্যবহার করেন না, ব্যবহার করেন By a Native. এই ছদ্মনামে যে তিনি আরও গ্রন্থ রচনা করেছেন উপরে তা উল্লেখ করেছি। জেমস লঙের ওপর তাঁর একটা অন্যরকম ভালবাসা ছিল। তাই তিনি লঙের 'সংবাদসার' অনুসরণে 'পাঠ্যসার' রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত তথ্যের আলোকে আমরা অনায়াসে হারিয়ে যাওয়া নেটিভটিকে সনাক্ত করতে পারি।

পরবর্তীকালেও নিজের নাম প্রকাশ না করার কারণ কি তাও বলেছি। বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছি যে মামলার পর নীলদর্পণকে নিয়ে যে হৈ চৈ হয়েছে, সরকারীভাবে যে সব প্রশাসনিক সংস্কার হয়েছে, তাতে যতদিন সরকারী চাকরিতে ছিলেন ততদিন অর্থাৎ ১৮৭২ সন পর্যন্ত নিজের নাম প্রকাশ করায় অসুবিধা ছিল। কারণ, তাঁর চাকরি ছিল অনুবাদকের। অনুবাদে অসঙ্গতি ও শৈথিল্যের যে সব নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল মামলায় সেখানে তাঁর নাম প্রকাশিত হলে চাকরি ক্ষেত্রে ইজ্জত ঢিলা হবার আশংকা ছিল। ১৮৭২ সনের পরে অবশ্য নাম প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা ছিল না। তবু তিনি তা প্রকাশ করেন না। নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর দম ছিল না। গরীবদের নানা ধরণের সাহায্য করার ব্যাপারেও এ জিনিষটি লক্ষ্য করা যায়। জীবনে বহু অনুবাদ তাঁকে করতে হয়েছে, কোন জায়গায়ই নাম প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। এ ব্যাপারেও তাই চুপ করে গিয়েছিলেন। তাঁর মৌনতা মধুসূদনকে অনুবাদকের আসনে বসাতে সুবিধা হয়।

॥ ১১ ॥

পরে লক্ষ্য করা যায়, অনুবাদের মধ্যে এমন সব অসঙ্গতি ও অশুদ্ধি আছে যা মধুসূদনের নামে চলে গেলে মধুসূদনের প্রতিভার প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হবে। তখন নতুন গল্প তৈরী করা হল। বলা হল— এক রাত্রির মধ্যে তাড়াহুড়া করে অনুবাদ করার জন্য অনুবাদে কিছু কিছু অশুদ্ধি ও অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এক রাত্রির মধ্যে অনুবাদ করতে হলে অশুদ্ধি ও ভুলের শিকার হতে হয় এ ধরনের চিন্তা যে উর্বর-মস্তিস্ক প্রসূত সে মস্তিকের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নেই। তাছাড়া অনুবাদের ব্যাপারে যাঁদের বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে এবং নীলদর্পণ নাটকের মূল ভাষার সঙ্গে যাঁদের

সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরাই আশা করি একথা স্বীকার করবেন, যত বড় মাপের বা দরের লোকই হউন না কেন, নীলদর্পণের মত কথ্যভাষার নাটকের ইংরেজী ভাষান্তর কোন একজনের পক্ষে একরাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা অসম্ভব।

তবে অন্যের অনূদিত পাণ্ডুলিপি একরাত্রের মধ্যে পরীক্ষা করা অসম্ভব নয়। অনূদিত পাণ্ডুলিপিটি মধুসূদনকে দেখতে দেয়া হয়েছিল বলেও আমরা মনে করি না। তবে কোন একজন বিখ্যাত অনুবাদকের অনুবাদ আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্কারের পর যদি পরীক্ষার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রেরিত হয় তবে স্বভাবতই তিনি ঢিলেঢালা ভাবে তা দেখেন। যদি মধুসূদনের কাছে অনুবাদ পরীক্ষার জন্য পাণ্ডুলিপি দেয়া হয়েই থাকে তবে তিনি যে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে অনূদিত পাণ্ডুলিপি দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না তা-তো বুঝতেই পারছি। যে কোন কারণেই হোক মূলের সঙ্গে ইংরেজী অনূদিত নাটকটির অসঙ্গতি থেকে গেছে। কেন থেকে গেছে তাও আলোচনার দ্বারা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছি।

নাটকটির অনূদিত অংশে একই শব্দের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অনুবাদ দেখে কেউ কেউ নাটকটি একাধিক ব্যক্তির অনুবাদ বলেও মনে করেছেন। কিছুদিন পূর্বে অবধি আমরাই এ ধরনের একটা ধারণা পোষণ করতাম। কিন্তু পরবর্তী গবেষণার আলোকে ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পূর্বতন ধারণাও বদল করেছি।

কোন কাঁচা হাতের বা অনামী কোন হাতের অনুবাদ বলে যাঁরা যা হোক কিছু নতুন কথা বলে বাহাবা নিতে চাইছেন তাঁরাও যে ঠিক নন সে কথাও বলেছি। লঙ আদি ইউরোপীয়দের ব্যবহারের জন্য যে গ্রন্থ তা কোন কাঁচা হাতের বা কলেজের ছাত্রের দ্বারা অনূদিত হতে যাবে কেন? দেশীয় শিক্ষিত ও প্রধানদের সঙ্গে যখন লঙের যথেষ্ট দহরম-মহরম তখন কোন ট্রায়েড অনুবাদককে বাদ দিয়ে জনৈক ছাত্রের দ্বারস্থ হবেন জেমস লঙ এই কষ্টকল্পিত ভাবনার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে অনেকেই নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার দৈন্য প্রকাশে উৎসাহী হবেন না।

পাণ্ডুলিপি দেখে খণ্ডে খণ্ডে প্রেসে পাঠাবার আগে বার বার পাণ্ডুলিপি সংস্কার করেছেন লঙ। তাতে অনেক সময় মূল দূরে সরিয়ে অনূদিত অংশ নিয়ে ভেবেছেন। এ জন্যও কিছু অসঙ্গতি ও অশুদ্ধি এসে গেছে।

উপরে বর্ণিত আলোচনা ও তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্টতই মনে করি যে নীলদর্পণের অনুবাদক শ্যামাচরণ শর্ম সরকার। কেন ও কি ভাবে তিনি নাটকটির অনুবাদ করেন, কেন নিজের নাম গোপন করে A Native নামে স্থির থাকেন, তাও সবিস্তার আলোচনার দ্বারা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি।